নেতাজীকে আর
কতবার কলংকিত করা হবে?

মিত্র প্রকাশন প্রকাশনা

আলোকপাত

ডিসেম্বর ১৯৮৬

বাবুদের বাগানবাড়ি : সেকাল-একাল

বেঙ্গসরকার : উপেক্ষিত নায়ক

কাঠগড়ায় অশোক সেন

জয়া প্রদার গোপন বিবাহ
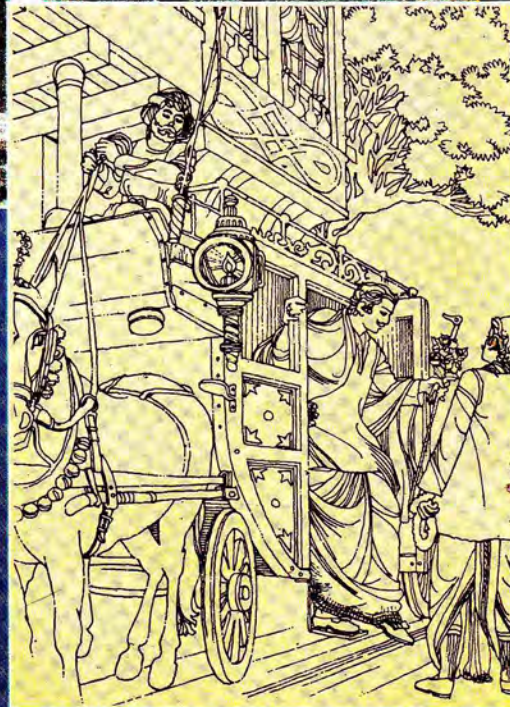
আলফা : আসামে বাঙালি হত্যার নয়া সংস্থা, নেপথ্যে কে?

প্রৌঢ় গান্ধীজীর প্রেমে অভিজাত বিদেশিনী!

মার্কসবাদী কমিউনিস্ট পার্টি ধর্মীয় রাজনীতিতে জড়িয়ে পড়ছে?

মূল্য ৫.০০

পত্রিকাটি ধুলোখেলায় প্রকাশের জন্য

হার্ড কপি ঃ সুজিত কুণ্ডু

স্ক্যান ঃ ইলা কুণ্ডু

এডিট ঃ স্নেহময় বিশ্বাস

একটি আবেদন

আপনাদের কাছে যদি এরকমই কোনো পুরানো আকর্ষণীয় পত্রিকা থাকে এবং আপনিও যদি আমাদের মতো এই মহান অভিযানের শরীক হতে চান, অনুগ্রহ করে নিচে দেওয়া ই -মেইল মারফত যোগাযোগ করুন।

e-mail: optifmcybertron@gmail.com; dhulokhela@gmail.com

সারা দেশ জুড়ে দশ লক্ষ লোক
গুড নাইট দিয়ে
মশাদের শুভরাত্রি জানাচ্ছেন!

আর আপনি ?

মশা প্রতিরোধ করার নিরাপদ ও নির্ভরযোগ্য উপায়

সারা দেশের দশ লক্ষেরও ওপর লোক গুড নাইট ব্যবহার ক'রে পরখ করেছেন। আজ পর্যন্ত যতগুলি মশা প্রতিরোধকারক আছে, তার মধ্যে এটিই হ'ল সবচেয়ে বেশী নিরাপদ ও নির্ভরযোগ্য।

স্বাস্থ্যের পক্ষে হানিকারক নয়, আর না কোনো ঝঞ্ঝাট পোয়াতে হয়

না এ দিয়ে হয় গলা বন্ধ করা ধোঁওয়ার রাশি, না কোনো ছাই ঝরে, আর না থাকে চিটচিটানি-ভাব। শুধু একটি মৃদু সুগন্ধ থাকে, যা মশাদের দূরে রাখে — রাতের পর রাত, বছরের পর বছর ধরে।

ব্যবহার করাও অতি সহজ

গুড নাইট ব্যবহার করা খুব সহজ।
গুডনাইট-টি শুধু হিটার প্লেটের ওপর বসিয়ে দিয়ে প্লাগ লাগান, আর স্যুইচ জ্বালান...ব্যস্, তারপর মশার হাত থেকে পুরোপুরি নিশ্চিন্ত হয়ে যান।
আরও ভাল ফল পেতে হ'লে, কিছুক্ষণের জন্যে ঘরের দরজা, জানলা বন্ধ রাখুন।

বিশেষ ভাবে তৈরী গুড নাইট ম্যাট্স

সবচেয়ে সেরা ফল পেতে হ'লে, আপনার ইউনিটটিতে শুধু গুড নাইট ম্যাট-ই ব্যবহার করুন। এটি যাতে রাত-ভর এর প্রভাব অক্ষুন্ন রাখতে পারে সেজন্যে আমাদের আমদানী করা জাপানী রসায়ন দিয়ে আমাদের নিজস্ব গবেষণাগারে অতি সযত্নে এর ক্রমোন্নয়ন সাধন ক'রে থাকি।

সুমিটোমো-র জাপানী প্রয়োগ কৌশল

গুড নাইট হ'ল এমন এক মশা প্রতিরোধকারক যা তৈরী করা হয় জাপানের সুমিটোমো কেমিক্যাল্স লিমিটেডের বিশ্ববিখ্যাত জাপানী প্রয়োগ কৌশল ও অতি উৎকৃষ্ট আমদানী করা সব উপাদান দিয়ে। তাই এটিই যে দেশের সবচেয়ে বেশী বিক্রীর ইলেকট্রিক মশা প্রতিরোধকারক তা জেনে, অবাক হওয়ার কিছু নেই। এর এই এতসব সুবিধের কথা শুনে, নিজের কাছেও একটি রাখতে কে না চাইবে, তা বলুন না।

গুড নাইট

"স্যুইচটি জ্বালান", আর মশার হাত থেকে নিশ্চিন্ত হয়ে যান।

প্রস্তুতকারক : ট্রান্সলেক্টা ২২ ওয়েসিস, ভাকোলা মসজিদ, সান্টাক্রুজ (পূর্ব), বম্বে ৪০০ ০৫৫; ফোন : ৬১২৮২০২।

Creative Unit 65..

জয়া কি সত্যিই আত্মহত্যা করতে পেরেছিল ?

আমি জয়া কে অনেকদিন চিনি। প্রেম করে বিয়ে করার ঠিক দু' বছরের মাথায় আত্মহত্যা করতে গিয়ে ব্যর্থ হয় জয়া, অথচ জয়া আর সুপ্রিয়কে আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধব যারাই দেখত, তারাই বলত 'মেড ফর ইচ আদার'। কিন্তু জীবন দু'য়ে-দু'য়ে চার নয় এবং সে জন্যই, হঠাৎই কখন, জীবনের খুব শক্ত ভিতও আলগা হয়ে আসে। জয়াও ভাবেনি সুপ্রিয় কখনও অন্য কোন নারীর সঙ্গে অবৈধভাবে জড়িয়ে পড়তে পারে। নিশ্চিত প্রমাণ পাবার পর, এক অন্তহীন অসহায়তা ঘিরে ধরে জয়াকে। এই জীবন নেহাত-ই মূল্যহীন হয়ে ওঠে তার কাছে।

প্রথম চেষ্টায় আত্মহত্যা করতে না পেরে, আত্মহত্যার ইচ্ছা তার আরও প্রবল হয়ে ওঠে। এমনই এক মানসিক বিপর্যয়ের মুহূর্তে তার 'পারমিতা'র কথা মনে পড়ে। নানা জায়গায়, নানা আলোচনায় সে মহিলা জ্যোতিষী পারমিতার অজস্র প্রশংসা শুনেছে। লোকে বলে, এ যুগের খনা। কিন্তু জ্যোতিষে জয়ার কখনই তেমন বিশ্বাস ছিল না। তবুও জীবনের শেষ মুহূর্ত যখন কাছেই, তখন ভুল হোক–সত্যি হোক, একবার সে জেনে যেতে চায় কেন এমন হল ? তারপর, সোজা শ্যামবাজার থেকে গড়িয়াহাট। কাছেই ত্রিকোণ পার্ক। ৮, যতীন বাগচী রোডে অ্যাসট্রোপামিস্ট ও জেমথেরাপিস্ট 'পারমিতা'র চেম্বার সহজেই খুঁজে পায় জয়া। পারমিতার চেম্বার খুঁজে পাওয়া যেমন সহজ, সঙ্গে সঙ্গেই তাঁকে হাত–দেখানো কিন্তু তত সহজ নয়। কেননা, অন্তত আড়াই–তিনমাস আগে এখানে এসে নাম লিখিয়ে, দিন স্থির করে যেতে হয়। দূর-দূরান্ত থেকে সবাই এভাবে অ্যাপয়েন্টমেন্ট করে এখানে আসেন।

ব্যবসাদারের মতো যতজন খুশি ততজনকে একদিনে দেখেন না পারমিতা। দেখেন দিনে ছয় সাতজনকে মাত্র।

মৃত্যুর মুখোমুখি দাঁড়িয়ে এত সময় অপেক্ষা করার মত অবস্থা ছিল না জয়ার। কিন্তু, এখন কি তাহলে তার জীবনের শেষ ইচ্ছাটুকুও পূর্ণ হবে না। সে কান্নায় ভেঙে পড়ে।

একজন মানুষের এই বিপদের মুহূর্ত পারমিতাকে স্পর্শ করে। তিনি সেই দিনই তার হাত, ছক দেখেন। জন্ম সময়, তারিখ, বার জেনে যে হিসাব বের করেন, তা থেকে জয়ার জীবনের দৃশ্য পারমিতার কাছে স্পষ্ট হয়ে ওঠে। পারমিতা জয়াকে জানান, এই সময়টা তার কাছে খুবই সঙ্কটের। কিন্তু এ সঙ্কট মোচনও সম্ভব। আর, সুপ্রিয়র জীবনে তার আসন চিরকাল স্থায়ীভাবেই পাতা থাকবে। দু'-একটা রত্ন ধারণ করতে হয়। জ্যোতিষে অবিশ্বাসী জয়াকে পারমিতার পরামর্শে।

নানা রকম সমস্যা নিয়ে কত মানুষ পারমিতার কাছে আসেন এবং তাঁর পরামর্শ নিয়ে চলে যান। জয়াও সে দিন চলে গিয়েছিল। ঠিক দু'মাস পরে হাসি-খুশিতে ঝলমল করতে করতে জয়া এসে হাজির। সঙ্গে সুপ্রিয়। জয়া আজ পারমিতাকে তার অন্তরের শ্রদ্ধা জানাতে এসেছে। এই আনন্দময় জীবন সে কি আবার ফিরে পেত, যদি না পারমিতার কাছে ছুটে আসত সেদিন ?

জয়ার কাছে তার সব কথা শুনে, পারমিতার সঙ্গে অ্যাপয়েন্টমেন্ট করে একদিন সরাসরি তাঁর মুখোমুখি হই, জিজ্ঞেস করি মূলত কী কী সমস্যা নিয়ে মানুষজন আপনার কাছে আসেন ?

পারমিতা জানান, সমস্যার অন্ত নেই। সমস্যা নিয়েই তো জীবন

তৈরী। তবে তিন-চারটি সমস্যা নিয়ে অনেকেই জর্জরিত। প্রথমত, আর্থিক। চাকরির ব্যাপারে অনিশ্চয়তা কিংবা ব্যবসায় টালমাটাল অবস্থা থেকে রেহাই পেতে অনেকে আসেন। দ্বিতীয়ত, ছেলেমেয়েরা পড়াশুনোয় অমনযোগী হলে কিংবা অসৎ সংসর্গে পড়লে ছুটে আসেন বাবা মায়েরা। তৃতীয়ত, যুবক যুবতীরা আসেন প্রেম এবং বিয়ের সমস্যা নিয়ে, এবং বিয়ের পর সাংসারিক, পারিবারিক এবং দাম্পত্য সংকটে অনেকে অস্থির হয়ে প্রতিকারের পথ খোঁজেন। এ ছাড়া শারীরিক সমস্যা। বহু দুরারোগ্য অসুখে আক্রান্ত মানুষ হতাশা ও যন্ত্রণা থেকে মুক্তি পাবার জন্য তাঁর কাছে আসেন।

পারমিতার কাছে হাত দেখিয়ে হতাশা ও বিপদ থেকে মুক্ত হয়েছেন এমন একাধিক উজ্জ্বল মানুষের মুখ সেদিন এখানে আমি দেখেছি। তবুও পারমিতাকে একটা কূট প্রশ্ন করি। অনেকে বলেন জ্যোতিষীর কাছে হাত দেখিয়ে রত্ন-ধারণ করে সবসময় কাজ হয় না। এটা কি আপনি অস্বীকার করতে পারেন ?

পারমিতা বলেন, "প্রথমে অভিজ্ঞ এবং সৎ জ্যোতিষী দিয়ে বিচার করাতে হবে। তারপর রত্ন বিশেষজ্ঞের অনুমোদন নিয়ে রত্ন কিনতে হবে। অসাধু ব্যবসায়ীর কাছ থেকে জাল রত্ন কিনলে কখনই কাজ হবে না। তাই আমি নিজের কার্যালয় থেকেই রত্নের ব্যবস্থা করে দিই, যাতে রত্নের মান ও বিশুদ্ধতা বজায় থাকে।" এর পরও পারমিতা রত্ন শোধন করেন। রত্নের প্রাণ-প্রতিষ্ঠা করেন পূজাপাঠের মাধ্যমে। সেই জন্যই তাঁর কাছে যাঁরা আসেন তাঁরা পরবর্তীকালে উজ্জ্বল আনন্দকে সঙ্গী করে পারমিতাকে তাঁদের অন্তরের শ্রদ্ধা এবং অভিনন্দন জানিয়ে যান।

শুধু জয়া নয়, কথা বলতে বসে সারি সারি মানুষের মুখ ভেসে ওঠে পারমিতার চোখের সামনে। তাদের নানান সমস্যা, নানান ব্যথার প্রতিঘাতে তাঁরা পীড়িত। প্রতিটি মানুষের সমস্যাকেই সমান গুরুত্ব দিয়ে দেখেন পারমিতা। একাগ্র মন দিয়ে বিচারে বসেন, ঘরের আধ্যাত্মিক পরিবেশে পারমিতা তখন এক দিব্য তন্ময়তায় স্থির সামনের মানুষটির জীবনের সমুজ্জ্বল ছবি তিনি খুঁজে বের করেন এই খোঁজই পারমিতার ব্রত এবং এই ব্রতই আজ সারা দেশে তাঁকে জনপ্রিয়ই শুধু নয়, সকল মানুষের কাছে এক মঙ্গলময়ী মাতৃরূপে প্রতিষ্ঠিত করেছে। তাঁর এই বিপুল জনপ্রিয়তা ও সাফল্যের চাবিকাঠি বোধহয় এইখানেই।

বাপ্পাদিত্য সেন।

আলোকপাত
প্রথম বর্ষ ■ একাদশ সংখ্যা ■ ডিসেম্বর ১৯৮৬

বাস্তব জীবনের আয়না

প্রধান সম্পাদক : আলোক মিত্র
সহায়ক সম্পাদক : রম্যপ্রসাদ ঘোষাল
সহ সম্পাদক : প্রদীপ বসু
উপসম্পাদক : হাবিব আহসান
গুরুপ্রসাদ মহান্তি
সংবাদদাতা :
দিল্লি : পুষ্কর পুষ্প
হায়দ্রাবাদ : পারভেজ খান
মাদ্রাজ : নরেশ কুমার
লণ্ডন : বলবন্ত কাপুর
ওয়াশিংটন : শেখর তেওয়ারি
লস এঞ্জেলেস : আফসান সফি
বম্বে ব্যুরো প্রধান : রবীন্দ্র শ্রীবাস্তব
আলোকচিত্রী : বিকাশ চক্রবর্তী
অঙ্গসজ্জা : শান্তনু মুখোপাধ্যায়
দিল্লি কার্যালয় :
কে.এল. তলোয়ার : ব্যবসায়িক ব্যবস্থাপক
৩০৫ রোহিত হাউস, ৩, তলস্তয় মার্গ
নয়াদিল্লি–১১০০০১
দূরভাষ : ৩৩১৯২৮৩
টেলেক্স : [illegible]
বম্বে কার্যালয় :
ডি. কৃষ্ণান: আঞ্চলিক ব্যবস্থাপক
[illegible] সেন্টার
নরীম্যান পয়েন্ট
বম্বে–৪০০০২১
দূরভাষ : ২৪৩৫৭৭ গ্রাম : মায়াকহানি
টেলেক্স : ০১১২৫৫৭ মায়া ইন
কলকাতা সম্পাদকীয় ও ব্যবসায় কার্যালয় :
স্টিফেনস কোর্ট
ফ্ল্যাট–৫ এ (পাঁচতলা)
১৮ এ পার্ক স্ট্রিট
কলকাতা–৭০০০১৬
দূরভাষ : ৪৫–৪৩৫২
টেলেক্স : ০২১ ৫১৭৩
প্রধান কার্যালয় :
মিত্র প্রকাশন প্রাইভেট লিমিটেড
২৮১ **মুঠিগঞ্জ**, এলাহাবাদ ২১১০০৩
দূরভাষ : ৫৩৬৮১, ৫১০৪২, ৫৫৮২৫, ৫৫৭৭৩
গ্রাম : মায়া এলাহাবাদ
টেলেক্স : ০৫৪০ ২৮০
প্রকাশক : দীপক মিত্র
মিত্র প্রকাশন প্রাইভেট লিমিটেড, ২৮১ মুঠিগঞ্জ, এলাহাবাদ–২১১০০৩ থেকে প্রকাশিত এবং মায়া প্রেস প্রাইভেট লিমিটেড থেকে মুদ্রিত।
ফোটোকম্পোজিং : মিত্র প্রকাশন প্রাইভেট লিমিটেড, এলাহাবাদ-এর একটি ইউনিট–সুরুচি অফসেট।

AIR SURCHARGE 50 PAISE PER COPY for Dibrugarh, Silchar, Tinsukia, Jorhat, Tejpur, Shillong, Kathmandu and 25 Paise, Agartala

সূচীপত্র

সরজমিন পৃষ্ঠা ৮১

অনেক ঢাকঢোল পিটিয়ে সাক্ষরিত আসাম চুক্তির পর আসামে বাঙালি-দের অবস্থা কি? 'আলফা'-র মত গোপন সংস্থা গজিয়ে উঠছে বিভিন্ন পক্ষের প্রচ্ছন্ন মদতে, যাদের মুখ্য উদ্দেশ্যই আসামে বাঙালি নির্মূল-করণ।

চুপ, আদালত চলছে পৃষ্ঠা ১১

ভারতের আইনমন্ত্রী অশোক সেন নিজেই কি জড়িয়ে পড়লেন আইনের জটিলতায়? নাকি তাঁর ভাবমূর্তিকে কলঙ্কিত করার চেষ্টা চলছে? এ নিয়ে তদন্ত প্রতিবেদন।
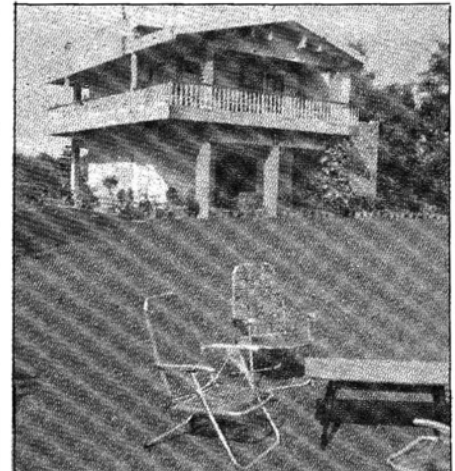
প্রচ্ছদ প্রতিবেদন পৃষ্ঠা ১৪

বাবু কালচারের মহাপীঠ বাগান-বাড়িগুলির অবক্ষয়ের জীবন্ত দলিল। শিল্প সংস্কৃতির পৃষ্ঠপোষকতার পরি-বর্তে সেখানে আজ সস্তা হুল্লোড়ের মহোৎসব। আইনের অভিভাবকদের চোখের সামনেই চলে যাবতীয় অপ-রাধ। ভারতের আরও দুই মহান-গরীর পশ্চাদপট।

বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরীরা যাবে কোথায়?

সমস্যাটা পুরনো। কিন্তু ব্যাপ্তি সুদূর প্রসারী। বহুদিন ধরে এই সমস্যার শুরু হয়েছে। ঠিক এই মুহূর্তে প্রায়-বিস্ফোরণের মুখে। ৪০/৫০ হাজার বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরী তাদের সাংবিধানিক অধিকার পাওয়ার জন্য লড়াই করছেন। অথচ দুঃখের ব্যাপার, বিভিন্ন কারণে তাদের সাংবিধানিক অধিকার থেকে বঞ্চিত করার চেষ্টা চলছে। সেইসঙ্গে তাদের জাতিসত্তা বিলুপ্ত করার জন্য ইতিমধ্যেই শুরু হয়েছে নানা চক্রান্ত। 'আলোকপাত'-কে তো এইসব গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে লিখতে দেখি, এই ব্যাপারে কি আলোকপাত করা সম্ভব?

প্রবীর সিংহ
কৈলাসহর
উত্তর ত্রিপুরা

রাজা নেই, প্রতিমার চোখে জল

পাথুরিয়াঘাটা ঘোষেদের বাড়ি সম্বন্ধে দামী মূর্তি, বড় বড় তৈল চিত্র, ইয়া ইয়া আসবাব এমন কি চামচিকে ওড়ার বর্ণনা পর্যন্ত দেওয়া হয়েছে কিন্তু প্রতিবেদক দেখেন নি কিংবা দেখেও উপলব্ধি করতে পারেন নি–ওই আসবাবপত্র সহ সব কিছুই ঘর দু'টিকে সংগ্রহশালার মর্যাদা দেয়। ডাকটিকিটের অ্যালবামের মত দেওয়াল ভর্তি ভারতের প্রাতস্মরণীয় সঙ্গীত শিল্পীদের তৈলচিত্র এবং কাটগ্লাস মোড়া অস্লর কোম্পানীর সিলিং ফ্যান যা হায়দ্রাবাদের বিখ্যাত সালরজঙ্গ সংগ্রহশালায়ও নেই। আর জয়ন্ত ঘোষ কখনোই চিবিয়ে চিবিয়ে কথা বলেন না কিংবা 'রাজকীয়ভাব' বজায় রাখেন না। আরো একটি কথা–জয়ন্তবাবু তাঁর ভ্রাতুষ্পুত্রের সঙ্গে নয়, থাকেন ভ্রাতুষ্পুত্রের পুত্রের সঙ্গে।

সুনীল মিত্র
কলকাতা–১৭

অপরাধী নই।

আমি একজন শিক্ষিত সুস্থ, রাজনৈতিক কর্মী এবং কেন্দ্রিয় সরকারের কর্মীও বটে। আলোকপাত অক্টোবর সংখ্যার 'কলকাতার অপরাধজগত' প্রতিবেদনটির তীব্র প্রতিবাদ করছি। আপনাদের প্রতিবেদক লিখেছেন আমি নাকি যশোর রোডের শিব মন্দিরে বসি, লরি ডাকাতি করি, বেজির খুনের কেসের সঙ্গে জড়িত বলে আমাকে নাকি পুলিশ খুঁজছে। একথা সম্পূর্ণ মিথ্যা এবং উদ্দেশ্য প্রণোদিত।

কেশব সরকার
জারমান
পাতিপুকুর
কলকাতা–৪৮

রাজার রাজা, এমনি সাজা?

বাঙালির অকৃত্রিম গৌরব নেতাজি সুভাষ বসুকে নিয়ে দিল্লি দূরদর্শনের পর্দায় যে কলঙ্কিত ঘটনাটি ঘটে গেল, তা নিঃসন্দেহে লজ্জাকর। আমরা লক্ষ্য করেছি, বাংলা ও বাঙালির এই বীরপুত্রকে নিয়ে দিল্লিওলাদের হেনস্তার শেষ নেই। শুধু এবারই নয়, এর আগেও নানাভাবে তাঁকে অপদস্থ করা হয়েছে। কিন্তু নেতাজির এই সাম্প্রতিক অবমাননা দুঃসহ। কেন্দ্রীয় সরকার নাকি দ্রুত ব্যবস্থা নিতে চলেছেন, তবু বিষয়টি আমাদের যথেষ্ট ভাবায়, উদ্বেগে রাখে। এ ব্যাপারে আলোকপাতের বলিষ্ঠ লেখনীর গর্জন শুনতে চাই।

কৃষ্ণা গঙ্গোপাধ্যায়
কলকাতা–৩৮

চাঞ্চল্যকর মৃত্যু

১১ অক্টোবর, ১৯৮৬। ভোরবেলায় প্রতিদিনের মতই ১৫ বছরের দীপক মাদার ডেয়ারির দুধ আনতে বেরিয়েছিল। দুপুর হবার পরও সে ফিরল না। বাড়ি থেকে খোঁজাখুঁজি শুরু হ'ল। পরের দিন সকালে তাকে পাওয়া গেল মৃত অবস্থায়। মৃত্যুটি অস্বাভাবিক, কারণ মৃতের নাকের নিচে দু'টি ক্ষত লক্ষ্য করা গেল। সারা দেহ ফ্যাকাশে। একপলক দেখলেই বোঝা যায়–দেহ রক্তহীন। ঠিক দু'দিন পরে একই ভাবে আরেকটি মৃত্যু। গোটা বারাসতে এই দুটি অস্বাভাবিক মৃত্যু নিয়ে চাঞ্চল্য দেখা দিয়েছে। এ বিষয়ে কি আলোকপাত সম্ভব?

মানস সরকার
বারাসত
উত্তর ২৪ পরগণা

আসামের পূর্তমন্ত্রী শ্রী অতুল বরা 'আলোকপাত' পড়ছেন। ছবিটি পাঠিয়েছেন আসাম থেকে আমাদের জনৈক পাঠক।

প্রকাশকের কথা

আলোকপাত এখন বর্ষপূর্তির পথে। বাংলা নিউজ ম্যাগাজিন জগতে ১৯৮৬র ফেব্রুয়ারিতে জন্মলব্ধ শিশুটি কিন্তু এখনই সফলতার সিংহদুয়ারে। আর লেখক, সাংবাদিক, কর্মীবৃন্দ, বিজ্ঞাপনদাতা এবং পাঠক–সকলেরই এতে সমান অবদান। সকলের কাছেই আমরা কৃতজ্ঞ। সাফল্যের এই বন্ধুর পথে মাঝেমধ্যে পড়েছে বেদনার শ্বাস। কখনও প্রকাশে দেরি হয়ে গেছে অনিবার্য কারণে। কখনও প্রোডাকশন খরচের দিকে তাকিয়ে দাম বাড়াতে হয়েছে। এজন্য আমরা খুবই দুঃখিত, কিন্তু কিছু উপায় ছিল না। প্রকাশনা ব্যয় এখন বাজারের উর্দ্ধমুখী অন্যান্য জিনিষের মূল্যবৃদ্ধির মত প্রকাশন সংস্থার ঘাড়ে চেপে বসেছে। নিউজপ্রিন্টের দাম বেড়ে যাওয়া, রঙ ও আনুষঙ্গিক মুদ্রণ খরচের জন্য আলোকপাতের দাম বাড়াতে বাধ্য হয়েছি। তবে সুধী পাঠককে কথা দিচ্ছি, আগামী দিনে আলোকপাতের পাতা বাড়বে এবং আরও অনেক আকর্ষণীয় লেখা পরিবেশিত হবে। আমি আশা করছি আমাদের অনিচ্ছাকৃত এই মূল্যবৃদ্ধি সংক্রান্ত পদক্ষেপ, সুধী পাঠক যুক্তিসংগত কারণে মেনে নেবেন। দীপাবলীর শ্রদ্ধা ও অভিবাদন অন্তে

দীপক মিত্র

অথ বিদ্যাসাগর ইউনিভারসিটি

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের নামানুসারে বিদ্যাসাগর ইউনিভারসিটি মেদিনীপুর তথা পশ্চিমবঙ্গের আশীর্বাদ স্বরূপ। মেদিনীপুর ও আশপাশের জেলাগুলির ছাত্র-ছাত্রীদের হায়ার এ্যাডুকেশনের জন্য এটি নিতান্ত অপরিহার্য। মেদিনীপুরের সদর শহর থেকে এটি কয়েক মাইল দূরে নির্জন জায়গায়। যোগাযোগ ব্যবস্থা জোরদার না হওয়ায় ছাত্র-ছাত্রীদের দুরবস্থার সীমা নেই।

কিন্তু দুঃখের বিষয় ছাত্র-ছাত্রীদের এহেন অসুবিধার দিকে কারোরই কোন লক্ষ্য নেই। ছাত্র-ছাত্রীদের একান্ত প্রয়োজনীয় ছাত্রাবাসই বা কোথায়? ইউনিভারসিটির দালানবাড়ির একাংশের ছাদও ধসে পড়েছে। সরকার নীরব কেন? সরকারের এই মৌনতা ভঙ্গ করতে কি এখানে পৌঁছবে না 'আলোকপাত'–এর তথ্যানুসন্ধানী অন্তর্দৃষ্টি?

শ্যামসুন্দর দে
চান্দরা, মেদিনীপুর।

গণতন্ত্র জাতিভোটে নির্ভরশীল!

লোকসভার সর্বমোট আসনের সিংহভাগ উত্তর প্রদেশের। সংবিধান অনুমোদিত ২২টি রাজ্যের নিজ নিজ আসন সংখ্যার বিচারেও এই রাজ্য প্রথম। তাই কেন্দ্রে সরকার গঠনে যে দল নির্বাচিত হয়, তাদের এই রাজ্যের উপর বহুলাংশে নির্ভর করতে হয়। এককথায় প্রতিটি দলের ক্ষমতায় আসার জন্য চাই বিপুল সংখ্যক উত্তরপ্রদেশের নির্বাচন কেন্দ্রে জয়ী হওয়া।

কিন্তু ভারতীয় রাজনীতিতে 'কেন্দ্রচরিত্র' এই রাজ্যটি এখনও অন্যান্য বেশ কয়েকটি রাজ্য যেমন বিহার, মধ্যপ্রদেশ, রাজস্থানের মত 'জাতিভোটের' শিকার। নির্বাচন কেন্দ্রের প্রার্থীরা–তাদের আদৌ যোগ্যতা থাকুক বা না থাকুক তিনি পণ্ডিত (ব্রাহ্মন) হলে, পণ্ডিতরা চোখ-কান বুঝে ভোট দেবে তাকেই। এইরকম ভাবে যাদব (গোয়ালা), লালা (কায়স্থ) প্রার্থীরা, প্রত্যেকেই জাতিভোটের সুবাদে নির্বিবাদে নির্বাচিত হয় বলা যেতে পারে, দেশের গণতান্ত্রিক সরকার গঠনে এই জাতিভোটই সক্রিয়ভাবে কাজ করছে।

আলোকপাত কি জনমানসে এর কুফলগুলি তুলে ধরবে না?

প্রদীপ কুমার
অমিত রায়চৌধুরী
এলাহাবাদ।

পাঠকের অধিকার বিভাগের চিঠিপত্র আমাদের কলকাতা অফিসে পাঠিয়ে দিন।

–প্রধান সম্পাদক

প্রধান সম্পাদকের কলমে
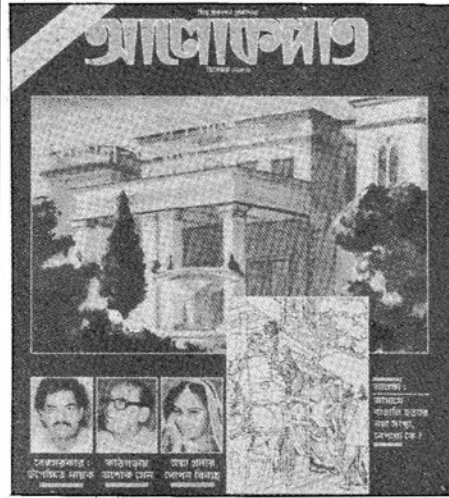
এবারকার লেখাটি লিখছি সাগরপারে বসে। লণ্ডন-প্যারিস ঘুরে স্টেটসে। অবশ্য পুরো সফরটিই আলোকপাত–এর জন্য। এমনিতে আমাদের তরফে পাশ্চাত্তের ডাকসাইটে শহরগুলিতে সংবাদ–প্রতিনিধি আছেন। কিন্তু যা আছে সেটাকেই আমি যথেষ্ট মনে করিনি। কারণ আমাদের প্রতিনিধিরা স্ব স্ব ক্ষেত্রে সেরা সন্ধানী হলেও পাশ্চাত্তের মাটিতে বাঙালি সংস্কৃতির সুক্ষ্ম রূপটি সেভাবে উপস্থিত করতে সুযোগ পাচ্ছেন না। সেজন্য চাই প্রবাসী কৃতি বাঙালি, যারা বিদেশে থেকেও বাংলাকে ভালবাসেন, বাঙালি সংস্কৃতির কথা চিন্তা করেন। সৌভাগ্যের কথা এবারকার সফরে সেরকম বন্ধু পেয়েছি। এরা আগামী দিনগুলিতে আলোকপাতের পাঠকদের উপহার দেবেন একান্ততম প্রতিবেদন।

তবে বাইরে বেরুবার আগেই প্যাকেজিং কমপ্লিট করে রেখেছিলাম। চলতি সংখ্যার প্রচ্ছদ প্রতিবেদন হিসেবে আমরা বেছে নিয়েছি বাঙালি বাবু কালচারের অন্তরীণ দিক, যা আগে ছিল সংস্কৃতির চর্চা এখন হয়েছে শরীরের সেবা। সেই আলো আঁধারের গোলকধাঁধায় বাবুদের বাগানবাড়ি নামতে নামতে এসে দাঁড়িয়েছে অপরাধের আবর্তে। একদিন যেখানে বাইজীর নুপুরে বেজে উঠত শিল্পের কলকাকলি আজ সেখানে সেক্স আর ক্রাইমের ছড়াছড়ি। সর্বোপরি শহরতলী থেকে পোশাক বদলে সে এসেছে খোদ মহানগরীতে। বাগানবাড়ির সেকাল একাল নিয়েই আমাদের সামাজিক তদন্তরিপোর্ট।

কলকাতায় পড়ে গেছে শীত। সেই সঙ্গে বিদেশি স্বপ্নের মায়ায় রাতের কলকাতায় হোটেল-রেস্তোরাঁয় বেজে উঠেছে বীভৎস উল্লাস। অর্দ্ধনগ্ন নারী শরীরের কাছে কিংবা শতাব্দীর সর্বনাশা অভিশাপ ড্রাগের কাছে মহানগরীর মহাজনরা কিসের কবোষ্ণ ওম পেতে চাইছেন? আর তার সামনে দাড়িয়ে হাসছেন বীভৎস মজার হাসির হাঃ হাঃ হাঃ। কেতাদূরস্ত কলকাতার অন্যজগতের মুখোস খুলে দিয়েছেন আমাদের প্রতিনিধি।

সম্প্রতি আসামে সংখ্যালঘু নেতা কালীপদ সেন নির্মমভাবে নিহত হয়েছেন 'আলফা' উগ্রপন্থীদের হাতে। এ সম্পর্কে আলফা যে বাঙালি-বিদ্বেষী বিবৃতি দিয়েছে তা জাতীয় সংহতির পক্ষে অতীব বিপজ্জনক। তার উপর অসম গণ পরিষদ সরকার আলফা উগ্রপন্থীদের রোহাই দিচ্ছেন বা চেষ্টা করছেন। সব মিলিয়ে আসামে বাঙালির বিপন্নতা বাড়ছেই। এই উদ্বেগজনক পরিস্থিতির পশ্চাদপট সংগ্রহ করে এনেছেন আমাদের বিশেষ প্রতিনিধি।

২৯৬ বছরের পুরনো শহর কলকাতার স্টার থিয়েটার প্রায় একশ পেরিয়েও এখনও যুবতী। আমাদের প্রতিনিধি কৃষ্ণেন্দু রায় সেই বর্ষীয়ান যুবতীর স্মৃতি ও সত্তার দিকে নস্টালজিক কায়দায় অঙ্গুলি সংকেত করেছেন। এই স্মৃতিরই অন্যপিঠ আমরা দেখেছি দূরবীন দিয়ে। সেখানে প্রৌঢ় গান্ধীজীর প্রতি এক অভিযাত বিদেশিনীর ভক্তি প্রেমের এ এক পবিত্র উদাহরণ।

কলকাতায় এসেছিলেন দুই অতিথি। লেখক গুন্টারগ্রাস ও ডোমিনিক লাপিয়ের। দুজনের কাজ, জীবন ও জীবনবোধ নিয়ে এ সংখ্যায় সংযোজিত করেছি এই সময়ের প্রয়োজনীয় লেখা।

এরসঙ্গে নিয়মিত কলম হেডের লেখাগুলি যথারীতি থাকছে। সেখানে সযত্নে সংগৃহীত হয়েছে কৌতূহলদ্দীপক জীবন কাহিনী। সে জীবন কাহিনীতে যেমন সোনিয়া গান্ধী কিংবা অশোক সেনের সম্পর্কে সাম্প্রতিক উদাহরণকে ধরা হয়েছে তেমনি খেলায় বেঙ্গসরকার সিনেমায় জয়াপ্রদাকেও ধরা হয়েছে। কারণ জীবনের দিকে আলোকপাতই আমাদের ব্রত, যেমন দীপাবলীর। শুভমস্তু।

আলোক মিত্র

সঙের খেলা !

দিল্লি দরবারের উৎসাহী নবীন মন মাঝে মাঝে দেশের সোঁদা মাটি নিয়ে খেলবার জন্য নেচে ওঠে। কিন্তু কঠিন কর্তব্য বারবার বাধা দেয়। মানসিক চঞ্চলতা দূর করার জন্য কম্প্যুটার-এর সাহায্য নেওয়া হয়। কম্প্যুটার জানায় দেশের মাটি নিয়ে খেলার উপযুক্ত সময় নয় এটা। এ সময়ে মাটি নিয়ে খেললে 'ইনফেকশন' হবার সম্ভাবনা। কাজেই দিল্লি দরবার রীতিমত মুষড়ে পড়লেন কারণ সংক্রমণে তার বড় ভয়।

দেশের মাটি নিয়ে খেলার একটা বিশেষ সময় থাকে। যখন সারা দেশে অথবা কিছু রাজ্যে নির্বাচন হয় তখনই সোঁদা মাটি নিয়ে খেলার ফুরসৎ হয়। দরবারিরা বেশ ভালই জানেন দেশে থাকলেই ওঁর সোঁদা মাটি নিয়ে খেলার সাধ জাগে। কাজেই তাঁকে বিদেশের দরবারে পাঠিয়ে দেওয়া হয় আর কখনো সখনো ভারত 'ভিজিট' করার জন্য নিয়ে আসা হয়।

গতবার যখন দিল্লি দরবার কিছুদিনের জন্য দিল্লি সফরে এলেন তখন তাঁকে জানানো হয় সোঁদা মাটি নিয়ে খেলার সময় এসে গেছে। সেসময় কেরল, পশ্চিমবঙ্গ ও হরিয়ানায় বিধানসভা নির্বাচন হবার কথা ছিল। কাজেই দিল্লি দরবার দারুণ উৎসাহী হয়ে উঠলেন। 'ইনফেকশন' যাতে না হয় তার জন্য 'অ্যান্টিডোজ' নিয়ে তবে খেলা করতে হবে। দিল্লি দরবার তো এক পায়ে খাড়া। শাহী ফরমান জারি হল—১৭ সেপ্টেম্বর শাহান্‌শাহ কেরালার উদ্দেশ্যে রওনা হবেন তারপর পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসুকে টক ঝাল একচোট দেওয়ার জন্য কলকাতা যাবেন। এ হেন ফরমান অর্জুন সিং-এর কানের প্রবেশ পথে পৌঁছনো মাত্র তিনি লুঙ্গি পরেই দৌড়লেন দরবারের দিকে। কে একজন জিজ্ঞেস করল, 'আরে আপনার সেই মোটা চমশাটা কোথায় গেল ?'

তিনি জবাব দিলেন, 'চশমাটাকে দার্জিলিং পাঠানো হয়েছে গোর্খাল্যান্ডের রাজনীতি দেখার জন্য। আর শাহী ফরমান শুনে প্যান্টের কথাও ভাই ভুলে গিয়েছি।'

অন্য একজন মন্তব্য করলেন, 'আপনি তো বহু ঘাটের জল খেয়েছেন, আপনারও এই অবস্থা!'

তিনি সহজ সাদাসিধে ভঙ্গীতে জবাব দিলেন, 'আসলে আমি নিজেই এমন করি। এতে আমার ওপরওলা খুশি হন।' এরপর হুকুম জারি হল—অর্জুন সিংকে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব কেরলে পাঠাও। ওখানে রাজনীতির এখন কি হাল তার রিপোর্ট দাও। ব্যস, অর্জুন সিং কেরলের দিকে উড়লেন।

ওদিকে বাংলার মন্ত্রী যিনি একদা বিখ্যাত দাদা ছিলেন এখন মুন্সীর পোস্টে প্রোমোশন নিয়েছেন। মুন্সীজী যখন জানলেন বাংলার সোনার মাটি নিয়ে খেলতে আসছেন 'দিল্লি-দরবার' তখন তিনি দিল্লিতেই কেটে পড়লেন। তাঁর মন হল—এইবার শাহানশাহ সোনার বাংলার মাটি নিয়ে খেলবেন আর আমরা সোনা বিতরণ করব। শেষ পর্যন্ত ১৭ সেপ্টেম্বর পুরোদলবল নিয়ে 'দরবার' উড়লেন কেরলের দিকে। সঙ্গে অর্জুন সিং তো ছিলেনই, আর 'নতুন দিল্লি তেওয়ারী'ও প্লেনে সওয়ারী হলেন। আসলে এন. ডি অর্থাৎ নারায়ণ দত্ত তেওয়ারীই এই উপাধির মালিক। জরুরী অবস্থার সময় উত্তর প্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে তিনি 'দিল্লি দরবারের' এত সেবা করেছিলেন যে পুরস্কার স্বরূপ ওই উপাধি দেওয়া হয় তাঁকে।

যাই হোক, বিমান নামল কোচিন এয়ার-পোর্টে। কোচিন-এর সোঁদা মালয়ালী মাটি দেখে দরবারের প্রাণ ময়ূরের মতই পেখম তুলে নাচার তোড়জোড় শুরু করল। ঠিক এক বছর আগের সেপ্টেম্বরে কেরলের 'আদিবাসী মাটি' নিয়ে খেলতে এসেছিলেন দরবার। সেবার কেরলের পালঘাট ও ইডুকী জেলার অট্টপাডী, মনমানগুডী, কুমডী-র মাটি নিয়ে খেলতে খেলতে 'দরবার' আদিবাসীদের অনেক আশ্বাস দিয়েছিলেন, তাদের আকাংখাও বাড়িয়ে দিয়েছিলেন।

কিন্তু দু'দিন পর দিল্লি দরবারের সঙ্গে সেসবও উড়ে চলে গেল। 'আদিবাসী মাটি' যেমন ছিল তেমনই রইল, শুধু তাতে আশ্বাস আর আকাংখার 'ইনফেকশন' হয়ে গেল। দ্বিতীয়বার যখন 'দরবার' কেরলে পৌঁছলেন তখন এই আদিবাসী কাহিনী নিয়ে মালয়ালী খবরের কাগজগুলো নানা রগরগে কেচ্ছা বার করে ফেলল। অবশ্য মুখ্যমন্ত্রী করুণাকরণ চাননি যে এই শুভ সময়ে এসব 'বাজে কথা' পড়ে 'দিল্লি দরবার' নিজের মুড খারাপ করেন। দরবারের মুডের ওপর কত মানুষের রুটিরুজি নির্ভর করে! কাজেই মণিশংকর তড়পালেন—যদি আকাশও ভেঙে পড়ে পড়ুক। কিন্তু দরবারের মুড একবার খারাপ হলে সাংঘাতিক ব্যাপার হবে। এইসব মালয়ালী কাগজগুলোর ঠিকানা দাও।

করুণাকরণের এক চামচে একরাশ রদ্দি কাগজ এনে হাজির করল মণিশংকরের কাছে। ওদিকে করুণাকরণ নিজের লুঙ্গি সামলে দরবারকে বোঝাতে এলেন। মণিশংকরও রদ্দি কাগজগুলোর সারকথা শোনালেন দরবারকে। কিন্তু কোথায় কি? মুড খারাপ হওয়া তো দূরের কথা, চেহারাতে একটু লাল পর্যন্ত হল না 'দিল্লি দরবার'—এর বড় মানুষের রকম সকম বোঝাই ভার।

দরবারলক্ষ্মী সোনিয়াকে ভি.ভি.আই.পি গেস্ট হাউসে সাজগোজের জন্য নামিয়ে দিয়ে দরবার প্রস্থান করলেন। লক্ষ্মীকে সেখানে স্বাগত জানালেন, গ্রীতি এবং রীনা। এরা দুজনেই কেরলের নামকরা 'মাই ফেয়ার লেডী বিউটি পারলার'-এর কর্মী। করুণাকরণের অনুরোধে লক্ষ্মী সোনিয়া গান্ধীকে সোনিয়া মেনন অথবা সোনিয়া নায়ার তৈরি করার দায়িত্ব নিয়ে এসেছিলেন এই দুজন প্রশিক্ষিতা বিউটিশিয়ান।

কেরলের স্টাইল অনুযায়ী লক্ষ্মীকে কালো শাড়িতে আষ্টেপৃষ্ঠে বেঁধে ফেলা হল। এবার মেকআপের পালা। কিন্তু লক্ষ্মীর আবার 'ডার্ক' মেকআপ পছন্দ নয়। হাল্কা মেকআপের পর মাথায় সাদা চাঁপা ফুলের মালা লাগাতে চাইল বিউটিশিয়ানরা। কিন্তু উত্তর সেই একই—না!

তখন তারা বোঝাল, এটা না লাগালে সোনিয়াকে মেনন বা নায়ারের মত লাগবে না। কাজেই সাদা চাঁপা ফুলের মালা ঝোলানো হল লক্ষ্মীর চুলে। এতক্ষণে মেক্‌আপ সম্পূর্ণ। কোন

মাটি নিয়ে খেলার আগে সেই মাটির মত করেই নিজেকে তৈরি করতে হয়। সোনিয়াকেও কেরলের মাটির উপযোগী বানানো হল। ইতিমধ্যেই শাহানশাহের গাড়ি এসে পৌঁছল ভি.ভি.আই.পি. গেস্ট হাউসের পোর্টিকোতে। তিনি তো নেমেই সোজা পৌঁছলেন লক্ষ্মীর কাছে। একবার তার সাজের দিকে দেখেই বললেন, 'ঠিকই আছে, কিন্তু কালো শাড়ি কেন? কালো রঙটা শোকের চিহ্ন ধরা হয়। বদলাও, তাড়াতাড়ি বদলে ফেল শাড়িটা।' একথা বলেই তিনি পাশের ঘরে পোষাক বদলাতে চলে গেলেন। আগে থেকেই ঠিক দিল্লি দরবারকে কেরলের লুঙ্গি উপহার দেওয়া হবে। ঠিকমত ফিটিংস-এর জন্য দিল্লিতেই এটা তৈরি করানো হয়েছিল। 'দিল্লি দরবার' তো লুঙ্গি পরে নিলেন। কিন্তু কুর্তা পরার সময়ে শাহানশাহের কেমন অস্বস্তি হতে লাগল। তাড়াতাড়ি 'ট্রেন্ড কুকুর' আনানো হল। সে শুঁকে জানিয়ে দিল যে কুর্তা অন্য কারোর সঙ্গে বদলে গেছে। এ কুর্তাটা কেমন যেন বাংলা ঘেঁষা। অর্জুন সিং বেশ সিরিয়াস হয়ে বললেন, 'দিল্লি চলো। নয়তো কুর্তা নিয়ে বাঙালি ও মালয়ালীদের মধ্যে রক্তারক্তি কাণ্ড শুরু হয়ে যাবে। একে এ সময়ে দেশে হাজারো ঝঞ্ঝাট তার ওপর আবার যদি নতুন একটা শুরু হয় তবে আমি যে কোন পক্ষের হয়ে সাক্ষী দেব সেটা ভেবে দেখতে হবে।' কিন্তু করুণাকরণ এ ঘটনায় করুণা-র পরিবর্তে আগুন হয়ে বললেন, 'এ তো মালয়ালীদের অপমান। কেরলে এই কুর্তা এল কি করে?'

একথা শুনে অর্জুন সিং দার্শনিক ভঙ্গীতে জানালেন, 'হে করুণাকরণ আমাদের সৌভাগ্য যে বাঙালি কাপড়ের সিন্দুকে কেরালার যে কুর্তা ঢুকে পড়েছে সেটা এখন কোচিনেরই এয়ারপোর্টের বিমানের মধ্যে পড়ে আছে। আপনি আপনার নিজের কুর্তাটাই দিল্লি দরবারকে পরতে দিন। এতে আপনার সঙ্গে সঙ্গে এ দেশের লোকেদের জীবনও ধন্য হয়ে যাবে।' করুণাকরণের আগুন চোখ মুহূর্তেই নিভে গেল। তিনি নিজের সিন্দুক থেকে কুর্তা এনে দিলেন দিল্লি দরবারকে। সেটা পরে দিল্লি দরবারের কেমন অনুভূতি হয়েছিল তা অবশ্য জানা যায়নি।

ঠিক এই সময় সাদা জরির শাড়ি পরে লক্ষ্মী বাইরে বেরিয়ে এলেন। হই হই করে দিল্লি দরবার ও লক্ষ্মী বেরিয়ে পড়লেন কেরলের মাটি নিয়ে খেলার জন্য। আরব সাগরের 'ব্যাক ওয়াটারের' কাছাকাছি জেলেদের জমায়েতে তাঁরা দুজনের মাটি নিয়ে খেললেন। সে সময় দিল্লি দরবার নৌকা বাইচ দেখছিলেন, ঠিক সে সময় দেড় কি.মি দূরে এক আদিবাসী বুড়ি অধীর আগ্রহে তাঁর জন্য অপেক্ষা করছিল। ঠিক এক বছর আগে এদের আশ্বাস দেওয়া হয়েছিল, চব্বিশ ঘন্টার মধ্যে তাদের বাস করার উপযুক্ত বাড়ি দেওয়া হবে। বাড়ি তৈরি হয়ে গেলেও অ্যালটমেন্ট হয়নি। বুড়িও বাড়ি পায়নি। আজ আবার দিল্লি দরবারের আসার খবরে উৎসাহী হয়ে বুড়ি ভেবেছিল, এবার নিশ্চয়ই সে বাড়ি পাবে। কিন্তু সারাদিন সে শুধু অপেক্ষাই করল আর দিল্লি দরবার খেলা-শেষে ফিরে গেলেন ত্রিবান্দ্রমে।

এবার পুঁরো লোকলস্কর নিয়ে দিল্লি দরবার সোনার বাংলার দিকে উড়লেন সেখানকার মাটি নিয়ে খেলার জন্য। প্রথমেই দিল্লি দরবার জ্যোতি বসুর মুখে ৬৮৪ কোটি টাকা ছুড়ে মারলেন। তিনিও প্রথমে প্রায় কাদার মতই নরম হয়ে গেলেন। কিন্তু তারপরই আবার গরম হয়ে গেলেন। জ্যোতিবাবুর এই নরম গরম হবার মধ্যেই দিল্লি দরবার এই তাড়াহুড়োয় মিঃ দাশমুন্সীকে তিনি বলতে ভুলেই গিয়েছিলেন যে গোর্খাল্যাণ্ড সম্পর্কে কি বলা আর কি না বলা উচিত। দিল্লি দরবার তো অর্জুন সিং-এর ব্রিফিং-এ, গোর্খাল্যাণ্ড আন্দোলন রাষ্ট্রবিরোধী নয় বলে হইচই ফেলে দিলেন। তিনি তো যা করার করে নিলেন কিন্তু দাশমুন্সীর অবস্থা দাঁড়াল বিপর্যস্ত। বাংলার মাটি তাকে রীতিমত দৌড় করিয়ে ছাড়ল। বাধ্য হয়ে তিনি দিল্লি পালালেন। ওদিকে দিল্লি দরবার আমেঠির সতীশ শর্মাকে ডেকে সব ভিডিও টেপগুলো দিয়ে বললেন তার থেকে একটা মাস্টার ভিডিও টেপ বানাতে। যাতে তিনি বুঝতে পারেন দুই প্রদেশের মাটি নিয়ে তার খেলা কতটা জমল। সতীশ টেপ চালান শুরু করলেন আর দাশমুন্সীও বলে বেড়াতে লাগলেন গোর্খাল্যাণ্ড আন্দোলন রাষ্ট্রবিরোধী। অবশ্য একথা বলার আগে তাকে দরবারের অনুমতি নিতে হয়েছিল। কিন্তু অন্যদিকে তখন বুটা সিংকে গোর্খা নেতা ঘিসিং-এর কাছাকাছি করার জন্য শলা-পরামর্শ চলতে লাগল। দরবারি লাল।

সোনার বাংলার সেই রক্তাক্ত দিনগুলি

পূর্ব আর পশ্চিম পাকিস্তানের মধ্যে রাজনৈতিক বীজ উপ্ত হচ্ছিল অর্থনৈতিক বঞ্চনা আর রাজনৈতিক অবহেলার মধ্য দিয়ে। এরই মধ্যে পূর্ব-পাকিস্তানের জনতার আশা আকাঙ্খার রূপটি মূর্ত হচ্ছিল নবগঠিত 'আওয়ামী লীগ'-এর মাধ্যমে, 'বীরোত্তম' বাঘা সিদ্দিকির কলমে সেই সম্ভাবনার ইতিহাস মুখর হয়ে উঠেছে।

টাঙ্গাইল পার্কময়দানের জনসভায় আনোয়ারুল, লেখক এবং মুজিবর রহমান

৮ সেপ্টেম্বর আতাউর রহমান মন্ত্রীসভা দেশরক্ষা আইন বাতিল ঘোষণা করে রাজবন্দীদের মুক্তির আদেশ দিলেন। আতাউর রহমান খান, আবুল মনসুর আহমেদ, শেখ মুজিবর রহমান সহ আরো কয়েক জন মন্ত্রী ঢাকা কেন্দ্রিয় কারাগারে গিয়ে মুক্ত রাজবন্দীদের অভ্যর্থনা জানালেন। রাজবন্দীরাও নিজেদের খরচে জেলের চত্বরে মন্ত্রীদের সম্বর্ধনা জানানোর জন্য এক মঞ্চ তৈরি করেছিলেন। মন্ত্রীদের সাথে রাজবন্দীদের মিলন, সে এক অভূতপূর্ব দৃশ্য। আতাউর রহমান খান ও শেখ মুজিবর, সরকারের তরফ থেকে রাজবন্দীদের অভিনন্দন জানিয়ে বললেন, 'আপনারা দেশের সম্পদ, কিন্তু আপনারা স্বৈরাচারের হাতে বন্দী ছিলেন। আজ আপনারা মুক্ত। আমাদের নতুন প্রচেষ্টায় আপনাদের পূর্ণ সহযোগিতা যে পাব এ ব্যাপারে আমরা নিশ্চিত।'

হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী প্রধানমন্ত্রী :

পাকিস্তানের রাজধানী করাচিতে সোহরাওয়ার্দী তখন রিপাবলিকান দলের নেতাদের ও প্রেসিডেন্ট মির্জার সাথে ঘন ঘন আলোচনা করছিলেন। প্রেসিডেন্ট মির্জার অনুরোধ, 'সোহরাওয়ার্দী তাঁর নেতৃত্বে নতুন মন্ত্রীসভা গঠন করুন।' সোহারাওয়ার্দী সাহেব যখন পররাষ্ট্র দফতর নিজের হাতে রাখতে চাইলেন, তখন প্রেসিডেন্ট মির্জা তাকে পরিষ্কার জানিয়ে দিলেন, ওটা হবার নয়। পররাষ্ট্র দফতর পাবে রিপাবলিকান দলের নেতা ফিরোজ খান নুন।' ১১ সেপ্টেম্বর হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীর নেতৃত্বে পাকিস্তানের নতুন মন্ত্রীসভা গঠিত হল। পশ্চিমী শাসক চক্রের এ আর এক ষড়যন্ত্র।

পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী হওয়ার পর ১৩ সেপ্টেম্বর সোহরাওয়ার্দী ঢাকায় এলেন। তাঁর সম্মানে পল্টন ময়দানে বিরাট সম্বর্ধনার আয়োজন করা হয়। মৌলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী, আতাউর রহমান খান, আবুল মনসুর আহ্মেদ, শেখ মুজিবর রহমান ও মালাম খানের মত আওয়ামী মুসলিম লীগের নামকরা নেতারা প্রায় সবাই পল্টন ময়দানে উপস্থিত। মৌলানা ভাসানী তাঁর স্বাগত ভাষণে আক্রমণাত্নক ভঙ্গিতে বললেন, '১৫ দিনের মধ্যে যদি কেন্দ্রিয় সরকার পূর্ববাংলার প্রয়োজনীয় খাদ্য পাঠাতে না পারে, তবে কেন্দ্র ও রাজ্যের আওয়ামী মুসলিম লীগ মন্ত্রীদের পদত্যাগ করতে হবে। মন্ত্রীত্বের লোভে আদর্শ জলাঞ্জলি দেওয়া যাবে না।' তিনি আরও বলেন, 'মন্ত্রীরা যেন ভুলে না যান যে, দেশে পূর্ণ গণতান্ত্রিক শাসন, পূর্ববাংলার আত্মনিয়ন্ত্রণ অধিকার: পশ্চিমী যুদ্ধ জোট বর্জন, প্রভৃতি ব্যাপারে আওয়ামী মুসলিম লীগ পূর্ববাংলার মানুষের কাছে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।' শেখ মুজিব তাঁর ভাষণে বললেন, 'আমাদের স্বাধীকারের প্রশ্নে পররাষ্ট্র নীতি কি হবে, আশা করি আমার নেতা এই বিষয়ে পরিষ্কার করে বলবেন।' মৌলানা ভাসানী ও শেখ মুজিবের কথায় প্রধানমন্ত্রী সোহরাওয়ার্দী কিছুটা উত্তেজিত হয়েছিলেন, কিন্তু তা বাইরে প্রকাশ করেন নি। তিনি তাঁর ভাষণে বললেন, 'খাদ্য পরিস্থিতি মোকাবিলার জন্য আমি ইতিমধ্যে ভারতের প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহরুর কাছে ত্রিশ হাজার টন খাদ্য চেয়ে চিঠি লিখেছি। তিনি খাদ্য পাঠাবার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। মৌলানা ভাসানী সাহেব বলেছেন ১৫ দিনের মধ্যে খাদ্যের ব্যবস্থা করতে না পারলে মন্ত্রীসভাকে পদত্যাগ করতে। আমি কথা দিচ্ছি, ১৫ দিনের মধ্যে সমস্ত কিছু মোকাবিলা করতে না পারলেও কেন্দ্রিয় সরকার ১৭ হাজার টন খাদ্য পূর্ববঙ্গে পাঠাবে।' তিনি আরও বলেন, 'আমি যখন পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী হতে পেরেছি তখন আর পূর্ববঙ্গের স্বায়ত্তশাসনের জন্যে আপনাদের তেমন ভাবতে হবে না। আপনারা ধরে নিতে পারেন পূর্ববাংলার ৯৮ ভাগ স্বায়ত্তশাসন ইতিমধ্যেই পাওয়া হয়ে গিয়েছে। আর মৌলানা ভাসানী সাহেব, আতাউর রহমান খান ও শেখ মুজিব যখন রয়েছেন তখন বাকিটুকুও আপনারা পাবেন।'

এ যেন একপাত দুধে একটু তেঁতুল ফেলে দেওয়ার অবস্থা। যাঁরা এক বুক আশা নিয়ে হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীকে সম্বর্ধনা জানাতে এসেছিলেন তাঁদের বুকটা যেন ভেঙে গেল। মৌলানা ভাসানী তো তখনই রাগে গরগর করতে করতে কিছু বলতে যাচ্ছিলেন। প্রিয় নেতা হওয়া সত্ত্বেও শেখ মুজিব সোহরাওয়ার্দী সাহেবের এই অদ্ভুত ও

উদ্ভট উক্তি সহজভাবে নিতে পারলেন না। পল্টনের সম্বর্ধনা শেষে বেইলী রোডের সার্কিট হাউস চত্বরে সোহরাওয়ার্দী সাহেবের সম্মানার্থে একটি নাগরিক সম্বর্ধনা ছিল । প্রধানমন্ত্রী হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী পৌঁছানোর আগেই মৌলানা ভাসানী সেখানে উপস্থিত হয়ে ক্রোধে ফেটে পড়ে সমবেতদের বলেন, 'শহীদ পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী হয়েছে, তাতেই পূর্ববাংলার ৯৮ শতাংশ স্বায়ত্তশাসন আদায় হয়ে গিয়েছে–এই ধরনের উদ্ভট কথাবার্তা যে বলে, সে প্রধানমন্ত্রীর গদিতে বসে হয় পাগল হয়ে গেছে, না হয় ও এর মধ্যেই পশ্চিমীদের দালাল হয়েছে। আমি আপনাদের কাছে মাফ চাইছি, আমি এই ধরনের নাফরমানকে সম্বর্ধনা দিতে পারি না। এমনকি তার সম্বর্ধনা সভায় উপস্থিত থেকে মানুষের সাথে বিশ্বাসঘাতকতাও করতে পারব না। আমার শরীরে বিশ্বাসঘাতকের রক্ত নেই। সোহরাওয়ার্দী সাহেব সার্কিট হাউস প্রাঙ্গণে উপস্থিত হওয়ার সাথে সাথে সত্যি সত্যি মৌলানা ভাসানী সভাস্থল ত্যাগ করেন ।

প্রধানমন্ত্রী হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী তাঁর নির্দিষ্ট আসন গ্রহণ করলেন। মৌলানা ভাসানীর জন্য বেশ কিছু সময় অপেক্ষা করা হল। অল্পক্ষণের মধ্যে তাঁদের জানতে বাকি রইল না যে, মৌলানা ভাসানী ইতিমধ্যেই সেখানে উপস্থিত হয়ে সমবেত দলীয় কর্মী এবং নাগরিকদের কাছে তাঁর বক্তব্য পেশ করে ঘৃণাভরে চলে গিয়েছেন। পরে আবদুর রশিদ তর্কবাগীশকে সভাপতি করে সম্বর্ধনা সভার কাজ শুরু হল । যথারীতি মানপত্র পাঠ, এবং আতাউর রহমান খান ও আবুল মনসুর আহমেদের বক্তৃতার পর শেখ মুজিবর রহমান তাঁর বক্তব্য পেশ করতে উঠলেন । পার্টির সাধারণ সম্পাদক হিসাবে শেখ মুজিব আগাগোড়া শান্তভাবে সভা পরিচালনা করছিলেন। বক্তব্য পেশ করতে গিয়ে কিন্তু শেখ মুজিবের অন্য মূর্তি দেখা গেল। যিনি একটু আগে পল্টন ময়দানে তাঁর স্বাগত ভাষণে পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রীকে একজন বীর, ত্যাগী ও দেশপ্রেমিক নেতা হিসাবে বর্ণনা করে উদাত্ত কণ্ঠে বারবার অধিকার আদায়ের সংগ্রামে সক্রিয় হয়ে সোহরাওয়ার্দীর হাতকে শক্তিশালী করতে জনগণকে অনুরোধ জানাচ্ছিলেন, সেই তিনি রাগে, দুঃখে, ও অভিমানে ফেটে পড়লেন। প্রধানমন্ত্রীকে কোন সম্বোধন না করে সমবেত জনতাকে সালাম জানিয়ে বলেন, 'একজন মানুষ পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী হল, আর সাড়ে পাঁচ কোটি বাঙালী ৯৮ শতাংশ স্বাধীকার পেয়ে গেল–এ ধরনের কথা ভাবতেও ঘৃণাবোধ হয়। হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী হয়েছেন, তাতে কি আমার দেশের ভুখা-নাঙ্গা মানুষগুলোর পেট ভরেছে ? আপনারাই বলুন, এই কোট-প্যান্ট পরা ভদ্রলোকটি যদি পেটপুরে খান তাতে কি আপনাদের পেট ভরবে ? আমি শেষবারের মত হুঁশিয়ার করে দিতে চাই, বাংলাদেশের সংগ্রামী মানুষ এবং আওয়ামী মুসলিম লীগের কর্মীরা কারও কথায় ভুলবেন না, সে ভাসানী, সোহরাওয়ার্দী, আতাউর রহমান কিংবা শেখ মুজিব, যেই হোন। বাংলার মানুষ তার অধিকার চায় । সোহরাওয়ার্দী সাহেব যেন না ভাবেন তাকে বাংলার মানুষ 'সোল এজেন্সি' দিয়ে দিয়েছে। সাতদিন আগেও যাদের জন্য ভুখা মিছিল করেছি তাদেরকে ভুখা রেখে সোহরাওয়ার্দী সাহেব মন্ত্রীত্ব করলেও আমি শেখ মুজিব ওরকম মন্ত্রীত্বের লোভ করি না। নেতাকে সংশোধিত হতে অনুরোধ করছি ।'

সোহরাওয়ার্দী সাহেব সম্বর্ধনার জবাবে শুধু বলেন, 'আমি আপনাদের জন্য রাতদিন কাজ করব, শেখ মুজিব আমার কথার ভুল অর্থ করেছে। আমি আপনাদের অধিকার আদায় করে ছাড়ব, আমার উপর আপনারা বিশ্বাস রাখুন ।'

আওয়ামী মুসলিম লীগ গঠনের পর সারা দেশের প্রগতিশীল হিন্দু-মুসলমান, বৌদ্ধ-খৃষ্টান নানা বর্ণের নানা সম্প্রদায়ের হাজার লোক দলের পতাকাতলে সমবেত হতে থাকেন। বাহান্নর ভাষা আন্দোলনের পর দলের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিরা বিশেষ করে শেখ মুজিবর রহমান, তাজুদ্দীন আহমেদ, শামসুজ্জোহা ও অন্যান্যরা জোরদার বক্তব্য রাখতে থাকেন যে, দলের নামের সাথে 'মুসলিম' শব্দটি সংশ্লিষ্ট থাকা নিষ্প্রয়োজন। এতে দলের সর্বস্তরে একটা আলোচনা চলতে থাকে। দলের নাম আওয়ামী মুসলিম লীগ থাকলেও তাতে হাজার হাজার অন্য ধর্মের বাঙালীরাও সদস্য হয়েছিলেন । শুধুমাত্র সদস্য নয়, জেলা ও মহকুমা পর্যায়ের অনেক কমিটিতে তাঁরা নেতৃত্বের আসন অলংকৃত করেছিলেন । ঐইসব কারণ ও সামাজিক চেতনার অগ্রগতির সাথে সামঞ্জস্য রেখে দলের নাম থেকে 'মুসলিম' শব্দটি বাদ দেওয়া সত্যি অত্যন্ত জরুরি হয়ে পড়েছিল। কোটারী মুসলিম লীগের বিরুদ্ধে প্রথম আঘাত হানার জন্য নেতৃবৃন্দ পূর্ববাংলার সাধারণ মুসলমানদের মানসিকতার প্রতি দৃষ্টি রেখে নব গঠিত দলের নাম আওয়ামী মুসলিম লীগ রেখেছিলেন ।

আওয়ামী লীগ :

নেতাদের প্রথম ও প্রধান বক্তব্য ছিল মুসলিম লীগ আর জনগণের প্রতিষ্ঠান নয়। মুসলিম লীগ বর্তমানে মাত্র কয়েকজনের ব্যক্তি সম্পত্তিতে পরিণত হয়েছে। আওয়ামী মুসলিম লীগই সত্যিকার আম জনতার দল । ('আওয়ামী' শব্দের অর্থ সাধারণ জনগণ) এই বক্তব্য সামনে রেখে তাঁরা দীর্ঘপথ অতিক্রম করেছেন । '৫৪র নির্বাচনের পর আওয়ামী মুসলিম লীগই যে সত্যিকার আম জনতার দল সেটা যেমন নেতারা ও কর্মীরা বুঝতে

সোহরাওয়ার্দি উদ্যানের ঐতিহাসিক জনসভায়

পেরেছিলেন, তেমনি সাধারণ মানুষও আওয়ামী মুসলিম লীগকে দৃঢ় আস্থা ও বিশ্বাসের সাথে নিজেদের দল হিসাবেই গ্রহণ করেছিলেন। তাই 'মুসলিম' শব্দটি একেবারে অপ্রয়োজনীয় হয়ে পড়েছিল।

'৫৫ সালের অক্টোবর মাসে আওয়ামী মুসলিম লীগের এক কাউন্সিল অধিবেশনে দলের সাধারণ সম্পাদক শেখ মুজিব দাবি জানালেন, 'এখন আর দলের নামের সাথে 'মুসলিম' শব্দটি থাকার কোন মানে হয় না। মুসলিম কথাটি বাদ দিয়ে দলের নাম শুধু 'আওয়ামী লীগ' করা হউক।' তিনি আরও বলেন, 'পূর্ববাংলা ও পাকিস্তান শুধুমাত্র মুসলমানদের নয়, পূর্ববাংলা হিন্দু-মুসলমান, বৌদ্ধ-খৃষ্টান সকলের মাতৃভূমি। তাই আওয়ামী লীগ ধর্ম-বর্ণ সম্প্রদায় নির্বিশেষে সকলেরই দল। লীগের নামের সাথে 'মুসলিম' কথাটি একেবারে বেমানান।' ঢাকার সদর ঘাটে আওয়ামী মুসলিম লীগের সদর দফতরে অনুষ্ঠিত কাউন্সিল অধিবেশনে শেখ মুজিবের এই দাবিটি প্রস্তাব আকারে পেশ করা হলে, উপস্থিত আটশত কাউন্সিলার ও কয়েক হাজার ডেলিগেট মুহূর্মুহূ 'হিন্দু মুসলিম ভাই ভাই' ধ্বনি তুলে সর্বসম্মতিক্রমে গ্রহণ করেন। এই প্রস্তাব গৃহীত হবার সাথে সাথে আওয়ামী লীগ একটি পরিপূর্ণ অর্থে অসাম্প্রদায়িক রাজনৈতিক সংগঠনে পরিণত হয়। এই কাউন্সিল অধিবেশনে ধর্ম-নিরপেক্ষতা ও গণতন্ত্রে আওয়ামী লীগের গভীর আস্থা সম্বলিত একটি প্রস্তাবও পাশ করা হয়।

উক্ত প্রস্তাব পেশ করার সময় অবশ্য কয়েকজন সদস্য দলের নাম থেকে মুসলিম শব্দ বাদ দেওয়ার তীব্র বিরোধিতা করতে থাকেন। সমস্ত হলময় 'হিন্দু মুসলিম ভাই ভাই' শ্লোগানে তাঁদের কণ্ঠ চাপা পড়লেও তাঁরা 'না' 'না' করে হল থেকে বেরিয়ে যান।

শহীদ সোহরাওয়ার্দী প্রধানমন্ত্রী হয়েই পূর্ববঙ্গের রাজধানী ঢাকায় পাকিস্তান জাতীয় পরিষদের অধিবেশন ডাকেন। অধিবেশনের শুরুতে সবাইকে হতবাক করে দিয়ে স্বয়ং প্রধানমন্ত্রী সোহরাওয়ার্দী যুক্ত নির্বাচনের বিল আনেন। বিলের বিরোধিতা করে মুসলিম লীগের মিঞা মোহাম্মদ দৌলতানা, আই.আই. চুন্দ্রীগড়, ইউসুফ হারুন ঘন্টার পর ঘন্টা বক্তৃতা করলেন। বক্তৃতার উদ্দেশ্য আর কিছু না, সময় নষ্ট করা। বিরামহীন ২২ ঘন্টা বিতর্কের পর ১১ অক্টোবর ভোরে যুক্ত নির্বাচনের বিলটি পরিষদে প্রস্তাব আকারে গৃহীত হল। শেখ মুজিবর রহমান পূর্ববঙ্গের অন্যতম মন্ত্রী হিসাবে জাতীয় পরিষদের ভি.আই.পি. গ্যালারিতে এই ২২টি ঘন্টাই নির্বিকার বসেছিলেন। যদিও মাঝে মধ্যে তাঁর কাছে সরকারি ফাইলপত্র দেওয়া হচ্ছিল এবং তিনি ফাইলগুলো দেখে সইও করছিলেন। তবে সেদিন তাঁর সমস্ত মনপ্রাণ যুক্ত নির্বাচনী বিলের উপর নিবদ্ধ ছিল। বিলটি পাশ হয়ে গেলে তিনি দর্শক গ্যালারীতেই উচ্ছ্বাসে ফেটে পড়েন এবং প্রধানমন্ত্রীকে পুনঃপুনঃ অভিনন্দন জানান। কিন্তু আওয়ামী লীগ নেতাদের উচ্ছ্বাস

কয়েকজন সদস্য দলের নাম থেকে মুসলিম শব্দ বাদ দেওয়ার তীব্র বিরোধিতা করতে থাকেন। সমস্ত হলময় 'হিন্দু মুসলিম ভাই ভাই' শ্লোগানে তাঁদের কণ্ঠ চাপা পড়লেও তারা 'না' 'না' করে হল থেকে বেরিয়ে যান।

বেশি সময় স্থায়ী হল না।

কয়েক ঘন্টা বিরতির পর অধিবেশন আবার শুরু হলে পররাষ্ট্র মন্ত্রী ফিরোজ খান নুন পাকিস্তানের প্রতিরক্ষা চুক্তির সমর্থনে একটি বিল উত্থাপন করে বললেন, 'পাকিস্তানের অবশ্যই প্রতিরক্ষা চুক্তিতে অংশ নেওয়া উচিত।' যেহেতু ফিরোজ খান নুনের রিপাবলিকান দলই জাতীয় পরিষদে সংখ্যা গরিষ্ঠ, সেইহেতু আওয়ামী লীগের একমাত্র সদস্য সিলেটের নুরুল রহমানের বিরোধিতা ছাড়া প্রতিরক্ষা বিলটি আর কোন বিরোধিতার সম্মুখীন হয়নি। কারণ জাতীয় পরিষদে আওয়ামী লীগের ১৩ জন সদস্যের মধ্যে ১২ জনই মন্ত্রী। মন্ত্রীদের সরকারি প্রস্তাবের বিরুদ্ধে পরিষদে কথা বলার সুযোগ নেই। আওয়ামী লীগের সামনে তখন মাত্র দু'টি রাস্তা খোলা ছিল। হয় চোখ-কান বুজে প্রস্তাব মেনে নেওয়া, না হয় মন্ত্রীপদে ইস্তফা দিয়ে সাধারণ সদস্য হিসাবে বিলের বিরোধিতা করা। সেদিন আওয়ামী লীগের মন্ত্রীরা পদত্যাগের পথে যান নি। তাই অনায়াসে ফিরোজ খান নুনের আনা বিলটি জাতীয় পরিষদে পাশ হয়ে যায়। যুক্ত নির্বাচনী বিল পাশ হওয়াতে মৌলানা ভাসানী, শেখ মুজিব ও অন্যান্যরা যতটা খুশি হয়েছিলেন, কয়েক ঘন্টা পর প্রতিরক্ষা বিল পাশ হওয়ায় তাঁরা ঠিক ততটা ব্যথিত হলেন। কারণ '৫৪ সালের নির্বাচনের সময় আওয়ামী লীগ বারবার ওয়াদা করেছিল পাকিস্তানের পররাষ্ট্র নীতি হবে জোট নিরপেক্ষ। আওয়ামী লীগ কোনমতেই প্রতিরক্ষা জোটের নীতিকে সমর্থন করে না, করবে না।

এ সময় মৌলানা ভাসানীর মন সোহরাওয়ার্দীর প্রতি ঘৃণা ও সন্দেহে ভরে গিয়েছিল।

প্রধানমন্ত্রী হওয়ার দুই মাসের মধ্যে হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী শুভেচ্ছা সফরে চীনে যান। যাবার সময় অস্থায়ীপ্রধানমন্ত্রীর দায়িত্ব দিয়ে যান আবুল মনসুর আহমেদকে। কলম্বো গোষ্ঠীভুক্ত দেশগুলির সরকার প্রধানদের একটি সম্মেলন দিল্লিতে হওয়ার কথা ছিল। যেহেতু পাকিস্তানও এই গোষ্ঠীভুক্ত ছিল, সেহেতু চীন সফরের আগে ভারতের প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহরুকে এক বার্তায় সোহরাওয়ার্দী জানিয়েছিলেন, তিনি ঐ সম্মেলনে অংশ গ্রহণ করবেন। প্রধানমন্ত্রী যখন চীন সফর করছিলেন তখন পাকিস্তানের পররাষ্ট্রমন্ত্রী ফিরোজ খান নুন পেশোয়ারে ঘোষণা করেন, 'আমেরিকার সাথে পাকিস্তানের প্রতিরক্ষা চুক্তিটি যাতে আটলান্টিক চুক্তির মত রূপ নেয়, তা সুনিশ্চিত করতে সম্ভাব্য সব রকম চেষ্টাই তিনি করবেন।'

চীন সফর শেষে প্রধানমন্ত্রী দিল্লির কলম্বো সম্মেলনে অংশ না নিয়ে 'বাগদাদ চুক্তির' এক গোপন বৈঠকে যোগ দিতে প্রেসিডেন্ট মির্জার সাথে সোজা তেহরান চলে যান। সে সময় তাঁর মিশর সফরেরও কথা ছিল। জোট নিরপেক্ষতার বরখেলাপ করে 'বাগদাদ চুক্তি' বৈঠকে অংশ গ্রহণ করায় জোট নিরপেক্ষ আন্দোলনের অন্যতম স্তম্ভ, মিশরের তৎকালীন প্রেসিডেন্ট আবু নাসের পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী সোহরাওয়ার্দীকে অবাঞ্ছিত ব্যক্তি ঘোষণা করে মিশরে ঢুকতে দিতে অস্বীকার করেন। বাগদাদ থেকে প্রেসিডেন্ট মির্জার সাথে প্রধানমন্ত্রী করাচি ফিরে এলে উদ্বিগ্ন ভাসানী তাঁকে তারবার্তা পাঠান। তারবার্তায় বলা হয়, 'তুমি যে বাগদাদ গিয়েছিলে, তা সম্পূর্ণ তোমার নিজেরই দায়িত্বে। তোমার তেহরান সফরের পিছনে আওয়ামী লীগের কোন সমর্থন নেই।'

বিব্রত প্রধানমন্ত্রী ৩ ডিসেম্বর ঢাকায় এসে আবার আর এক অবাক কাণ্ড করে বসেন, যা তাঁর পরবর্তী রাজনীতিতে প্রচণ্ড আত্মঘাতী হয়েছিল। তিনি শুধু তাঁর নিজের দল আওয়ামী লীগ সদস্যদের বিরুদ্ধে বিষোদগার করে ক্ষান্ত হলেন না, আরও এক ধাপ এগিয়ে বললেন, 'যারা পাকিস্তানের প্রতিরক্ষা চুক্তির বিরোধিতা করছে, তারা ভারতের কেনা গোলাম।'

আওয়ামী লীগের সভাপতি মৌলানা ভাসানী সেই সময় বরিশালে সভা-সমিতি করে বেড়াচ্ছিলেন। তখন সারা বাংলায় ব্যাপক খাদ্য সমস্যা চলছিল। প্রধানমন্ত্রী ঢাকায় এসে তাঁর কাছে দূত পাঠালেন। তিনি মৌলানা ভাসানীর সাথে প্রয়োজনে বরিশালে গিয়েও দেখা করতে ইচ্ছুক। উত্তরে মৌলানা ভাসানী বলে পাঠালেন, শহীদকে যাইয়া বল সে পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী হয়েছে, পূর্ববাংলার মানুষকে খেতে দিক। শহীদের সাথে কথা বলার সময় আমার এখন নেই। আমি প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে কথা বলার জন্যে ভূখা-নাঙ্গা মানুষের পাশ থেকে এই সময় চলে যেতে পারি না।

কাঠগড়ায় অশোক সেন

'পেন কোর্ট' এবং দূরে সেই বিতর্কিত কার পার্কিং- এর জায়গা ।

ভারতের আইনমন্ত্রী অশোক সেনের নামে বেআইনি বাড়ি কনস্ট্রাক্শনের অভিযোগ কেন ? সম্প্রতি তাঁর নামে জাজেস কোর্ট রোডের বাড়ি নিয়ে মামলা রুজু হয়েছে। বহু ঐতিহাসিক মামলায় জয়ী ভারতের আইনরক্ষকের বিরুদ্ধে কেন আইন লঙ্ঘনের অভিযোগ ? আর সে অভিযোগ কতখানি সত্য ? নিজস্ব প্রতিনিধির আলোকপাত।

বিশিষ্ট আইনজীবী এবং ভারতের আইন ও বিচার বিভাগীয় মন্ত্রী স্বনামধন্য অশোক সেনকে সম্প্রতি কাঠগড়ায় দাঁড়াতে হয়েছিল। তা নিয়ে কলকাতার রাজনৈতিক মহলে নানান গুঞ্জন । গুঞ্জন থেকে গুজব-দানা বাঁধে মহানগরীর আনাচে-কানাচে । একজন প্রথিতযশা আইনজীবী যাঁর দক্ষ সওয়ালে বিরোধীপক্ষ হয় দিশেহারা, যিনি বহু ঐতিহাসিক মামলায় জয়ী হয়েছেন, প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীকেও যিনি উদ্ধার করেছিলেন নির্বাচনে কারচুপির চাঞ্চল্যকর অভিযোগ থেকে, এবং যিনি গোটা দেশের আইনরক্ষক তাঁর বিরুদ্ধেই আইন লঙ্ঘনের অভিযোগ !

বিতর্কের সূত্রপাত কলকাতা হাইকোর্টের একটি নির্দেশকে কেন্দ্র করে। 'পেন প্রোপারটিজ' নামে একটি কনস্ট্রাকশন সংস্থা ৫ বি, জাজেস কোর্ট রোডে যে বহুতল বাড়ি নির্মাণ করছিল, সম্প্রতি কলকাতা হাইকোর্ট সে ব্যাপারে একটি নিষেধাজ্ঞা জারি করে বলেছেন, বাড়িটির প্ল্যানিং—এ কারচুপি করা হয়েছে। 'পেন প্রোপারটিজ' সংস্থার অন্যতম অংশীদার কেন্দ্রিয় আইনমন্ত্রী অশোক সেন নিজে এবং অন্যান্য অংশীদাররা ও তাঁর পরিবারের লোক, যাঁদের মধ্যে আছেন অশোকবাবুর স্ত্রী অঞ্জনা সেন, মেয়ে কৃষ্ণা ও শ্যামলী এবং পুত্র অনিন্দ্য সেন ।

১৯৬১ সালে অশোকবাবু ও তাঁর স্ত্রী অঞ্জনা সেন পাশাপাশি দুটি জমি কেনেন ৬-এ, পেন কোর্ট রোড এবং ৫ জাজেস কোর্ট রোডে। দেড় বিঘা আয়তনের ওই জমি দুটি পরে সংযুক্ত হয়। পুরসভার অনুমোদন পাবার পর সংযুক্ত জমিটির ঠিকানা হয় ৫ বি, জাজেস কোর্ট রোড। অশোকবাবুদের 'পেন প্রোপারটিজ' সংস্থা ১৯৭১ সালে সেখানে উত্তরদিক বরাবর একটি বাইশ তলা বাড়ি বানাতে শুরু করেন। বাড়ির নাম দেওয়া হয় 'পেন কোর্ট'। ১৫৬ ফুট চওড়া এবং ১৫৪ ফুট লম্বা কেতাদুরস্ত অবস্থায়। আর গোটা কমপ্লেক্সটি ঘেরা রয়েছে ১৫৪ ফুট লম্বা নিচু দেওয়াল দিয়ে। 'পেন কোর্ট'—এর বাইশটি ফ্লোরের মধ্যে উনিশটি ইতিমধ্যে বিক্রি হয়েগেছে। বিশাল বাড়িটির দক্ষিণ দিক ছিল ফাঁকা ।

১৯৮৫ সালে পেন প্রোপারটিজ আরেক কনস্ট্রাক্শন সংস্থা ভবানী ডেভেলপারের সঙ্গে একটি চুক্তি করে দক্ষিণ দিকের খালি জায়গাটি বিক্রি করে দেয়। চুক্তি অনুযায়ী পেন কোর্টের দক্ষিণ দিকের ফাঁকা জমিতে আরেকটি বহুতল বাড়ি তৈরির পরিকল্পনা হয়। পরে পুরসভার অনুমোদন সাপেক্ষে সেখানে বাড়ি তৈরির কাজও শুরু হয় ১৯৮৬ সালের গোড়ার দিকে। বহুতল বাড়ি।

কিন্তু নতুন বাড়িটির কাজ শুরু হবার পরই দেখা গেল 'পেন কোর্ট'—এ কার পার্কিং—এর জায়গাতেও খোঁড়াখুঁড়ি শুরু হয়েছে। 'পেন কোর্ট'—এর বাসিন্দারা স্বাভাবিকভাবেই এর প্রতিবাদ করেন। কিন্তু কোন বিহিত না হওয়ায় তাঁরা শরণাপন্ন হন স্থানীয় পুলিশ ও পুরসভার। কিন্তু পুরসভায় খোঁজ খবর করতে গিয়ে তাঁদের চক্ষু স্থির। কারণ প্ল্যানটিতে দশ হাজার ফুট অতিরিক্ত জমির কথা লেখা রয়েছে। প্রয়োজনে আরও কয়েকটি বাড়তি ফ্লোর তৈরির প্ল্যানও অনুমোদিত ।

অগত্যা পেন কোর্টের বাসিন্দারা গত ১২ এপ্রিল, প্ল্যানটি বাতিল করার জন্য পুরসভার কাছে আবেদন করেন। তাঁদের আরও অভিযোগ, ১৯৭১ সালে যখন ল্যাণ্ড সিলিং অ্যাক্ট কার্যকর হয়, তখন অশোকবাবু দক্ষিণ দিকের ফাঁকা জায়গাটুকু বাঁচাবার ১৫৪ ফুট লম্বা ওই চৌহদ্দি ঘেরা দেওয়ালটি ভাঙার অনুমতি চেয়েছিলেন। কথা ছিল কিছুদিন পরই পাঁচিলটি আবার যথাস্থানে তৈরি করে
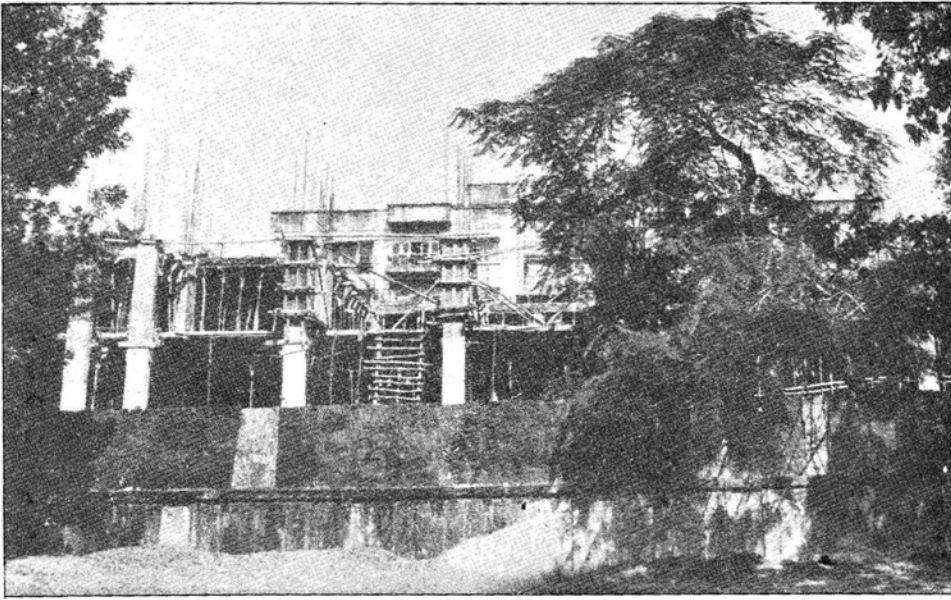
পুরসভার নির্দেশে বন্ধ হয়ে আছে নির্মিয়মান বাড়ির কাজ।

কাজ বন্ধ হওয়া বাড়ি টে পুলিশ প্রহরা।

দেওয়া হবে।

এদিকে আবার কয়েকজন বিক্ষুব্ধ বাসিন্দা ওই বেআইনি প্ল্যান অনুমোদন করার জন্য পুরসভার বিরুদ্ধে আবেদন করেন কলকাতা হাইকোর্টে। হাইকোর্ট কর্পোরেশনকে বিষয়টি পুনর্বিবেচনা করার নির্দেশ দেন।

গত ১২মে, সরাসরি পেন প্রোপারটিজ এবং ভবানী ডেভেলপারের বিরুদ্ধেও মামলা ঠুকে দেন আরেক দল বাসিন্দা। তাঁরা বাড়ি তৈরির ওপর নিষেধাজ্ঞা প্রার্থনা করেন। ১৬ জুলাই, আলিপুরের সেকেণ্ডমুন্সেফের আদালতে অবশ্য সে মামলা বাতিল হয়ে যায়।

আইনমন্ত্রী অশোক সেনকে নিয়ে গুঞ্জনের সূত্রপাত এখান থেকেই। প্রশ্ন উঠেছে আইনমন্ত্রী নিজেই কি বে-আইনি বাড়ি কনস্ট্রাকশনে যুক্ত? সম্প্রতি তাঁর বিরুদ্ধে কয়েক লক্ষ টাকা পুরকর ফাঁকি দেবার অভিযোগও উঠেছে। সব মিলিয়ে তাঁর বিরুদ্ধে গুজব বেশ জমজমাট। অবশ্য গুজবের পিছনে তেমন প্রমাণ কই? স্বাভাবিকভাবেই পাঠকদের কৌতূহল নিরসন করতে আমাদেরও বিষয়টির অনুসন্ধানে নামতে হয়েছে।

অধুনা বাংলাদেশের ফরিদপুরে অশোক কুমার সেনের জন্ম হয় ১০ অকটোবর ১৯১৩ সালে। সাহিত্য এবং বিজ্ঞান দুটি বিষয়েই স্নাতকোত্তর ডিগ্রী নিয়ে তিনি কৃতিত্বের সঙ্গে ব্যারিস্টারি পাস করেন বিলাত থেকে। তারপর আইন ব্যবসার পাশাপাশি শুরু হয় রাজনীতি ও সাংবাদিকতা।

১৯৫৭ থেকে ১৯৬৬ পর্যন্ত তিনি একটানা কেন্দ্রিয় মন্ত্রীসভার সদস্য ছিলেন। সাময়িক বিরতির পর ১৯৮৪ থেকে আবার তিনি কেন্দ্রিয় মন্ত্রীসভায় বহাল হয়েছেন আইন ও বিচার মন্ত্রী হিসাবে। কলকাতা উত্তর-পশ্চিম তাঁর নির্বাচনী কেন্দ্র।

১৯৪১-৪৩ পর্যন্ত তিনি কলকাতার সিটি কলেজে অধ্যাপনাও করেছেন। বিষয়: অর্থনীতি বাণিজ্যিক আইন। ১৯৫৫ সালে অশোকবাবু রাষ্ট্রসংঘে ভারতের প্রতিনিধিও ছিলেন। এছাড়া রাষ্ট্রসংঘ আয়োজিত সাগ আইন বিষয়ক সম্মেলনে তিনি জেনিভায় ভারতীয় প্রতিনিধি দলের নেতৃত্ব করেন। টোকিও এবং দিল্লিতে মানবাধিকার সংক্রান্ত বিষয়েও তিনি ভারতের প্রতিনিধিত্ব করেন। এছাড়া আরও বহু ক্লাব, সাংস্কৃতিক সংস্থার সঙ্গেও ভারতের আইনমন্ত্রী ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত।

বিষয় বাণিজ্য: ভাষণরত অশোক সেন।

আইনমন্ত্রী অশোক সেনকে নিয়ে গুঞ্জনের সূত্রপাত এখান থেকেই। প্রশ্ন উঠেছে আইনমন্ত্রী নিজেই কি বে-আইনি বাড়ি কনস্ট্রাক্শনে যুক্ত? সম্প্রতি তাঁর বিরুদ্ধে কয়েক লক্ষ টাকা পুর কর ফাঁকি দেবার অভিযোগও উঠেছে। সব মিলিয়ে তাঁর বিরুদ্ধে গুজব বেশ জমজমাট!

এহেন জনপ্রিয় অশোকবাবুর বিরুদ্ধে তাঁর বাড়ির বাসিন্দারাই আইনের আশ্রয় প্রার্থনা করেছেন। ১৬ জুলাই, আদালতে শুনানির সময় বেশ কিছু প্রামাণ্য ফটোগ্রাফ্‌সও তাঁরা পেশ করেন। সেই ফটোতে দেখা যায় বিতর্কিত পাঁচিলটির অবস্থান পেন রোড থেকে ১৫৪ ফুট দূরে। অথচ পেন প্রোপারটিজ এবং ভবানী ডেভেলপার ওই দেওয়ালটি পেন রোড থেকে ১৩৬ ফুট দূরে করার চেষ্টা করছে।

পেন কোর্টের বাসিন্দারা ফিরতি মামলা ঠোকেন আলিপুরের নবম অতিরিক্ত বিচারক শ্রী এস কে নন্দীর আদালতে।

৩০ সেপ্টেম্বর, মাননীয় বিচারপতি তাঁদের আবেদন মঞ্জুর করে স্থগিতাদেশ দেন। সেই সঙ্গে পুরসভাকে নির্দেশ দেওয়া হয়, বাড়িটির অনুমোদন বৈধভাবে দেওয়া হয়েছে কিনা তদন্ত করতে।

এরপরই কলকাতা পুরসভার গৃহনির্মাণ বিষয়ক ডেপুটি কমিশনার ডি ব্যানার্জি ওই বাড়িটির প্ল্যান বাতিল করে দেন।

এদিকে অশোকবাবুও স্পষ্টভাবে জানিয়ে দিয়েছেন, তিনি বা তাঁর স্ত্রী ও ছেলেমেয়েরা এ ব্যাপারে কোনভাবেই দায়ী নন। কারণ সেটি একান্তভাবেই ভবানী ডেভেলপারের নিজস্ব ব্যাপার। আর তাঁর (অশোকবাবুর) কোন পুরকর ও বাকি নেই।

ছবি : পার্থসারথি
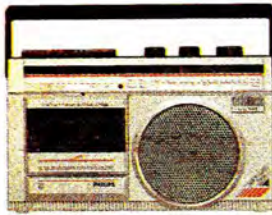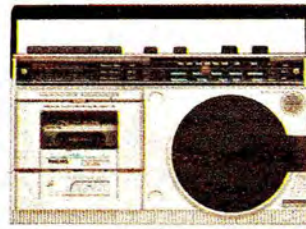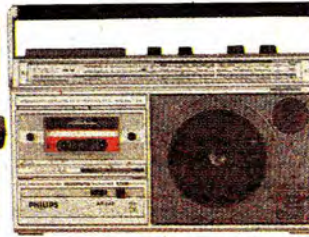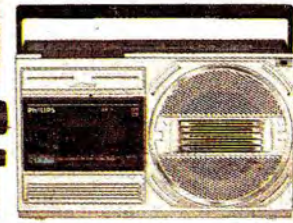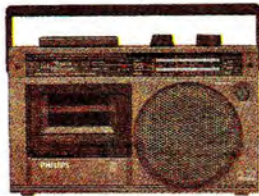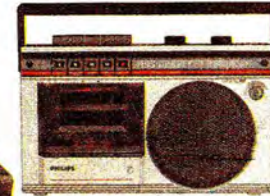
ফিলিপ্‌স – গত পঞ্চাশ বৎসরাধিক কাল ভারতের ঘরে-ঘরে বিশ্বস্ত নাম

বাবুদের বাগানবাড়ি :
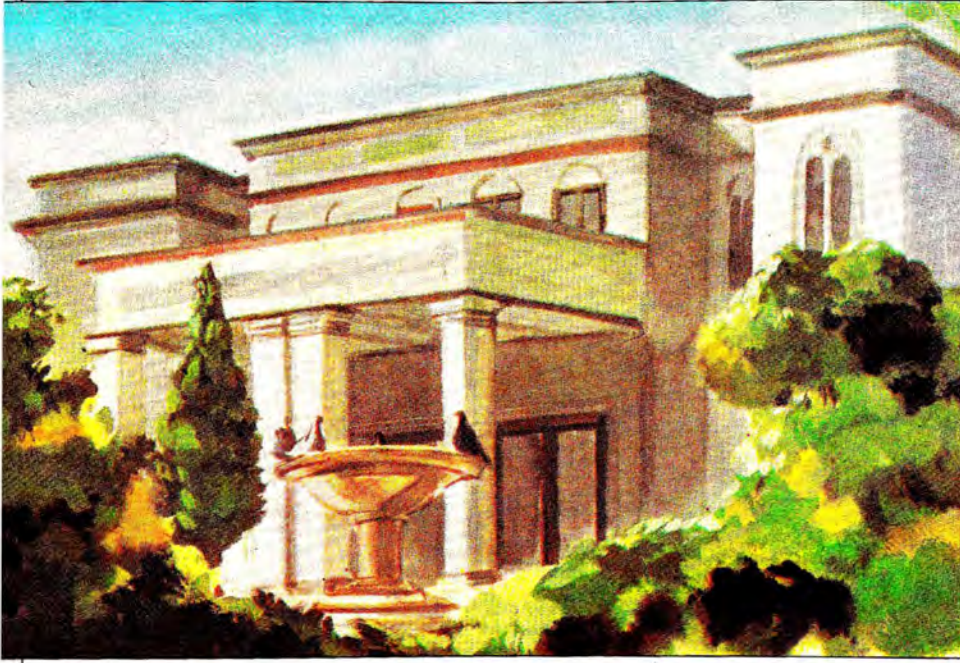
বাগানবাড়ি : সেকালের

আচমকা চারদিক কাঁপিয়ে বেজে উঠল পুলিশের তীব্র হুইশল। ভেতরের ঘরে কাদের যেন অস্থির পদশব্দ ছটফটিয়ে উঠল অসীম আতংকে। সিংহ দরজার সামনে দাঁড়ানো দু'খানি জীপ থেকে নেমে ন'জন সশস্ত্র পুলিশের দক্ষ বাহিনী ঘিরে ফেলল বাইরে থেকে জনমানবহীন লাগা পুরনো আমলের দশাসই বাড়িটিকে। ততক্ষণে বাম ও ডান দিকে দাঁড়ানো পুলিশভ্যান থেকে বাহিনী নেমে যে যার পজিশন নিয়ে দাঁড়িয়েছে। ইন্স-পেক্টরের আদেশ এল : একটা মাছিও যেন গলে পালাতে না পারে।

কলকাতা শহরতলীর গঙ্গা সংলগ্ন এই এলাকাটি এখনও কোন পান্থকে মুহূর্তে অতীত দিনের মহল্লায় নিয়ে গিয়ে ফেলতে পারে। রায়-বাবুদের বাগানবাড়িতে এখন দিনে পেঁচা, বাদুড়ের কিচিরমিচির শব্দ কানে আসে। বাবুরা উঠে গেছেন পশ এরিয়া বালিগঞ্জ প্লেসে। যদিও গভীর রাতে এখানে কান পাতলে ট্রামের ঘন্টি শোনা যায়। তবু পিতৃ-পিতামহের এত সাধের বাগানবাড়ির আশা ছেড়ে উটকো ব্যবসায়ী রামশরণ শীলের কাছে বেচে দিয়ে রায় পরিবারের সকলেই এর মায়া কাটিয়েছে।

এই ২৪ আগস্ট, পড়ন্ত দুপুরে সশস্ত্র পুলিশের দলটি যখন সারা বাড়িটা ঘিরে ফেলল তখন অবৈধ ব্যবসা চালানো এবং জুয়া বোর্ড রাখার অপরাধে রামশরণ শীল ধরা পড়ল, সঙ্গে আরও চারটি বিশিষ্ট ধনী পরিবারের চার সন্তান এবং

একসময় বাগানবাড়ি ছিল বাবু কালচারের মহাপীঠ, যেখানে আশ্রয় পেত শিল্প-সাহিত্য-সংস্কৃতি। কিন্তু সময়ের পরিবর্তনে রূপ বদলালো বাগানবাড়ির। শরীর এবং অপরাধের আশ্রয়স্থল হিসাবে ব্যবহার করা হতে লাগল তাদের কাউকে কাউকে। কেন এই অবক্ষয়? ফার্ম হাউসে রূপান্তরিত বাগান-বাড়িতে এখন হচ্ছে কি? কলকাতা, রাজধানী দিল্লি ও বোম্বাই-এর ফার্ম-হাউসগুলিতে কি ধরনের ক্রাইম হচ্ছে? মদ, মেয়েমানুষ, জুয়া কি বাগানবাড়ির ঐতিহ্য কে কলংকিত করছে? বাগান-বাড়ি ও ফার্মহাউসের সেকাল-একা-লের নস্টালজিয়া ও হালহকিকতের পশ্চাদপট পরিবেশন করেছেন আমা-দের বিশেষ প্রতিনিধি।

চারটি কন্যা। সকলেই সুশিক্ষিত। বয়সে তরুণ। গ্রেপ্তারের পর ওরা সকলেই প্রত্যেকের নাম, গোত্র, পরিচয় এবং কেন এই লাইনে নামল, তার জবানবন্দী দিতে আরম্ভ করল। আর তা এতই আকর্ষণীয় এবং উত্তেজক যা, যে কোন থ্রিলারকেও হার মানায়।

কারাবন্দী উদ্দাম যুবক-যুবতীদের জবান-বন্দী শোনার খানিক আগে, ইতিহাসের কিছুটা জবানবন্দী অন্তত: শোনা যাক, নতুবা পরম্পরাগত সাযুজ্য থাকবে না। এই যে রায়পরিবারের হাতে এসে পড়া ৩০০ বছর বয়সের প্রাচীন বাগানবাড়ি, তার স্বীকারোক্তিটিও কম কৌতূহলোদ্দীপক নয়। নয় কম চাঞ্চল্যকরও। তা এই উনবিংশ শতকের শেষ প্রহরে এক ব্যথাকাতর নস্টালজিয়ার করুণ দীর্ঘশ্বাস।

সে আজ থেকে ঠিক ২৯৬ বছর আগেকার কথা। ১৬৯০ সালের ২৪ আগস্ট, তৃতীয়বারের জন্য কলকাতায় এলেন জব চার্ণক। তখন অবশ্য কলকাতা বলতে মাত্র তিনটে গ্রাম-সুতানুটি, গোবিন্দপুর এবং কলিকাতা। তারই মধ্যে ইস্ট-ইন্ডিয়া

বাগানবাড়ির অন্দর মহলে সেকাল-একাল।

সেকাল-একাল

কোম্পানির চাতুর্য-শিরোমণি বেনিয়া চার্ণক, আস্তানা গড়লেন অধুনা ফোর্টউইলিয়ম দুর্গের কাছাকাছি ।

সে সময় এ এলাকার ভারি রমরমা অবস্থা । সুতানুটির বাইরে মুর্শিদাবাদের নবাবের অধীন রায়বাবুদের জমিদারির তখন বেশ বাড়-বাড়ন্ত । হাতিশালে হাতি, ঘোড়াশালে ঘোড়া, দানধ্যান, আজ এ পূজা, কাল ও পূজা-বছরভোর শুধু উৎসবের ছড়াছড়ি । আর সেইসব উৎসবের আড়ালে-আবডালে বসত রঙীন 'বাবু-বৈঠক' । ঘরের বিবিরা সেই রঙীন বৈঠকের ঠিকরে পড়া রোশনাই-এর দিকে তাকিয়ে শুধু বুকভরা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে রাত কাটাতেন । আর সেই উত্তাল মজলিশ থেকে ভেসে আসত ঠুংরি গানের টুকরো, সারেঙ্গীর মত্ত বোল, কিংবা যুবতী পায়ের নুপূর-নিক্কন ।

শারদোৎসব । সপ্তমী অষ্টমী কেটে গেছে । আজ মহানবমী । দু দিন নিরামিষ খাওয়ার পর, আজ মাতৃমন্দিরে বলি পড়বে । দশাসই দশটি

বাগানবাড়ি : একালের

গোদরেজ নিয়ে এলো সুখভোগের শিখর : মার্ভেল লাক্সারি সোপ
Marvel
যাতে আছে
রাশি রাশি মখমলের
মতো ফেনা আর মনমাতানো সুগন্ধ !
মূল্য (৭৫ গ্রামের) : ৪.৫০ টাকা (স্থানীয় কর স্বতন্ত্র)

বনেদি বাগানবাড়ি : স্মৃতিভারে !

নধর পাঁঠা রাখা হয়েছে বলির জন্য। তার মধ্যে ২টি যাবে বাগানবাড়িতে। খাস সাহেবপাড়া থেকে কিনে আনা হয়েছে বিলাইতি সরাব, স্কচ। বিশেষ আকর্ষণ : লক্ষ্ণৌ থেকে আনা আউর এক উমদা চীজ্। মতিবাঈ।

সকাল থেকেই বাবুর ব্যক্তিগত খিদমদগার সুষেণ চারজন মজুরের সাহায্যে খুলে নামিয়েছে ঝাড়লণ্ঠন। তারপর অতীব যত্নে পাঁচজনে মিলে কাপড়ে ঘষে মুছে ফেলছে ধুলো। ছড়িয়ে দিচ্ছে গোলা সাবানের জল। সদ্য পরিষ্কৃত এই বেলোয়ারী ঝাড় যখন জ্বলে উঠবে, সুষেণ জানে তখন এটাকে ঠিক মতিবাঈ-এর তুখোড় যৌবন আর মুদ্রা-মুন্সীয়ানার রোশনাই-এর মত দেখাবে।

ইতিমধ্যেই বড়কর্তা অম্বুজেন্দ্র রায়চৌধুরী গায়ে চড়িয়েছেন বাপ্তা সিল্কের কাজকরা পাঞ্জাবী। ফিনফিনে চওড়া পাড়ের শান্তিপুরী ধুতির ফুলকাটা কোছা, সযত্নে পাট করা অবস্থায় বাঁ দিকের পকেটে ঢোকানো। বাগানবাড়ির প্রতিটি কক্ষেই গোলাপজল ছেটানো হয়েছে। প্রতিটি জানালার কোণায় তুলায় ভিজিয়ে রেখে দেওয়া হয়েছে সুগন্ধি তেল, আতর। সবই মতিবাঈ-এর 'মতি' টানবার কায়দা।

মতিবাঈ এখন সারা দেশের পাঁচজন তওয়াইফদের একজন। বাঈজীমহলে তার নাম শুনে মাথা নোওয়ায় না এরকম সংখ্যা খুবই কম। প্রতি মুজরোর সেলামী দশ হাজার টাকা। আনুষঙ্গিক সব খরচ আমন্ত্রকের।

যেমনি নাম তেমনি রূপ মতিবাঈ-এর। এই প্রথম কলকাতায় আসছেন। এজন্য অম্বুজেন্দ্রর অহংকারের সীমা নেই। আশপাশের প্রায় সব জমিদার আমন্ত্রিত। নেমতন্ন করা হয়েছে কোর্ট-কাছারী, থানা-পুলিশের সাহেব-সুবোদের। আর যেমন চালাও ব্যবস্থা, তেমনই নিখুঁত তদারকী।

তাই বাগানবাড়ির তিরিশটি কক্ষই ধুয়ে মুছে সাফ-সুতরো করে রাখতে হচ্ছে সুষেণকে। সঙ্গে এই নাচঘরটিও। প্রত্যেক কক্ষে এত বিশাল বেলোয়াড়ী ঝাড় না থাকলেও, আছে সুদৃশ্য রঙীন বাতিদান। সারা বাড়ির মেঝে ইটালিয়ান মার্বেল পাথরে মোজাইক করা। বাগানময় মানানসই নগ্ন নারী-মূর্তি। তাতে কোনারক, খাজুরাহো কিংবা গ্রীক গথিকের ছাপ। এক কথায় শিল্পের সাজে সজ্জিত সারা বাগানবাড়ি আর এক জীবন্ত শিল্পের অপেক্ষায়। ঘর সাফের কাজে হাত লাগানো সুষেণও অপেক্ষা করে আছে খড়খড়ির ফাঁক-ফোকরে সেই অসহ্য সুন্দর দৃশটি দেখবে বলে।

মুজরো শুরু হতেই সুষেণ বাগানের উত্তর-দিকের গাছ-গাছালির ঘাড়ে চেপে বন্ধ খড়খড়ির মধ্যে চোখ পাতে। এমনিতে খড়খড়ি বন্ধ হলেও, সে হুক খানিক তুলে রেখেছিল, রাত্তিরে দেখবে বলে।

নাচঘরের ঠিক মাঝখানে আছড়ে পড়া ঝাড়-বাতির আলোর রোশনাই-এ স্নানরতা মতিবাঈ বাঁ হাতে কান চেপে ডান হাত সোজা জমিদারবাবুর দিকে বাড়িয়ে সুর তুলেছে-'জিন্দেগী কোই আন্ধেরা নেহি, প্যার কি রোশনি হ্যায়'—মুখোমুখি বাবু ইয়ার-বক্সীদের নিয়ে মুগ্ধ। ঠিক পিছনের দিকে সঙ্গত-কারীর দল—সারেঙ্গী, তবলা, পাখোয়াজ, মন্দিরা, কোকিলকণ্ঠী মতিবাঈ-এর সুরের সাথে তাল মিলি-য়েছে। বাবুদের সামনে রঙীন পানীয় ভর্তি পেয়ালা। আতরদান থেকে ভেসে আসছে আফগানি আতরের সুবাস। ফুলদানি ভর্তি জুঁই, রজনীগন্ধার মেলা। মতিবাঈ-এর এক একটা তান উঠছে পঞ্চমে, আর বাবুদের পকেট থেকে শ' শ' টাকার নোট 'ওয়াহা' 'ওয়াহা' শব্দের ঢেউ তুলে শূন্যে উঠেই ঝরে পড়ছে মতিবাঈ-এর যৌবনমত্তা শরীর বেয়ে। প্যালার টাকার নাচঘরের জাজিম জবজব করছে।

সুষেণ জানে, গঙ্গার এপারে মল্লিকবাবুদের বাগানবাড়িতেও আজ বসেছে এমনিতর মজলিশ। পুজোর একমাস আগে থেকেই দুই পারের দুই বাবুর মধ্যে চলছিল ঠাণ্ডা লড়াই। কে কার বাগান-বাড়িতে সবচেয়ে রহিশ বাঈজী আনতে পারে। রায়পক্ষের ধুরন্ধর নায়েব হরিবংশী সেনের কূট-বুদ্ধির কাছে হেরে গেছেন মল্লিকদের নায়েব। সাতদিন লক্ষ্ণৌতে পড়ে থেকে নায়েব অনেক ধরাধরি করে, তবেই পেয়েছেন মতিবাঈকে। মল্লিকরা পেয়েছেন মুক্তাবাঈকে। তবে নামে খানিক কম।

এ ধরনের প্রতিযোগিতার কথা এ তল্লাটের সকলেই জানে। প্রায় মাসেই দু'পারের দুই বাগানবাড়িতে বসে মধু-মহল্লা। নাচ, গান ও শিল্প সমঝদারির মুন্সীয়ানায়, আর রঙীন পানীয়ের স্রোতে ভাসে রাতের পর রাত। সুষেণ ভাবে তিন-

'বাবু'দের বাগানবাড়ি ইদানিং শহরের কেন্দ্রস্থলেই : কারনানি ম্যানসন

পুরুষের এই বাগানবাড়িতে যে আজ পর্যন্ত কত গুণী বাঈজী-তওয়াইফদের পায়ের নূপুরের ধুলো পড়ল, তার হিসেব নেই। এদের গান, এদের নাচ, এদের টুকরো হাসির যাবতীয় আকাংখা, সবই আভিজাত্যের রক্তে মেশানো। গত মাসে বাঈজী পদ্মাবাঈকে তো অম্বুজেন্দ্র সঙ্গীতে মুগ্ধ হয়ে গলার হীরের মালাই খুলে পরিয়ে দিয়েছিলেন। আর এজন্যই তৈরি ২৫ বিঘা জুড়ে এই বিশাল বাগান-বাড়ি।

কিন্তু সময় তো বদলায়। বাবুদের বাবুয়ানি করার দিন শেষ হয়। পণ্ডিত নেহরুর আপ্রাণ চেষ্টায় বিলুপ্ত করা হয় মধ্যস্বত্বভোগীর প্রথা। বাবু-বৈঠকে আর্থিক টান পড়ে। তখন বাধ্য হয়ে কমে আসে বাগানবাড়ির জৌলুষ। কমতে কমেতে এক সময় শেষ হয়ে আসে।

অন্যদিকে বাঈজীকুলের দিনেও ভাটা আসে। এখন ব্যবসায়িক মানুষজন শিল্পের চেয়ে শরীরকে দাম দেন বেশি। আগে যেখানে একজন বাঈজীর মুজরো বসাতে খরচ পড়ত বিশ-তিরিশ হাজার টাকা। এখন সেখানে মাত্র হাজার দুই খরচ করলেই টগবগে নারী-শরীর, রেকর্ড প্লেয়ারে বাজারি গান এবং উত্তাল যৌবনের ভাঙা ইংরেজি নাচ কিনে নেওয়া যায়।

আজ খিদমদগার সুষেণ নেই। আছে তার পঞ্চম পুরুষ-নাতি বাদল। এখন বাগানবাড়ির গেটে সন্ধ্যেবেলা ফিটন.টমটমের মেলা বসে না। বসে অ্যামবাস্যাডর, মারুতি, ফিয়েটের কেতা-দুরস্ত পার্কিং। হাত বদল হয়ে যাওয়া এই বাগান-বাড়িতে এখন সুরের চেয়ে শরীরের চাহিদা অনেক বেশি। যেহেতু শিল্পবোধের সূক্ষ্ম পর্দা সরে এখন শরীর বোধের স্থূল পর্দা এখানে খাটানো হয়েছে।

তাই ব্যবসায়িক লাভালভির স্থূল পথ ধরে এখানে বাসা বাঁধতে আরম্ভ করেছে অপরাধ। মদ, মেয়েমানুষ আর জুয়ার হাত ধরে দিনের ফার্ম হাউসে রাতের বেলায় চলে বীভৎস মজার এক অলৌকিক দৃশ্য। আজকের সময়ের বিখ্যাত কবি অমিতাভ দাশগুপ্তের ভাষায়–

'পানসী চালাও বেলঘরিয়ায়
বাবুর বাগানবাড়ি,
আজ সারারাত উনুনমুখী
মাগীর বেজায় নাচ;
বেলেল্লা দিল আছড়াবে তার
গাবদা গাদুম পাছায়,
পানসী চালাও বেলঘরিয়ায়
বাবুর বাগানবাড়ি।
সেই বাবু আর ইয়ারবক্সী
এখনও তেমনি আছেন,
তারা শিল্প বলতে শিশ্ন বুঝেন
এবং হঠাৎ মাতেন।'

সেজন্য সেই সময়ের জবানবন্দীর কথা কিছু-ক্ষণের জন্য তুলে রেখে এই সময়ের স্বীকারোক্তির বক্তব্য শোনা যাক।

২৪ আগস্ট। বিকেলে অফিসার ইনচার্জের কাছে লিখিত জবানবন্দী পেশ করলেন ধৃতা দুই যুবতী-অনিন্দিতা সোম এবং রীতা বিশ্বাস। দুজনেই দক্ষিণ কলকাতার নামী অভিজাত পরিবারের

মধুবালা: বাগানবাড়ির বন্দিনী

অ্যানিটা টমাস: নব্যবাবুদের পৃষ্ঠপোষিকা

মেয়ে। ইংরাজি শিক্ষায় শিক্ষিত। (সংশোধন ও লোকলজ্জার জন্য এদের পিতৃপরিচয় ও ঠিকানা গোপন রাখা হল)।

অনিন্দিতার বয়স উনিশ এবং রীতার একুশ। রীতার মাস্টার ডিগ্রি আছে অনিন্দিতা অনার্স গ্র্যাজুয়েট। পাস করার পর ভরতনাট্যম নাচের তালিম নিচ্ছেন নামজাদা নৃত্য শিক্ষকের কাছ থেকে। জবানবন্দী মোতাবেক জানা যায়, এই বাগানবাড়ি থেকে ধরা পড়া এক যুবক কমলেশ বসুর সঙ্গে অনিন্দিতার ১৯৮৫ সালের অক্টোবর মাসে ধর্মতলার 'কাফেডি-মানিকো' রেস্তোরাঁয় আলাপ হয়। আলাপ থেকে বন্ধুত্ব। কমলেশই একদিন তাকে প্রস্তাব দেয়, দুপুরের পর ঘন্টা চার সময় দিলে শ চারেক টাকা মুফতে রোজগার করা যাবে। ততদিনে কমলেশের বন্ধুত্ব তার শরীর পর্যন্ত পৌঁছে গেছে। তাই কর্মক্ষেত্রটা অন্তত একবার দেখে আসবার তাগিদে অনিন্দিতা ওর সঙ্গেই এসে পৌঁছোয় এই বাগানবাড়িতে। এখানেই আলাপ হয় বাগানবাড়ির মালিক রামশরণের সঙ্গে। রাম-শরণ জানায়, খুব সস্তায় কেনা বাগানবাড়ি কে সে এখন ফার্ম হাউসে রূপান্তরিত করেছে। ৫ বিঘা জমির চৌহদ্দিতে একদিকে সে তৈরি করেছে মুরগী পোলট্রি ও ভেড়া পালন ক্ষেত্র। অন্যদিকে লোকজন রেখে কিছুটা জায়গায় করছে মূল্যবান রবি-ফস-লের চাষ।

সেদিনটা ছিল ২১ নভেম্বর, বৃহস্পতিবার। কিছুক্ষণের মধ্যেই কমলেশ সরে পড়ল বাথরুম যাবার অছিলায়। রামশরণও 'পাঁচ মিনিট আসছি' বলে কোথায় যেন গেল। পাঁচ মিনিট বাদে সে যখন ঘরে এল, তখন তার মুখ দিয়ে ভক ভক করে দিশি হুইস্কির গন্ধ বেরুচ্ছে। সে ঘরে ঢুকেই দরজা বন্ধ করে দেয়। আঁতকে ওঠে অনিন্দিতা–এ কি করছেন?

এদিকে কমলেশের কোন পাত্তা নেই। ততক্ষণে ৪৫ বছরের পুরুষমানুষটি অনিন্দিতাকে জাপটে ধরেছে। অনিন্দিতা কাঁদতে থাকে। কোনমতেই কিছু হয় না। রামশরণের রাক্ষুসে পীড়ন গ্রাস করে তাকে। প্রবেশ করে তার ১৮ বছরের উদগ্র যৌবনে। চিবিয়ে খায়।

কমলেশের সঙ্গে দেখা হলে সে সান্ত্বনা দেয়। 'এতে কান্নাকাটির কি আছে? নিত্যনতুন স্বাদ তো মুখ বদলায়। দেখ, পরে খুব ভাল লাগবে।'

তখন কমলেশের কথা অবিশ্বাস লাগলেও পরে তাই হল। বাণ্ডিল বাণ্ডিল টাকা আর নিত্য-নতুন শরীরের স্বাদ অনিন্দিতার তাবৎ সভ্যতা, ভদ্রতার মুখোশ খুলে ফেলেছে। এবার এই চক্রে সে টেনে আনে কলেজ জীবনের বান্ধবী রীতাকেও। ততদিনে জানা হয়ে গেছে এই বাগানবাড়ির কাল-চার। টাকা উপায়ের উৎস।

রামশরণ শুধুমাত্র নারী মাংসের বিকিকিনিই করে না। লোকচক্ষুর অন্তরালে এখানে সে বসিয়েছে বেআইনী জুয়ার বোর্ড। 'গোপন চেনে' এখানে হাজির করানো হয় বড় বড় বাড়ির উটকো ছেলে-দের। জুয়ার নেশার সঙ্গে জুড়ে দেওয়া হয় মদ, ড্রাগ আর যুবতীর লাস্যময়ী শরীর। এতে চক্র আরও সবল হয়। সহজে কেউ বেরতে পারে না, বা পুলিশে খবর দিতে পারে না। সেরকমই বড় বাড়ির একটি ছেলে–আজকের ধরা পড়া অনিমেষ। দু বছর জুয়া, নেশা ও মেয়েমানুষে ও কম করেও লাখ তিনেক টাকা উড়িয়েছে। ফুলে ফেঁপে উঠেছে রামশরণ।

আজ থেকে ঠিক একশ বছর আগেও বাগান-বাড়ি ছিল বাবু-কালচারের এক অন্যতম অংশ। তখনকার বাংলায় সেইসব রাজা-জমিদাররা বাঙলা শিল্প-সাহিত্য-সংস্কৃতির পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। বাগান-বাড়িতে বসা নানান বাবুবৈঠক থেকে উঠে আসত শিল্প, সংস্কৃতি ও সাহিত্যের হঠাৎ আসা নতুন ধারা। তখন সেখানে অপরাধের চিহ্নমাত্র থাকত না।

বারাসতের প্রাক্তন সাবডিভিশনাল অফিসার কিরণ চন্দ্র ঘোষাল শুনিয়েছেন এমনই একটি বিচিত্র বাগানবাড়ির ইতিহাস। কলকাতা সংলগ্ন মফঃস্বল শহর বারাসতে ব্রিটিশ গর্ভনর ওয়ারেন হেস্টিংস, ১৭৭২ সালে ৫২ বিঘা জমি নিয়ে

বাগানবাড়িগুলির রহস্য সন্ধানে কলকাতার দুই সন্ধানী পুলিশ

এক বাগানবাড়ি তৈরি করেন। এই দোতলা বাড়িটির উপরতলায় ৪০ ফুট লম্বা এবং ৩০ ফুট চওড়া একটি সুদৃশ্য নাচঘর আছে। ব্রিটিশ আমলে একে বলা হত 'ড্যান্সিং হল'। ব্রিটেন থেকে ভারতে আসবার সময় হেস্টিংসের সঙ্গে জাহাজে এক জার্মান মহিলার আলাপ হয়। ভারতের মাটিতে সেই আলাপ পরিণত হয় বন্ধুত্বে। এঁর নাম ছিল মিসেস মরিয়ম। বাগানবাড়িটির মূল প্রাসাদ থেকে নাচঘরে আসার জন্য একটি সুড়ঙ্গ পথ ব্যবহার করা হত। সুড়ঙ্গ পথটি বারাসতের পুলিশকোর্ট পর্যন্ত বিস্তৃত। এখন সেই বাড়িটি এম.ডি.ও বাংলো রূপে পরিচিত। বারাসত এলাকায় এরকম আরও চারটি বাগানবাড়ি আছে। আর.সি. দেবের 'ব্রজরেনু', হাউস অব বংশী টেড, ঘোষেদের 'শিশিরকুঞ্জ', বিচারপতি ইলাইজা ইমোর বাড়ি—যা এখন ক্রিমিনাল কোর্ট ইত্যাদি।

ভারত স্বাধীনতা লাভের পর থেকেই সামাজিক অবস্থান বদলে যেতে শুরু করল। বাঁধা হল জমির সিলিং। বামপন্থী আন্দোলনের তোড়ে পঁচিশ একরের বেশি জমি বেনামী-উদ্ধার শুরু হল। যার অবশ্যম্ভাবী ফল জমিদারদের পড়ন্ত অর্থনীতি ও জমিবাড়ি বিক্রি। এভাবেই হাত বদল হল বাগানবাড়ি। বাবু কালচার।

যারা কিনলেন, সকলেই তো আর বুনিয়াদী নন। উটকো ধনী, ব্যবসাদারও ছিল। তাদেরই কারো কারো হাতে বাগানবাড়ি পড়ে ভিন্নমূর্তি ধারণ করল। অধিকাংশ বাগানবাড়ি পরিণত হল, হয় ফার্ম হাউসে, নয় তো সরকারি অফিস-কাছারী। আবার অন্যদিকে পুরনো বাবুদের বাবু কালচার স্থান পরিবর্তন করল শহরের দিকে। সান্ধ্য-মজলিশ শহরমুখো বাবুদের পিছন পিছন আস্তানা গাড়ল, এলো কলকাতা এবং প্রাকৃতিক দৃশ্যশোভিত অল্প নামকরা স্থানগুলিতে। কিন্তু জমিদারি যাওয়ার পর বাবু কালচারের সাধ থাকলেও অনেকেরই সাধ্য ছিল না। তাই শিল্প স্বাদের বাবু কালচার ভগ্নরূপে সস্তায় আমোদ-আহ্লাদের জায়গায় পর্যবসিত হল। বাঈজীর গানের পরিবর্তে টেপ ক্যাসেটের গান, এবং শৈল্পিক নাচের বদলে নারীর শরীর। কিন্তু কলকাতা সহ অল্পনামী পর্যটন কেন্দ্রগুলির বাগানবাড়ি কালচারের হালহকিকৎ বলার আগে, কলকাতা শহরতলির হাতিয়াড়া অঞ্চলের এক চাঞ্চল্যকর হত্যা অপরাধের কথা বলি। এর পঞ্চম অংকের পঞ্চম দৃশ্য সুদূর ওড়িশার কটকে অভিনীত হলেও মূল ঘটনা ঘটেছিল দমদম—বাগুইহাটি অঞ্চলের স্বর্ণ ব্যবসায়ী পরিমলবাবুর বাগানবাড়িতে। দিনটি ছিল ১৫ জুন, ১৯৮৩। কটক স্টেশনের মাল-

শহর থেকে দূরের বাগানবাড়ি: পুলিশ অফিসার আবদুল ওয়াহেদ মোল্লার নজরে

গুদামে পাওয়া গেল একটি বাক্স। উৎকট গন্ধ ছড়াতে লাগল বেওয়ারিশ কাঠের বাক্সটি থেকে। বাতাসের ধাক্কায় গন্ধ আরও ঝাঁজিয়ে উঠছে। স্টেশনে টেকা দায়। দিন সাতেক আগে হাওড়া থেকে বাক্সটি পার্সেল হয়ে এসেছে কটক স্টেশনে। সেই থেকে মালগুদামে পড়ে আছে। কারণ, যে উকিলবাবুর নামে বাক্সটি পাঠানো হয়েছে, সারা কটক শহরে তাঁর কোন অস্তিত্ব পাওয়া যায়নি। উকিলের নাম সঞ্জয় ভট্টচার্য, ঠিকানা: কালি গলি, কটক–২। কিন্তু কোথায় সঞ্জয় ভট্টাচার্য? ওই নামে কালি গলিতে কেউ থাকেন না। কটক কোর্টেও ওই নামে কোন উকিল নেই। সুতরাং দাবিহীন বেওয়ারিশ মাল হিসাবে বাক্সটি পড়েই ছিল। আর কয়েকটা দিন দেখে সেটি আবার হাওড়ায় ফেরৎ পাঠানোর কথা। কিন্তু তার আগেই বাক্স ভেদ করে এই উৎকট গন্ধ। গন্ধে টেকা দায়। তবু ভিড় বাড়তে লাগল। কৌতূহল।

সুতরাং পুলিশ এল। রেল স্টেশনের গায়েই জি আর পি অফিস। পুলিশ এসে কাঠের প্যাক করা বাক্সটি ভেঙে ফেলল। সঙ্গে সঙ্গে দুর্গন্ধের ঝাঁজ গেল বেড়ে। প্যাকিং বাক্সের ভেতরে একটি করোগেটের ট্রাংক। তার শক্ত কুলুপে তালা লাগানো। বেশ বড়সড় ট্রাংক। তালা ভাঙতে না পেরে পুলিশ কবজা ভেঙে ট্রাংকটি খুলতেই—দেখা গেল এক অর্ধগলিত যুবতীর লাশ। তার হাত, পা, মাথা সব খণ্ড খণ্ড করে কাটা। তার ওপর নীল রঙের একটি শাড়ি মুড়ে দেওয়া হয়েছে। গন্ধ এবার বাগ মানে না। নাকে রুমাল দিয়েও আর দাঁড়াতে পারে না কেউ কাছে পিঠে। গা গুলিয়ে উঠছে। তবু পুলিশকে তার কর্তব্য করতেই হবে। একজন ডোম ডেকে অঙ্গ-প্রত্যঙ্গগুলি বের করা হল।

মেয়েটির খণ্ডিত দুই হাতে সোনার চুড়ি ও বালা, আঙুলে পাথরের আংটি, গলায় সোনার হার, কানে দুল। শাড়িতে রক্তের দাগ লেগে আছে। চুলের অনেকখানি খসে গেছে মাথা থেকে। দেহে অনেকগুলি ক্ষতচিহ্ন।

খুনীরা গয়নাগাটিতে হাত দেয় নি। সুতরাং এটিকে 'মার্ডার ফর গেইন' বলা যায় না। হয়তো কোন প্রতিশোধ গ্রহণ বা অন্য কোন উদ্দেশ্যে মেয়েটিকে খুন করা হয়েছে—পুলিশ প্রাথমিক ভাবে এটুকুই অনুমান করল। ঘটনাটি তিন বছর আগের। ক্যালেনডারে সেদিন তারিখ ছিল ১৫ জুন, ১৯৮৩। সময় বিকেল পাঁচটা বেজে কয়েক মিনিট।

নিয়ম মাফিক পুলিশ খণ্ডিত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গগুলি এবং বিকৃত মুখাবয়বের ছবি তুলল। তারপর প্রাথমিক পরীক্ষা সেরে, সেগুলি আবার যথাযথ-ভাবে বাক্সে ভরে প্যাক করে রাখা হল। কারণ পুলিশ ইতিমধ্যে হাওড়া স্টেশনের সঙ্গে ট্রাংককলে যোগাযোগ করেছে। বাক্সটি যেহেতু হাওড়া স্টেশনে বুক করা হয়েছিল, তাই হাওড়া রেল পুলিশই এর তদন্ত করবে। বাক্সটি তাই ফেরত পাঠাতে হবে। সমস্ত কাগজপত্র এবং একজিবিট তৈরি করে পরদিনই সেটি হাওড়ায় পাঠিয়ে দেওয়া হল।

কিন্তু হাওড়া রেল পুলিশ নিজেরা তদন্ত না

দিল্লি ও বোম্বাই-এর নব্যসংস্কৃতির বিলাসমহল : 'ফার্ম হাউস,' 'বাংলা'।

এবার রাজধানী দিল্লির দিকে চোখ ফেরানো যাক। শুধুমাত্র দিল্লিরই বুকে দেড়শ'রও বেশী ফার্ম হাউস উদ্ধত অহমিকা বুকে নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। এদের অধিকাংশের চার দেওয়ালের মধ্যে দিনরাতের আলো-আঁধারিতে বসে ক্যাবারে, মুজরা, হাজারবাতির রোশনাই–এ রঙীর পার্টি থেকে আরম্ভ করে চোরা-চালান, স্মাগলিং, ধর্ষণ, খুন, রাহাজানির পশরা।

কুতুবমিনারের একটু আগেই আঁধেরিয়া মোড় পেরোলেই 'আদ্যা কাত্যায়নী শক্তিপীঠ।' তুঘলকাবাদ হয়ে বদরপুরের দিকে গেলে কিংবা বিজবাসন ধরে নজফগড়ের দিকে এগোলে মহানগরীর জনবহুল সীমানা পার হয়ে দেখা যাবে ছোট ছোট টিলায় ঘেরা ফাঁকা নির্জন প্রান্তর। এরপর থেকেই শুরু হয়েছে রহস্যময় ফার্ম হাউসের জীবন্ত কল্পলোক। চার দেওয়ালের সুরম্য প্রাসাদোপম বাড়িগুলো দেখলে বিশ্বাস করা যায় না–নৈশলোকে এখানে কি চলে? মঙ্গলাপুর, ডেরামণ্ডি,মহীপালপুর, বিজবাসন, ছতরপুর, ঘিট্টরনি, সুলতানপুর, ভাড়িগাঁও পর্যন্ত বিস্তৃত–ফার্ম হাউসের একচ্ছত্র সাম্রাজ্য-সীমা। আশ্চর্যের ব্যাপার এই ফার্ম হাউসে কর্মরত কৃষাণেরা অধিকাংশই তাদের মালিকের নাম বা ঠিকানা জানে না। বলা যেতে পারে তাদের জানানো হয় না।

অধিকাংশ ফার্ম হাউস দক্ষিণ ও পশ্চিম দিল্লির সীমান্ত বরাবর গড়ে উঠেছে। এদের মালিকানা বিশিষ্ট ভি.আই.পি কিংবা নামজাদা ব্যবসায়ীদের। কুতুবমিনার থেকে একটু আগে আঁধেরিয়া মোড়ের কাছে এক একর জায়গা নিয়ে কৃষি ফার্মটি প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীর। ১৯৬৪ সালে এটা কেনা হয়েছিল। এর পাশের ফার্ম হাউসটির মালিকানা প্রতিরক্ষা গবেষণা ও উন্নয়ন দপ্তরের রাষ্ট্রমন্ত্রী অরুণ সিং-এর। জৌনাপুরের ৭ একর জায়গা জুড়ে ফার্ম হাউস 'সুপার স্টার' অমিতাভ বচ্চনের শৌখিনতার বিশেষ পরিচায়ক। ১৯৮৫ সালে এটি তার স্ত্রী জয়া বচ্চন ও বড় ছেলে অভিষেকের নামে কেনা হয়েছিল

দক্ষিণ দিল্লির অধিকাংশ ফার্ম হাউস দিল্লি-হরিয়ানা সীমান্ত বরাবর পাহাড় ও জঙ্গল ঘেরা নির্জনের 'প্রমোদকুঞ্জ'। এই নির্জনতার সুযোগ নিয়ে পুলিশের চোখে ধুলো দিয়ে এখানে গা-ঢাকা দেয় পলাতক আসামীরা। তাদের আরো সুবিধা, আন্তর্জাতিক পালাম বিমান বন্দর, এর লাগোয়া। তাই আন্তর্জাতিক অপরাধীদেরও এখানে গোপনে অবস্থান করা সম্পূর্ণ নিরাপদ। এছাড়াও বিশিষ্ট ভি.আই.পি দের আগমনে, তাদের সুরক্ষার জন্য থাকে সিকিউরিটি গার্ড। তাই অপরাধীদের পিছু ধাওয়া করে পুলিস বাহিনী এখানে এসে সুবিধা করতে পারে না।

শনি-রবিবারের ছুটির দিনে ফার্ম হাউসের আলোর রোশনাই চোখ ধাঁধিয়ে দেয়। হাজির হন তাবড় তাবড় নেতা, ব্যবসায়ী অফিসার ও পুলিশ বিভাগের পদস্থ কর্মচারী প্রমুখ ভি.আই. পি ও ভি.ভি.আই.পি-র দল। সুরা ও সুন্দরীর লীলায়িত ছন্দে মাতোয়ারা হয়ে ওঠে নৈশলোকের ফার্ম হাউস।

এই রকমই এক ফার্ম হাউসের মালিক বলরাজ চোপড়া, গত বছর দেশীয় সংবাদপত্রগুলিতে যার নাম নারীব্যবসার সূত্রে ফলাও করে ছাপা হয়েছিল। তার ফার্ম হাউসের প্রতিটি নৈশ-পার্টিতে দিল্লির ভূতপূর্ব পুলিশ কমিশনার থেকে শুরু করে অনেক প্রথম শ্রেণীর নাগরিকই উপস্থিত থাকতেন।

জানুয়ারী ১৯৮০, ছতরপুরে 'গ্লোরী ফার্ম-হাউসে' হঠাৎ পুলিশ বাহিনী হানা দিল। গ্রেফতার হলেন জয়পাল সিং। তার বিরুদ্ধে অভিযোগ নারী অপহরণ করে এনে ইয়ার বন্ধুদের নিয়ে মেয়েটিকে ধর্ষণ, পরে হত্যার হুমকি দেওয়া। জেল থেকে ছাড়া পাওয়ার পর আবার গ্রেফতার হলেন জয়পাল সিং ঐ বছরই জুন মাসে। এবারে তার বিরুদ্ধে অন্য অভিযোগ। ১৪ কেজি চরস সহ জাল পাসপোর্ট, তার ফার্ম হাউসের এক নতুন মুখোস খুলে দেয়।

রাজধানী দিল্লির সীমানা বিস্তারের জন্য উঠে পড়ে লেগেছেন দিল্লি প্রশাসনের 'দিল্লি ডেভলপমেন্ট অথরিটি' (ডি.ডি.এ)। তারা ইতিমধ্যে বিরাট সংখ্যক কৃষক মজদুর অধ্যুষিত গ্রামগুলির বিলুপ্তি ঘটিয়ে স্থাপন করেছেন নিত্য নতুন কলোনী। আরো অনেক গ্রাম উজাড় হয়ে যাওয়ার প্রহর গুনছে।

ডি.ডি.এ দিল্লি ও হরিয়ানার সীমান্ত অঞ্চল সহ কুড়ি লক্ষ মানুষ অধ্যুষিত ১১৪ টি গ্রামের দখল করার নোটিশ জারী করেছেন। এই গ্রামগুলি থেকে ডি.ডি. এ লাভ করবেন ৫২.০০০ একর নতুন জমি।

অন্যদিকে দিল্লির সীমান্ত বরাবর ১৫,০০০ একর জমির উপর দাম্ভিকভাবে দাঁড়িয়ে আছে, উদ্ধত সমাজের জঘন্য ক্রিয়াকলাপের পীঠস্থান ফার্ম হাউসগুলি। ডি.ডি.এ-র হাতের নাগাল এড়িয়ে এরা দিব্যি দিন রাতের মহল্লায় সুরা, সুন্দরী, জুয়া, কোকেন, হাশিশ এর মজা লুটছে।

পটভূমি বোম্বাই

কলকাতা বাগানবাড়ির বাবু কালচারের পর, রাজধানী দিল্লির বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের ফার্মহাউসের পাশাপাশি এসে পড়ে ভারতের 'বিসনেস ক্যাপিটেল' ও ফিল্মী তারকাদের 'অলিভডেন'–বোম্বাই। এখানে অবশ্য বনেদি বাগানবাড়ি বা ফার্ম হাউসের খুব একটা দেখা পাওয়া যায় না। পাওয়া যায় হাল আমলে শেকড় গেড়ে বসা টাকার কুমীর ও ফিল্মী লাইনের লোকজনদের মুখ বদলানোর প্রমোদ-কুঞ্জ–বিরাট বিরাট হাল ফ্যাশানের কোঠাবাড়ি।

এখন অবশ্য এই বাড়িগুলোর বেশ কয়েকটিকে সেলুলয়েডের ফিল্মী 'স্যুটিং জোন'-এ পরিণত করা হয়েছে। বম্বেতে যে রেগুলার ব্যপক হারে ফিল্ম তৈরি হয়, সে অনুপাতে স্টুডিওর অভাব খুব বেশী। তাই অনেক প্রোডিউসারেরা কখনও কখনও কাজে লাগাচ্ছেন আকর্ষণীয় পালি হিলের 'হোয়াইট হাউস', 'ডাল্লাস বাঙ্গলো', জুহু বীচের 'সানকিস্ত'।

ভারতের এই নন্দন কানন বম্বেতে সম্ভ্রান্ত ধনী থেকে নিয়ে ফিল্মী তারকারা পর্যন্ত, এই বিশাল বাড়িগুলির নিয়মিত স্যুটিং জোন-এর পরিবর্তে কখনো সখনো সান্ধ্য-মজলিশে লালবাতির সংকেত দিয়ে ব্যবহার করেন–'ডোন্ট ডিসটারব রুম' হিসাবে। সঙ্গীনির অভাব নেই, সারা ভারতের ভিন রাজ্য থেকে প্রতিদিন স্টার হওয়ার আশায় পাড়ি জমাচ্ছেন মধ্যবিত্ত থেকে শুরু করে বড় বড় বাড়ির সম্ভ্রান্ত শিক্ষিত ছেলেমেয়েরা। মেয়েদের অধিকাংশের স্টার হওয়ার স্বপ্ন ফিল্মী লাইনের ডাকাবুকো কর্তা ব্যক্তিদের, কিংবা তাদের চাটুকা-বৃন্দের শয্যাসঙ্গিনী হওয়ার মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে।

বম্বের প্রখ্যাত চরিত্রাভিনেতা জানকীদাসের মুখেই শোনা যাক 'কোঠিয়াঁ ঔর বাগান' মহফিলের (বাগানঘেরা কুঠিগুলি) ইতিকথা আমি বম্বেতে আসি ১৯৩৪ এ। সে সময় বর্তমানের ফিল্মী মহল্লার শিরোমণি জুহু ও তার আশেপাশে ছিল ধূ ধূ মাঠ আর জঙ্গল। ভয়ে অনেকে এদিকে আসতে চাইত না সমুদ্রের ধারে সদ্য গজিয়ে উঠেছে বেশ কয়েকটি সুসজ্জিত কোঠাবাড়ি। রাতের মহল্লায় এখানে বসত বাবু-বিবিদের একান্ত গোপন নিশি বৈঠক।...। পরে অবশ্য এই মহফিলে সামিল হয়েছে ফিল্মী স্টাররাও।

'আজকের নামজাদা চরিত্রাভিনেত্রী ললিতা পাওয়ার সেদিন ছিলেন 'ললিতাবাঈ' নামে।

প্রমোদকুঞ্জের এই বাড়িগুলিতে এখন অন্যভাবে নারী শিকারের ফাঁদ পাতা হয়। জালে আটকে পড়েন সমাজের রুচিবান শিক্ষিতা তরুণীরা। অনেক আশা নিয়ে এখানে আসে এই ভেবে–যে তারা একদিন মধুবালা, নার্গিস, বৈজয়ন্তীমালা কিংবা হেমামালিনী, রেখা, শ্রীদেবীর মত 'সুপার এ্যাকট্রেস' হয়ে উঠবে।

কিন্তু না, তাদের দুর্বলতার সুযোগের ফায়দা তুলতে ছাড়ে না চরিত্রাভিনেতা থেকে শুরু করে রঙিন পর্দার সুপার হিরোরা। 'স্ক্রীন টেস্ট'-এর জন্য তাদের কাউকে কাউকে এনে তোলা হয় এই সাতমহলা কোঠাবাড়িতে সেখানে একটা রাতের জন্য মেয়েটি নায়িকা। সকালে রোদ এসে আবিষ্কার করে গতরাতের লুণ্ঠিত বিবস্ত্র নারীশরীর

...র কেসটির দায়িত্ব তুলে দিল গোয়েন্দা পুলিশের হাতে। ডি ডি-র অফিসার আবদুল ওয়াহেদ মোল্লার ওপর পড়ল ইনভেস্টিগেশনের দায়িত্ব। ঝানু গোয়েন্দা হিসাবে তাঁর যথেষ্ট খ্যাতি।

আরও দিন তিনেক পর। ২৬ জুন, ১৯৮৬। বৌবাজার এলাকায় ঘুরছিলেন ওয়াহেদ সাহেব। হঠাৎ গলির মোড়ে একটি পান দোকানে সিগারেট কিনতে গিয়ে, একটি দোকান তার চোখে পড়ল। দোকানের নাম 'রত্ন ভাণ্ডার'। বড় দোকান এবং সেখানে ওই বড়-সড় চেহারারাই একজন লোক বসে আছে। সদর রাস্তা থেকে একটু ভেতরে বলে ওয়াহেদ সাহেবের নজর এড়িয়ে গেছিল।

ওয়াহেদ সাহেব তক্ষুনি একটি ট্যাক্সি ধরে সোনাগাছি চলে গেলেন। তারপরই মানদাকে তুলে নিয়ে ঝড়ের মতই আবার ফিরে এলেন বৌবাজারে। রাস্তার উল্টো ফুটপাথে দাঁড়িয়ে মানদাকে সেই পান দোকানটিতে পাঠালেন, পান কেনার বাহানায়। একটু পরেই মুখে পান গুঁজতে গুঁজতে মানদা ফিরে এসে বলল, 'হ্যাঁ গা, এই মিনসের কাছেই মধুবালা যেত। হারামী মেয়েটাকে শেষ করে দিলে গা।'

ওয়াহেদ সাহেব মানদাকে সোনাগাছিতে ফেরত পাঠিয়ে 'রত্ন ভাণ্ডারে' ঢুকলেন। প্রথম আলাপেই বুঝতে পারলেন ভদ্রলোক শিক্ষিত অমায়িক মানুষ। সরাসরি নিজের পরিচয় দিয়ে ওয়াহেদ সাহেব ভদ্রলোকের নাম জানতে চাইলেন। ভদ্রলোকের নাম পরিমল চন্দ্র রায়। মাড়োয়ারী আর সোনার কারবারীরা ব্যবসায় যতই চতুর হোক, পুলিশ দেখলেই তাদের ব্লাড প্রেসার বেড়ে যায়। পরিমলবাবুও তার ব্যতিক্রম নন। ওয়াহেদ সাহেবের পরিচয় শুনে তিনি এমন ঘাবড়ে গেলেন যে, তাঁকে ধাতস্থ করতে বেশ কিছুক্ষণ সময় লাগল। তারপর দোকানের এক কোণে ডেকে নিয়ে গিয়ে ওয়াহেদ সাহেব জেরা শুরু করলেন। বোঝা গেল মধুবালা যে খুন হয়েছে, তা তিনি এখনো জানেন না। তবে তার নিখোঁজ হবার খবর তিনি জানেন। খুনের কথা ওয়াহেদ সাহেবও তাঁকে বললেন না।

জিজ্ঞাসাবাদের জবাবে পরিমলবাবু জানালেন, মধুবালা তাঁর রক্ষিতা ছিল। মধুবালাকে তিনি বাগানবাড়িতে নিয়ে আসতেন। দিন সাতেক আগেও তিনি সোনাগাছি গেছিলেন মধুবালার খোঁজে। দেখা হয় নি। জানতে পারেন, কার সঙ্গে সে নাকি পালিয়ে গেছে। তারপর ও মুখো আর হন নি।

খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে পরিমলবাবু আবার বলতে শুরু করলেন। মধুবালাকে তিনি ভালবেসে ফেলেছিলেন। নিয়মিত মেলামেশার ফলে দুর্বল হয়ে পড়েছিলেন মনের দিক থেকে। তাছাড়া মেয়েটিও তাঁকে খুব তৃপ্তি দিত। নিজের স্ত্রীর কাছে যা পাননি, মধুবালা তা সবই উজাড় করে দিত। ঘন ঘন আসতে চাইত পরিমলবাবুর কাছে। ভাল লাগত বলে পরিমলবাবুও তাকে অনেক উপহার দিয়েছিলেন। টাকা-পয়সাও দিতেন। তবে মধুবালা নিজে তেমন কিছু দাবি করত না। বলত, তোমার কাছে আনন্দ পাই, তাই আসি।

কথা বলতে বলতে পরিমলবাবুর ক্ষোভ ফেটে পড়ল। বললেন, 'দেখুন কেমন ছলনাময়ী, বেইমান মেয়েমানুষ, দিব্যি আরেকটি নাগর জুটিয়ে কেটে পড়েছে।

পরিমলবাবুর দাম্পত্য জীবন যে সুখের নয়, কিছুক্ষণের আলাপেই ওয়াহেদ সাহেব তা বুঝতে পারলেন। আরও দু একটি কথা বলে, কথার ফাঁকেই পরিমলবাবুর বাগানবাড়ির ঠিকানা জেনে নিয়ে ওয়াহেদ সাহেব সেদিনের মত বিদায় নিলেন। যাবার আগে পরিমলবাবুকে মধুবালার শেষ পরিণতির কথাটাও জানিয়ে গেলেন। সে কথা শুনে ডুকরে কেঁদে উঠলেন পরিমলবাবু। ওয়াহেদ সাহেব লক্ষ্য করলেন, এ প্রকৃতই ব্যথাতুর মানুষের কান্না। মধুবালা তাঁর নিঃসঙ্গ জীবনে যথার্থই সঙ্গিনী হয়ে উঠেছিল। ওয়াহেদ সাহেব বেরিয়ে গেলেন।

উত্তর শহরতলির হাতিয়াড়ায় পরিমলবাবুর সুন্দর বাগানবাড়ি। বেশ মনোরম পরিবেশ। চারদিকে পাঁচিল ঘেরা বাগানের মাঝখানে ছোট্ট একটি বাংলো। আম, কাঁঠাল, লিচু, সবেদা,
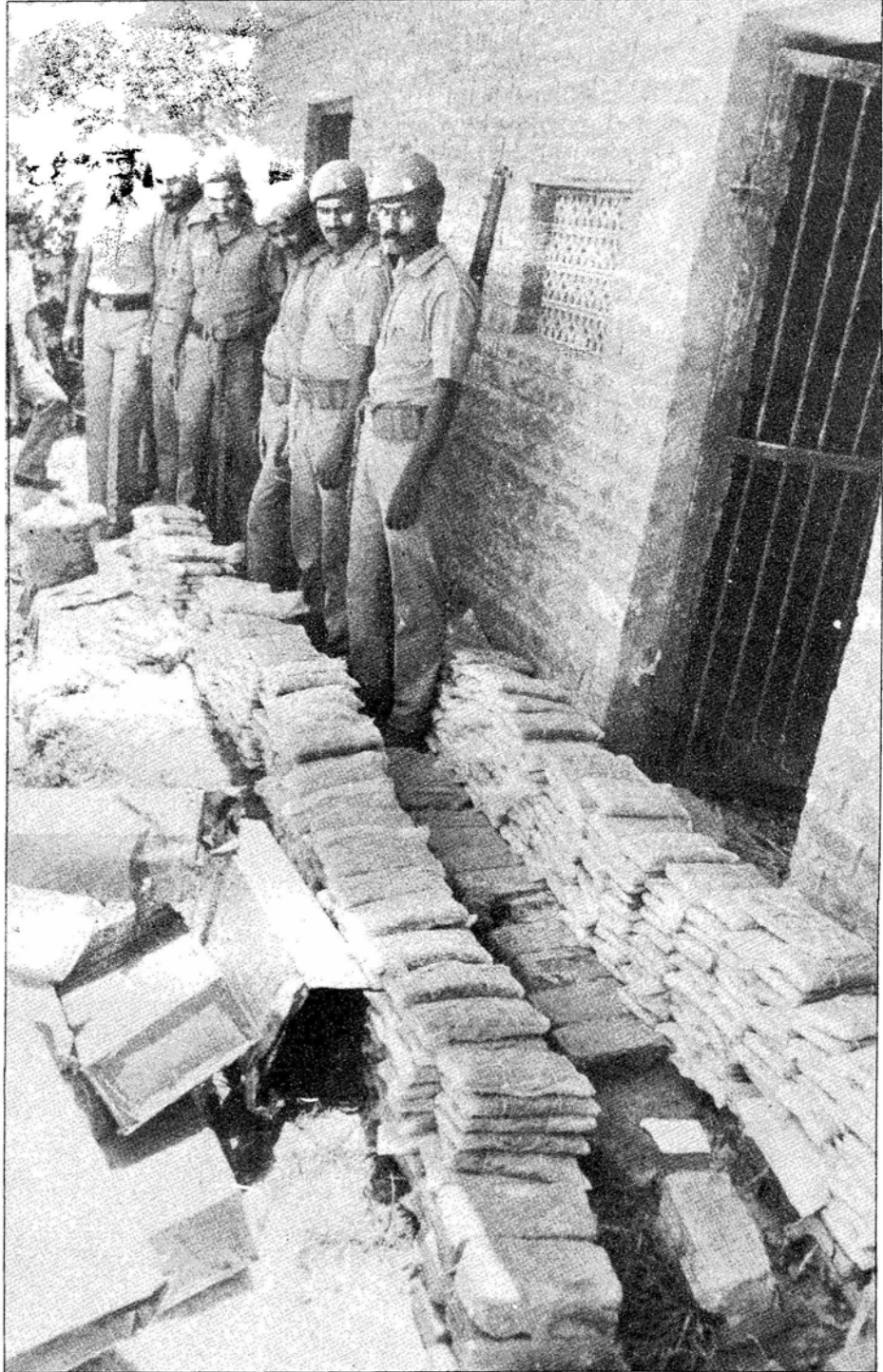
দিল্লির উপকণ্ঠের ফার্মহাউস্ থেকে বাজেয়াপ্ত হাসিস,

পেয়ারা নানা রকম ফলের গাছ। বাংলোর পিছন দিকে পাড় ঘেরা একটি ছোট্ট পুকুর। টলটলে জল। পুকুর পাড়ে সারি সারি নারকেল গাছ।

বাগানবাড়ি দেখাশোনা করে এক নেপালী দারোয়ান। সে মালির কাজও করে। তার নাম বীর বাহাদুর। বাগানের মধ্যেই একটি টিন-ছাওয়া ঘরে সে একাই থাকে। নিজেই রান্না করে খায়। পোষা কুকুরের মতই নেপালীরা প্রভুভক্ত। সে কথা মনে রেখেই ওয়াহেদ সাহেব তার মুখোমুখি হলেন। সঙ্গে তাগড়া চেহারার গোঁফওয়ালা দুজন বিহারী সেপাই। কাছে যেতেই বীর বাহাদুর বেশ ভারিক্কি মেজাজে ওয়াহেদ সাহেবের পরিচয় এবং তাঁর আগমনের কারণ জানতে চাইল। ওয়াহেদ সাহেবের পরিচয় জেনেই মুহূর্তে তার মুখ বিবর্ণ হয়ে গেল। তার মুখে কোন কথা নেই। ওয়াহেদ সাহেব দু'জন স্থানীয় লোককে ডেকে আনলেন সাক্ষী হিসাবে। তারপর সোজা বাড়ির ভেতরে। ভেতরে কেউ নেই বলে বীর বাহাদুর বারবার নিরস্ত করার চেষ্টা করলেও, ওয়াহেদ সাহেব থামলেন না। প্রতিটি ঘরই তিনি সার্চ করতে লাগলেন, গোয়েন্দার অনুসন্ধানী দৃষ্টি দিয়ে। মনে হল সব ঘরগুলি ব্যবহার করা হয় না। ঢুকলেন পরিমলবাবুর বেডরুমে। কিন্তু সন্দেহজনক কিছু দেখতে পেলেন না। তারপর পাশের লাগোয়া ঘরটিতে ঢুকতেই এক জায়গায় দৃষ্টি আটকে গেল। সেখানে এক কোণে মেঝের ওপর কিছু পুরনো বই আর কাগজপত্র ছড়ানো। পাশেই তিনটি করে ছটি ইঁট-দু'সারিতে সাজানো রয়েছে। দু সারির মাঝখানে খানিকটা ফাঁক। ওয়াহেদ সাহেব এগিয়ে গেলেন। ইঁটের উপর ভারী ট্রাংকের দাগ স্পষ্ট হয়ে আছে। মনে হয় ইঁটের ওপর কোন বাক্স-প্যাটরা অনেকদিন রাখা ছিল, যা সম্প্রতি সরানো হয়েছে। তাই দাগটুকু মিলিয়ে যায়নি। বীর বাহাদুরকে এ সম্পর্কে প্রশ্ন করলে সে জানাল, ওখানে একটি ট্রাংক ছিল। কিন্তু কি কাজে দরকার পড়ায় সেটি বাবুর বাড়িতে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে। বই ও কাগজপত্রগুলো তখনই বের করে নেওয়া হয়েছিল। কিন্তু বীর বাহাদুরের উত্তর-ওয়াহেদ সাহেবকে খুশি করতে পারল না। কারণ মেঝেতে যে বইগুলি পড়ে ছিল, তার মধ্যে কয়েকটি বেশ মূল্যবান এবং দুষ্প্রাপ্য। একটি পুরনো ট্রাংকের চেয়ে নিশ্চয়ই সেগুলি কম প্রয়োজনীয় নয়। দরকার হলে পরিমলবাবু বাড়ির জন্য আরেকটি ট্রাংক কিনতে পারতেন। সুতরাং সন্দেহের গন্ধ পেলেন ওয়াহেদ সাহেব। সঙ্গে সঙ্গে মেঝেতে উবু হয়ে বসে বই এবং কাগজগুলো দেখতে শুরু করলেন। কয়েকটি বইয়ে পরিমলবাবুর নাম লেখা। কাগজপত্রের মধ্যে পাওয়া গেল পরিমলবাবুর কয়েকটি চিঠি। পড়ে দেখলেন। কিন্তু তাতে ঘটনার কোন যোগসূত্র পাওয়া গেল না। চিঠির সঙ্গেই পড়েছিল একটি পুরনো স্টেটসম্যানের পাতা। একদিনের গোটা সংবাদপত্র ভাঁজ করে ট্রাংকের তলায় ঢাকা দেওয়া হয়েছিল। কারণ পৃষ্ঠাগুলির এখানে সেখানে দেখা গেল পুরনো মরচের দাগ। দু'এক জায়গা ছিঁড়েও গেছে। ১৯৭২ সালের ১০ নভেম্বরের স্টেটসম্যান। ক্যালকাটা এডিশন।

সঙ্গে সঙ্গে ওয়াহেদ সাহেবের মনে এক চিলতে আশার আলো ঝিলিক দিয়ে উঠল। ভাবলেন, ট্রাংকের তলায় কাগজের মরচে ধরা টুকরো সেঁটে থাকা বিচিত্র নয়। মধুবালার খণ্ডিত লাশ, যে ট্রাংকে ভরা ছিল সেটি এখন লালবাজারে গোয়েন্দা বিভাগের হেফাজতে। সুতরাং ওয়াহেদ সাহেব সাক্ষীদের দিয়ে কাগজের প্রতি পৃষ্ঠায়-উপরে নিচে সই করিয়ে স্টেটসম্যানটি নিজের হেফাজতে রেখে দিলেন। তারপর আরেক প্রস্থ জিজ্ঞাসাবাদ চালিয়ে বীর বাহাদুরকে সঙ্গে নিয়ে পরিমলবাবুর বাগানবাড়ি থেকে বেরিয়ে এলেন। বীর বাহাদুর প্রথমে আসতে চাইছিল না। কিন্তু ওয়াহেদ সাহেব একটু ভয় দেখাতেই-সে সুড় সুড় করে বেরিয়ে এল।

পরিমলবাবুর বাগানবাড়ি থেকে সোজা সোনাগাছির গৌরীশংকর লেনে মানদার ডেরায়। মানদা তৎক্ষণাৎ বীর বাহাদুরকে সনাক্ত করল। পাশের ঘরের মেয়েরাও জানাল, এই লোকটিই সেদিন সন্ধ্যাবেলা মধুবালাকে তার বাবুর কাছে নিয়ে গেছিল।

ওয়াহেদ সাহেব আর কথা না বাড়িয়ে বীর বাহাদুরকে সঙ্গে নিয়ে লালবাজারে এলেন। কোন নিরপরাধ লোককে অযথা হয়রান করা তাঁর নীতিবিরুদ্ধ। সুতরাং সাক্ষ্য-প্রমাণসহ খুনের ঘটনাকে প্রতিষ্ঠিত করা চাই। তাই প্রথমেই ট্রাংকটির নিচের দিকটি পরীক্ষা করে দেখলেন। অনেকদিন ইঁটের উপর থাকায় দুগো দাগ স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। এবার ট্রাংক খুলে ভেতরটা দেখলেন। হ্যাঁ, তাঁর অনুমান সঠিক। কয়েক টুকরো কাগজ তখনো সেঁটে লেগে আছে ট্রাংকটির তলায়। ওয়াহেদ সাহেব খুব সতর্কভাবে স্টেটসম্যানের ছিঁড়ে যাওয়া অংশগুলির সঙ্গে ট্রাংকের তলায় সেঁটে থাকা কাগজের টুকরোগুলির পাঠ মিলিয়ে দেখলেন। মিলে গেল। আরেকটু সংশয়মুক্ত হবার জন্য বীর বাহাদুরের দেহ তল্লাশি করতেই, তার কোমরে পাওয়া গেল এক গোছা চাবি। বীর বাহাদুর জানাল সেগুলো বাগানবাড়ির বিভিন্ন দরজা ও আলমারির চাবি। সঙ্গে সঙ্গে ওয়াহেদ সাহেব ট্রাংকটির ভাঙা কবজায় লাগানো তালাটি নিয়ে এলেন। তারপর একের পর এক চাবি দিয়ে তালাটি খোলার চেষ্টা করতে লাগলেন। আশ্চর্য! দেরি হল না। অল্প প্রয়াসেই একটি চাবিতে তালাটি খুলে গেল। ওয়াহেদ সাহেব আর দেরি করলেন না। খুনের প্রাথমিক প্রমাণ এখন তাঁর হস্তগত। সুতরাং বীর বাহাদুরকে গ্রেপ্তার করলেন। সেদিন ছিল ২৩ জুন, ১৯৮৩।

জেরার জবাবে বীর বাহাদুর আবোল তাবোল বকতে লাগল। ওয়াহেদ সাহেব ভাবলেন, সোজা আঙুলে ঘি উঠবে না। আঙুলটিকে বাঁকাতে হবে। একই সঙ্গে শুরু করলেন ভয় দেখানো, আর সহানুভূতিশীল কথাবার্তা। বললেন, 'খুনের প্রমাণ স্পষ্ট। এবার আদালতে বিচার হবে। বিচারে তোমার ফাঁসিও হতে পারে। কিছু না হলেও যাবজ্জীবন জেল তো হবেই। অথচ দেশে তোমার ছেলে বউ আছে। তোমার উপার্জনেই তারা খায়, পরে। মানুষ বড় নেমকহারাম। তোমার অবর্তমানে খুনীরা তাদের দায়-দায়িত্ব নেবে না। তখন তাদের কি হবে? অথচ আমি জানি তুমি নিজে খুন করো নি। এ অবস্থায় একমাত্র আমিই তোমাকে বাঁচাতে পারি। তুমি সত্যি কথা বললে আমি তোমাকে বাঁচাবার চেষ্টা করব।'

কিন্তু যতই বলেন, বীর বাহাদুর নিরুত্তর থাকে। এদিকে রাত বাড়ছে। তাই বীর বাহাদুরকে সেদিনের মত লক আপে চালান করে, ওয়াহেদ সাহেব বাসায় ফিরে এলেন।

শেষ পর্যন্ত বীরবাহাদুর কবুল করল, পরিমলবাবুর দুই ছেলে তরুণ আর তাপসই মধুবালাকে খুন করেছে। কারণ ছিল পারিবারিক সম্মানরক্ষা। তাদের চাপে পড়ে মধুবালাকে অবশ্য বীর-

(৯৪ পৃষ্ঠায় দেখুন)

বাগানবাড়িতে ধরা পড়া বাবু ও বিবিরা

ঝাড়খন্ড ঝড় আদিবাসী রক্তে আগুন জ্বলল কেন ?

২১ ও আগস্ট সোমবারের সকালে পুরুলিয়ার মানবাজার এলাকার যমুনাবাধ গ্রামে এক দল উত্তেজিত সি পি আই (এম) সমর্থকদের হাতে ঝাড়খণ্ড মুক্তি মোর্চার চারজন কর্মী নিহত হন. এবং গুরুতর আহত অবস্থায় পুরুলিয়ার প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে ভর্তি হন সাতজন। পুরুলিয়া পার্শ্ববর্তী গ্রামে ২৪ তারিখে ঝাড়খণ্ডীদের একটি জনসভা ছিল। নিহত এবং আহতরা জনসভা সেরে বাড়ি ফিরছিলেন। পথেই এই আক্রমণ ও মৃত্যু খবরটি দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে পুরুলিয়ার আদিবাসী মহল্লাগুলিতে সাঁওতাল সাংস্কৃতিক আবা গাঁওতার নাম করে গাঁড়া পড়ল শালছালে গাঁড়া অর্থাৎ গাঁট বাঁধা–ঐক্যবদ্ধ সংগ্রামের ডাক তাহলে কি আবার আদিবাসী রক্তে আগুন জ্বলে উঠল স্বজাতি, স্বভ্রাতার মৃত্যুর বদলা নিতে. নাকি দীর্ঘ ৩৮ বছরের বঞ্চনার প্রতিশোধ নিতে ?

অরণ্যের অধিকার আদায়ের দাবিতে উত্তাল আদিবাসী সমাজ

অরণ্যের অধিকার নিয়ে শালপিয়াল ক্যাঁদের দেশে বিক্ষোভের আগুন। কেন ঝাড়খণ্ড আন্দোলনের ডাকে পশ্চিমবঙ্গ, বিহার, ওড়িশার আদিবাসীরা উদ্দাম হয়ে যায় ? ঝাড়খণ্ডীদের সঙ্গে বাম দলগুলির রাজনৈতিক লড়াই কিসের ? এই আন্দোলনের নেপথ্যে কি বিদেশি মিশনারিদের হাত আছে ? নাকি নকশালপন্থীর ? অরণ্যচর মানুষদের দীর্ঘ লড়াই–এর পশ্চাদপট থেকে মূল কারণগুলি সংগ্রহ করেছেন আমাদের বিশেষ প্রতিনিধি।

গেল অক্টোবরের ১৯ তারিখ ইস্পাতনগরী জামসেদপুর মুখর হয়ে উঠেছিল ধামসা, মাদল, তুঙমাদল ও লাউতুম্বার শব্দে। শেষ শরতের খর উত্তাপ উপেক্ষা করে শালপিয়াল ক্যাঁদের দীর্ঘ ছায়ার আশপাশে জমা হয়েছিল বীরসা মুণ্ডা, সিধুকানু, গংগানারায়ণ ও ডমনশীতল মাহাতোর উত্তরসূরীরা

তীব্র রোদে জ্বলে উঠল টাঙ্গির চকচকে ফলা. পতপত্ করে হাওয়ায় উড়ল সবুজ ঝাণ্ডা. শপথের মুঠো ভরা শক্ত সবল হাত তুলে দশ হাজার আদিবাসী সোচ্চার জানান দিল–'ঝাড়খণ্ড হামদের. হামদের রাজ্য দিতে হবেক সাঁওতালরা বললেন–'আবোয়ারাজ এমো হইওরা' মুণ্ডা মুণ্ডারীতে আওয়াজ দিলেন–'আবুয়া দিসুম অঁসেতে হবাওয়া অর্থাৎ আমাদের রাজ্য দিতে হবে শুধু 'দিতে হবে'র আবেদন নিবেদন নয় সমবেত সাঁওতাল,

মাহলি চীৎকার করে কাঁপিয়ে দিল ইস্পাতনগর, হাতা আবম নেবই। নেব ছিনিয়ে নেব।

ওরা পৃথক ঝাড়খণ্ড রাজ্য আদায়ের দাবিতে সোচ্চার। বিহারের রাঁচি জেলার খুঁটি কেন্দ্র থেকে লোকসভায় নির্বাচিত এম.পি.এন ই হোরো, লক্ষ্নৌ বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক বি পি কেশরী, অ্যাডভোকেট বিষ্ণুপদ সরেন, কে কে সিং এখন ওদের নেতৃত্বে।

১৯৫০ সালে ঝাড়খণ্ড পারটির জন্ম। নেতৃত্বে ছিলেন একজন অ-আদিবাসী-জয়পাল সিং কিন্তু আলাদা ভাবে ঝাড়খণ্ডের দাবি আরো আগে থেকে।

ঝাড়খণ্ডে আলাদা রাজ্যের আন্দোলনের বীজ বোনা হয় অষ্টাদশ শতাব্দীতে। ইংরেজ শাসনের সময় থেকেই শুরু হয়েছিল আদিবাসীদের শোষণ। চতুর ব্রিটিশ শাসককুল আদিবাসী অধ্যুষিত এলাকাগুলি দেখেই বুঝেছিল লাভের স্বর্ণখনি সেগুলি। তাদের ব্যবসায়ী থাবার কামড় অব্যাহত রাখতে তারা আদিবাসীদের মধ্যে ঢুকিয়ে দিতে চাইল ব্রিটিশ বেনিয়ার তৈরি করা এমন এক সংস্কৃতি যেখানে শোষণের প্রকৃত অবস্থা বুঝে উঠবার কোনও সুযোগ নেই। আমদানী হয়ে এল খ্রীষ্টান মিশনারীরা। ব্যবসা-ব্যাপারীর হাত ধরাধরি করে এল বাইবেল। ধর্মান্তরিত করা হতে লাগল পুরোদমে।

আদিবাসীদের জমি গেছে খনিজ দ্রব্যের লোভের হাতে পাহাড় গেছে। হাতছাড়া হয়েছে আশপাশের অরণ্যের অধিকার। এবার যেতে বসেছে ধর্ম সংস্কৃতি, শেষ হতে চলেছে নিজস্ব সমাজ ব্যবস্থা।

কিন্তু অরণ্যচর সরল মাটির মানুষগুলি এ সবকিছু নীরবে মেনে নেয় নি। ১৭৮১ সালের তিলকা মাঝি বিদ্রোহ, ১৮৫৫-র সিধু কানুর সাঁওতাল বিদ্রোহ ও ১৮৯৫ সালে বীর বীরসা মুণ্ডার বিদেশী তাড়াবার লড়াই-এর জ্বলন্ত প্রমাণ দেয় সাকরেদদের শোষণের বিরুদ্ধে আদিবাসীদের নিয়ে ছোটনাগপুরে একটা আন্দোলনের জন্ম হয়। ১৯১১-১২ সালে খ্রীষ্টান ছাত্র ইউনিয়ন এদিকে নজর দেয়। এবং ঢাকা ছাত্র ইউনিয়নের একটি শাখা হিসেবে রাঁচিতে ১৯১৩ সালে প্রথম আলাদা ভাবে ঝাড়খণ্ডের দাবি ওঠে।

এরপর ১৯৩৭ সালে স্বামী সহজানন্দ আদিবাসী এলাকাগুলিতে সফর করে আদিবাসীদের
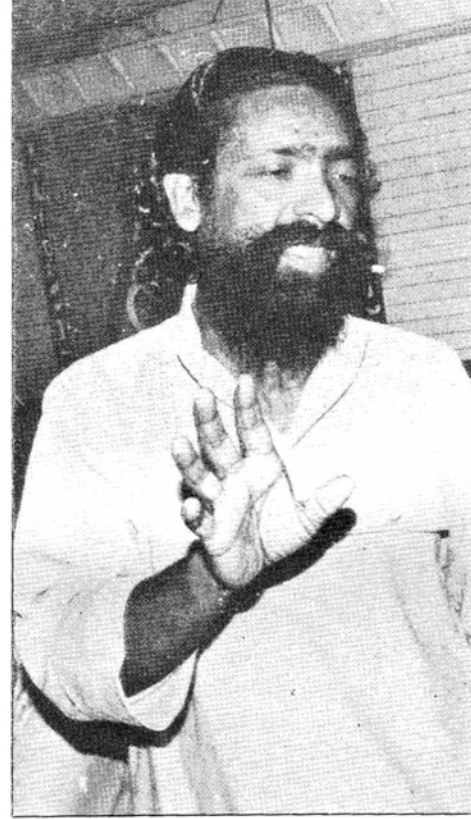
ঝাড়খণ্ড দলের তাত্ত্বিক নেতা শিবু সোরেন

ঝাড়খণ্ডের দাবিতে চরমপত্র

ছোটনাগপুরে আদিবাসী মহাসভা গঠিত হয়। কিন্তু মূলত জাতীয়তাবাদী সংস্কারপন্থী চরিত্র নিয়ে বেড়ে ওঠা এইসব সংগঠনগুলি আন্দোলনও পরিচালিত করে একই পথে, একই ধ্যানধারণায়।

১৯৬৩ সালে ঝাড়খণ্ড পারটি, প্রতিষ্ঠাতা জয়পাল সিং-এর ইচ্ছায় কংগ্রেসে যোগ দেয়। অবশ্য তখন আদিবাসীদের বোঝানো হয়েছিল কংগ্রেস আলাদা ঝাড়খণ্ড রাজ্যের স্বীকৃতি দেবে। কিন্তু আজ পর্যন্ত তা হয়নি। মূল ব্যাপারটা ছিল জয়পাল সিং-এর কংগ্রেসে হাই লেভেলের নেতা বনে যাওয়া।

এরপর ঝাড়খণ্ড পারটিও স্বভাবতই বেরিয়ে আসতে বাধ্য হয়েছে কংগ্রেস থেকে তারপর থেকে আন্দোলন। আলাদা ঝাড়খণ্ড রাজ্য গঠনের জন্য আন্দোলন।

মধ্যপ্রদেশ, ওড়িশা, বিহার ও পশ্চিমবঙ্গের আদিবাসী প্রধান ১৬টি জেলা নিয়ে প্রস্তাবিত এই ঝাড়খণ্ড রাজ্য। দিনের পর দিন ঝাড়খণ্ডীরা দেখেছে 'দিকু' অর্থাৎ বিদেশীরা এসেছে, শোষণ চালিয়েছে, অরণ্য কেড়ে নিয়েছে, ধর্ম বদল করেছে। তাই 'দিকু'কে তারা 'দাকু' অর্থাৎ শত্রু হিসেবেই চিনেছে। তাই কে প্রকৃত ঝাড়খণ্ডী তার সংজ্ঞাও বের করেছে ঝাড়খণ্ডী তার নিজস্ব সংস্কৃতির চেতনায়। দুর্গাপূজা থেকে যে টুসু পূজাকে বড় বলে মনে করে সেই ঝাড়খণ্ডী। দোল উৎসব থেকেও যে করমপুজোকে বড় মানে সেই ঝাড়খণ্ডী। সর্বোপরি নিজের বর্তমান ও ভবিষ্যৎ যে শুধুমাত্র ঝাড়খণ্ডেই রেখেছে সেই ঝাড়খণ্ডী।

দক্ষিণ বিহার উপত্যকা এবং সমতল ভূমি, পশ্চিমবঙ্গে বাঁকুড়া, পুরুলিয়া, মেদিনীপুর, মধ্যপ্রদেশের মধ্য সমতল ভূমি, উড়িষ্যার পর্বতসংকুল এলাকাগুলি মূলত ঝাড়খণ্ড দাবি ভুক্ত এলাকা বলে চিহ্নিত। বন, পাহাড় ও ডুংরির ঘেরাটোপ পরা ভারতের অত্যন্ত প্রাচীন অঞ্চল এই ঝাড়খণ্ডভূমি। চাষবাস এবং অরণ্য-নির্ভর এখানকার সমাজ জীবন। এখানকার পাথুরে মাটির বুকে লুকিয়ে থাকা খনিজ সম্পদের লোভে বিদেশীরা এল ঝাড়খণ্ডে

তৈরি হল খনি, কারখানা। হল ইমারত নির্মাণ। যার জন্য বিক্রি হল আদিবাসীদের চাষের জমিন। বনের কাঠপাতা, মধু নিয়ে ব্যবসা শুরু হল। বন-সংরক্ষণের নামে আদিবাসীদের জঙ্গলের ওপর জন্মগত অধিকার কেড়ে নেওয়া হল অথচ এই বনজঙ্গলই ছিল তাদের মা, দুঃসময়ের বন্ধু জমিহারা উদ্বাস্তুপ্রায় আদিবাসীদের বাধ্য করা হল দুঃসহ কুলিগিরির কাজ নিতে তৈরি করা নিদারুণ অর্থনৈতিক চাপের জাঁতাকলে পেষণ হওয়া শ্রমজীবী ঝাড়খণ্ডীরা বাধ্য হল খাদানে, খনিতে, কারখানায় কাজ নিতে। আর মুনাফালোভী বেনিয়ারাও পেয়ে গেল অর্দ্ধমূল্যের পরিশ্রমী শ্রমিক।

এই ঝাড়খণ্ডেই আছে এক ধরনের সাপ-দুধবোড়া। রাতের অন্ধকারে আঁতুড় ঘরে প্রসূতি মা যখন গভীর ঘুমে অচেতন। সাপটা তখন চুপিসাড়ে ঘরে ঢোকে। ঘুমন্ত মায়ের বুকে মুখ দিয়ে শুষে নেয় সবটুকু দুধ আর পাশে শোয়া নবজাতকের মুখে ঢুকিয়ে দেয় ন্যাড়া লেজ

মা ভাবে শিশু আমার দুধ খাচ্ছে। লেজ চুষতে চুষতে শিশু ভাবে মায়ের দুধ খাচ্ছি। দিনে দিনে রুগ্ন ও দুর্বল হতে থাকে শিশু। ডাক্তার, বদ্যি রোগ ধরতে পারে না। সাপ দুধ চুরি করে খেয়েই যায়।

আদিবাসী ওঝা কিন্তু সে শিশুর জিভ দেখেই বলে দিতে পারেন মায়ের স্তন নয় শিশুটি চুষছে সাপের লেজ। ঝাড়খণ্ড আন্দোলনের নেতারা বলেন—কয়লা, অভ্র, তামা ও সোনার খনির ঝাড়খণ্ডভূমি তাঁদের মা, আর সাড়ে তিনকোটি আদিবাসী সেই বঞ্চিত শিশু। আর এই ঝাড়খণ্ড আন্দোলন হল সেই আদিবাসী ওঝা, যিনি প্রকৃত শত্রু চিনিয়ে দেবেন ঝাড়খণ্ডীদের।

সংশ্লিষ্ট চারটি রাজ্য সরকার, কি কংগ্রেস, কি বামফ্রন্ট কেউই প্রত্যাশা পূরণ করতে পারেননি এদের। সন্তোষ তো দূরের কথা ক্ষোভের তাদের সীমা পরিসীমা নেই। বিহার সরকারই ঝাড়খণ্ডের সাতটি জেলা থেকে যে রাজস্ব আহরণ করেন তা গোটা রাজ্যের মোট আদায়কৃত রাজস্বের সত্তর ভাগ। অথচ ওই সাতটি জেলার উন্নতির জন্য ব্যয় হয় কি পরিমাণ অর্থ ? পশ্চিমবঙ্গ সরকারই বা আদিবাসীদের জন্য কতটা করছেন? আদিবাসী উন্নয়নের নামে ঝাড়গ্রামে ও পুরুলিয়ায় যে গুচ্ছের টাকা ঢালা হচ্ছে তাতে প্রকৃত উন্নয়ন হচ্ছে কতটা ? অর্থনৈতিক কষ্ট থেকেই তো ঝাড়গ্রামের পতিনা গ্রামে লোধা সাঁওতালদের লড়াই ও সতের জনের মৃত্যু। পশ্চিমবঙ্গের খাদানগুলিতে এখনো আদিবাসীদের খাটানো হয় নামমাত্র মূল্যে। একমাত্র ধানবাদের খনিঅঞ্চল ছাড়া সর্বত্রই ঝাড়খণ্ডীরা সংখ্যালঘু শ্রমিক। তাই ওরা যখন অভিযোগ করে, তাদের সর্বস্ব লুঠ করে শহরমুখী উন্নয়ন কর্মসূচী ফলপ্রসূ করা হচ্ছে তখন তা একেবারে উড়িয়ে দেওয়া যায় না।

আদিবাসীরা নিজস্ব প্রথা অনুযায়ী চাষ করে। পার্বত্য এলাকায় জমির উর্বরতা বাড়ানোর জন্য একবার চাষ করার পর তা ফেলে রাখে। আর অনাবাদী জমি দেখলে সরকারী আমলারা অমনি তা বিলি করার জন্য উঠে পড়ে লাগেন।

এভাবেই বর্তমান প্রশাসনিক কাঠামোর সঙ্গে ঝাড়খণ্ডীদের বিরোধ বাঁধতে আরম্ভ করে। ঠকে শিখে ঝাড়খণ্ডীরা ক্রমশই বুঝতে শুরু করে এই কাঠামো তাদের সামগ্রিক কল্যাণের দিকে কোনকালেই তাকাবে না। ফলে পৃথক ঝাড়খণ্ড রাজ্যের দাবি শক্তিশালী হতে আরম্ভ করে।

এবারকার ঝাড়খণ্ড পার্টির দশম বার্ষিক সম্মেলনে তাই কতগুলি জোরদার প্রস্তাব নেওয়া হয়। (১) ভারতীয় সাংবিধানিক কাঠামোর মধ্যে থেকেই আলাদা রাজ্যের জন্য কমিশন বসাতে বাধ্য করা হবে কেন্দ্রিয় সরকারকে গণতান্ত্রিক আন্দোলনের মধ্য দিয়ে, (২) ঝাড়খণ্ড এলাকার সম্পদ বাইরে নিয়ে যেতে দেওয়া হবে না। (৩) সরকারী মাদক ব্যবসা বন্ধ করাতে হবে, (৪) ঝাড়খণ্ডে জমির মালিকানা ও চাকরি একই সঙ্গে রাখতে দেওয়া চলবে না।

পশ্চিমবঙ্গের ঝাড়খণ্ডী নেতা আইনজীবী বিষ্ণুপদ সরেন সি.পি. এমের সঙ্গে ক্রমবর্ধমান ঝাড়খণ্ডী বিরোধ উল্লেখ করলেন। তাঁর মতে সি পি এম ক্রমেই বিচ্ছিন্ন হয়ে যাচ্ছে আদিবাসী মেহনতী মানুষের কাছ থেকে। তাই বাঙালি বিদ্বেষের অপপ্রচার চালাচ্ছে ঝাড়খণ্ডীদের বিরুদ্ধে। বিশেষত ঝাড়গ্রাম জমি বিলি নিয়ে বিরোধ বাড়ছে সি পি এমের সঙ্গে। অপারেশন বর্গার কাজকর্মও ঝাড়খণ্ডীরা ভালো চোখে দেখছেন না। দলীয় সদস্যদের কোলে ঝোল—টানাটানি এদের ক্রমশই আশংকিত করে তুলছে।

ঝাড়খণ্ডনেতা সুরজ মণ্ডল

এম এল এ রাম সতপথী, সুধাংশু মাঝি ও রাষ্ট্রমন্ত্রী শ্রী শম্ভু মাণ্ডীর বিরুদ্ধে ঝাড়খণ্ড পার্টির অভিযোগ, এঁরা আদিবাসীদের সমস্যা যথাযথভাবে তুলে ধরছেন না বিধানসভায়। ওঁদেরই সুপারিশে নাকি এই ঝাড়খণ্ড আন্দোলন দমন করতে বিশেষ প্রশাসন ও পুলিশবাহিনী নিয়োগ করা হয়েছে। শুধু কুড়ুলের ফলা দিয়ে যেমন জঙ্গলের কাঠ উজাড় করা যায় না, ওই কাঠেরই বাঁট লাগিয়ে তবেই কুড়ুল চালানো যায়, ঝাড়খণ্ড পার্টির চোখে আদিবাসী জনপ্রতিনিধিরাও নাকি তাই। তাঁদের লোককেই লাগানো হয়েছে তাদেরকে ধ্বংস করতে।

ঝাড়খণ্ড পার্টির সভাপতি এন.ই. হোরো, এম. পি. বললেন, দেখেশুনে জঙ্গী ঝাড়খণ্ডী যুবকেরা আসাম, ত্রিপুরা ধাঁচের আন্দোলনে প্রলুব্ধ হচ্ছে। আমরা ওদের নিষেধ করছি। আমরা চাই পৃথক ঝাড়খণ্ড রাজ্য ভারতেরই থাকুক। ঝাড়খণ্ডের সম্পদ সব ভারতবাসীই ভোগ করুক। আমাদের শুধু নাগাল্যাণ্ড, মিজোরামের মত আলাদা অস্তিত্ব ও আলাদা মর্যাদা দেওয়া হোক। সরকার শুনছেন না। পুলিশ দেখাচ্ছেন। আগামী দিনে যদি ঝাড়খণ্ডও ত্রিপুরা হয়, দার্জিলিং হয়, তার জন্য দায়ী হবে কে? ঝাড়খণ্ড আন্দোলনকে বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলন দেখানোরও একটা স্বার্থ আছে। পুরো অঞ্চলটা খনিজ এবং বনজ সম্পদে সমৃদ্ধ। সরকার একে আলাদা রাজ্যের মর্যাদা দিলে আজ যারা ঝাড়খণ্ডীদের ঠকিয়ে লুটেপুটে খাচ্ছে তাদের স্বার্থে ঘা পড়বে। এছাড়াও এটাকে বিচ্ছিন্নতাবাদী বলা যায় কোন যুক্তিতে ? নাগাল্যাণ্ড, মিজোরাম ও মেঘালয়কে যদি আলাদা অস্তিত্ব দেওয়া দোষের না হয়, তাহলে ঝাড়খণ্ডের দাবি যা ভারতরাষ্ট্রের মধ্যেই একটি রাজ্যের প্রতিষ্ঠা; তা দোষের কেন ? আজকে পাঞ্জাবের একটি অংশের স্বতন্ত্র রাজ্যের দাবি বা কাশ্মীরে মুখ্যমন্ত্রীর বিচ্ছিন্ন হবার মানসিকতাকে বিচ্ছিন্নতাবাদী না বলে ঝাড়খণ্ডীদের

রাজপথে দাবি আদায়ের মিছিল

ঝাড়ে দোষ চাপানো কেন ?

অক্টোবরের শেষ দিনটিতে জামশেদপুরে ঝাড়খণ্ডীদের একাংশের সমাবেশের প্রতিধ্বনি করে যেন গর্জে উঠল পুরুলিয়া কোর্ট প্রাঙ্গনের বিশ হাজারের আদিবাসী জমায়েৎ—শুধু ঝাড়খণ্ডই নয়, চাই আদিবাসীদের লালখণ্ড ! এর উদ্যোক্তা ঝাড়খণ্ড মুক্তি মোর্চা । এটা ঝাড়খণ্ড আন্দোলনের আরেকটা দিক ।

১৯৬৮ সালে রাঁচি শহরে হিরন্ময় রায় এবং লালু ওরাওঁ-এর তৈরি বীরসা সেবা দল নকশালবাড়ী আন্দোলনে যুক্ত থাকার জন্য পুলিশের গুলির শিকার হয় । ১৯৭২ সালে শোষণের বিরুদ্ধে বিহারের ভিন্ন ভিন্ন জায়গায় শ্রমিক কৃষকরা আন্দোলন শুরু করে। এই সালে সি পি আই এবং কংগ্রেসকে বাদ দিয়ে অন্য সব দল মিলে 'ছোটনাগপুর সাঁওতাল পরগণা অলগ্ রাজ্য বিচার গোষ্ঠী' তৈরি করেন আন্দোলনকে জোরদার করতে। এদিকে বিনোদ মাহাতোর আদিবাসী সামাজিক সংস্থা 'শিবাজী সমাজ' এবং সুরেন্দ্র সরেনের 'সানাত সাঁওতাল সংঘ' ও এ.কে. রায়-এর 'জনবাদী সংগ্রাম সমিতি' একযোগে শ্রমিক কৃষকের সাথে এসময় ঐক্যবদ্ধ লড়াই শুরু করে। ১৯৭৩ সালের ৪ ফেব্রুয়ারি এরাই সম্মিলিতভাবে ঝাড়খণ্ড মুক্তি মোর্চার জন্ম দেয় একটি ঐতিহাসিক সংগ্রামের তাগিদে ।

'ছোটনাগপুর প্রজাসত্ত্ব আইন ১৯৬৯'-এর বিরুদ্ধে এই ঝাড়খণ্ড মুক্তিমোর্চা নতুন করে বিক্ষোভ সংগঠিত করে তোলে । জোতদারদের জবরদস্তি জমিদখল ও প্রকৃত কৃষককে উৎখাত করা, মহাজনদের চড়াসুদে দাদন দেওয়ার বিরুদ্ধে এবং উচ্ছেদিকৃত জমি ফিরিয়ে দেওয়ার দাবিতে মোর্চা দ্রুত আদিবাসীদের সংঘবদ্ধ করে । গ্রামে গ্রামে গ্রামীণ ব্যাংক তৈরি করা হয় । গবাদি পশুর প্রয়োজনেও ঐ ব্যবস্থা নেওয়া হয় । ফলত গ্রামে কৃষকরা মহাজনের কাছে না গিয়ে এই নিজস্ব ব্যাংক থেকে ঋণ নেওয়া শুরু করে। শিবু সোরেন, এ.কে. রায়, বিনোদ মাহাত এদের চলিষ্ণু নেতৃত্বে দ্রুত এই কল্যাণকর ব্যবস্থাগুলি গড়ে ওঠে । মদ্যপান বন্ধ করানো হয় । এবং এখানেই শুরু হয় 'অখিল আখারস' (গণ আদালত) । যদিও আন্দোলনটি ছিল খুবই উপযোগী তবু এটা ছিল মূলত কৃষিকেন্দ্রিক ।

পরবর্তী পর্যায়ে নতুন আন্দোলন শুরু হয় আদিবাসী এলাকায় শিল্পায়নের নামে আদিবাসীদের জমিহারা ও কর্মহারা করে তোলার বিরুদ্ধে। কয়লাখনি জাতীয়করণের পর সরকারী হিসাব অনুযায়ী ৩২ হাজার শ্রমিক তাঁদের কাজ হারায়। তাঁদের অধিকাংশই হলেন আদিবাসী এবং এটা তো শুধু বিহারের ধানবাদ জেলার ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধ। ১৯২১ সালে ফ্যাক্টরি এবং খনিগুলিতে ৯৫ শতাংশ স্থানীয় লোক নেওয়া হত । এখন সেখানে আদিবাসী শ্রমিক ১০ শতাংশরও কম । এভাবে ছোটনাগপুর অঞ্চলের শিল্পায়নের নামে ৬ লক্ষ আদিবাসীকে ভূমিহীন করা হয়, কিন্তু তাদের পাল্টা কোনও বাঁচবার ব্যবস্থা করে দেওয়া হয়নি। ঝাড়খণ্ড মুক্তিমোর্চা এটাকেও আন্দোলনের ইস্যু করে । ১৯৭৫ সালে সরকার বনসংরক্ষণের জন্য 'ফরেস্ট ডেভলপমেন্ট কর্পোরেশন' তৈরি করেন—এতে আদিবাসীরা তাঁদের জন্মগত অরণ্যের অধিকার হারান ।

দলের সভাপতি এন ই হোরো

১৯৭৬ সালে ধানবাদে মুক্তিমোর্চা এবং এ.কে. রায়ের বিহার কোলিয়ারী কামগার ইউনিয়ন ও কিষান সভার সংযুক্ত সমাবেশ হয় । এবং এতেই ঝাড়খণ্ডভূমে প্রথম সুচিন্তিত শ্লোগান ওঠে—'ঝাড়খণ্ড আউর লালখণ্ড এক হ্যায় ।' মার্কসবাদীদের সাথী হিসাবে ঝাড়খণ্ডীরা গ্রহণ করে।

সুবর্ণরেখা বাঁধ প্রকল্পে সরকার ৪৪ হাজার একর জমি অধিগ্রহণ করেন। ফলে ৯০টি গ্রামের ৩৭ হাজার লোকজন উৎখাত হয় । এদের জন্য বিকল্প কোন ফলপ্রসূ ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি । এই বাঁধকে কেন্দ্র করে ঝাড়খণ্ডের মাটিতে তাই শ্লোগান উঠেছে, 'জমিন দিবো না, টকো লিবো না, বাঁধ বনাতে দিবো না ।'

এই সব খনি ও বন এলাকা থেকে বিহার সরকার ৭৫ শতাংশ রাজস্ব আদায় করে থাকেন। সেখানে এ এলাকার জন্য নির্ধারিত সরকারী অর্থ যোজনা বরাদ্দের মাত্র ২৫ শতাংশ। প্রকৃতপক্ষে সে অর্থের মাত্র ১৬-১৭ শতাংশ ব্যয়িত হয় এখানকার উন্নয়নের জন্য। এই ভাবে নানান অর্থনৈতিক অসন্তোষ বাড়তে বাড়তে ঝাড়খণ্ড মুক্তিমোর্চার সংগ্রামকে উত্তরোত্তর শক্তিশালী করেছে। সর্বত্রই ছাপ এক রকমের। ভারতীয় সমাজ ব্যবস্থায় শোষণের কায়দা কি বিহার, কি পশ্চিমবঙ্গ, কি উড়িষ্যা বা কি মধ্যপ্রদেশ সর্বত্রই এক । আর সেই তীব্র শোষণের মোকাবিলা করতে আদিবাসীরা ঐক্যবদ্ধভাবে পথে নেমেছে ।

মার্কসবাদী এই ঝাড়খণ্ডীরা সি.পি. আই, সি.পি. এম প্রমুখের মার্কসীয় দৃষ্টিভঙ্গীর সঙ্গে একমত নয় । পুরুলিয়ার মাটিতে দাঁড়িয়ে এঁরা তাই খোলাখুলি বলেন—'মার্কসবাদের নামে যারা বাবুবাদ চর্চা করছে আমরা তাদের থেকে বিচ্ছিন্ন থাকতে চাই । কারণ লালঝাণ্ডা বইবার হক্‌দার আমরাই । অনেক রক্ত দিয়ে, অনেক সংগ্রামের মধ্যে দিয়ে আমরা তা প্রমাণ করছি ।'

ঝাড়খণ্ডীদের পেছনেও মিশনারি ?

মিশনারিরা শুধু গোর্খাল্যান্ড আন্দোলন নয়, ঝাড়খণ্ড আন্দোলনেও মদত দিচ্ছে। টাকা পয়সা যোগাচ্ছে। এ কথা বললেন সি পি এম রাজ্য সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য বিমান বসু । আপনারা তাহলে মিশনারিদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিচ্ছেন না কেন ? প্রশ্ন শেষ না হতেই বিমানবাবু বলেন, এই প্রশ্ন নিশ্চয়ই খ্রীষ্টান ডেমোক্রেটিক পার্টির অরুণ বিশ্বাসের বক্তব্য ? হ্যাঁ, বলতেই বিমানবাবু বলে ওঠেন, অরুণবাবু মিশনারিদের ব্যাপারে কোন খবরই রাখেন না । উনি তো কেবল ধর্মান্তরিত করার কাজেই যুক্ত । মিশনারিরা এইসব কাজকর্ম চালায় কৌশলে । টাকা পয়সা আসে কোন কোন বহুজাতিক সংস্থার মাধ্যমে । এইসব ধরার দায়িত্ব কেন্দ্রিয় সরকারের । রাজ্য সরকারের নয় ।

বিহার থেকে মূলতঃ ঝাড়খণ্ড আন্দোলনে উস্কানি চলছে । পশ্চিমবঙ্গেও ওদের কিছু লোকজন আছে । অনেক সময় মোটর সাইকেলে বিহার থেকে দল বেঁধে গোলমাল পাকাতে ওরা আসে । আমাদের কর্মীরা প্রতিরোধে সক্রিয় আছেন । ঝাড়খণ্ডীদের মোকাবিলা করতে গিয়ে বামফ্রন্টের আমলে সাতাশজন সি পি এম কর্মীর প্রাণ গেছে । ওই অন্যায় দাবির বিরুদ্ধে আমরা ক্রমাগত রাজনৈতিক প্রচার চালাচ্ছি । যার সুফলও পাওয়া যাচ্ছে । রায়পুরে আমাদের সাম্প্রতিক যুব সমাবেশ এই রাজনৈতিক প্রচারেরই অঙ্গ ।

মেদিনীপুর, বাঁকুড়া, পুরুলিয়াকে তথাকথিত ঝাড়খণ্ড রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করার দাবি সম্পূর্ণ যুক্তিহীন । প্রথমত, এই দাবি সম্পূর্ণভাবে বিচ্ছিন্নতাবাদী । দ্বিতীয়ত, ওই তিন জেলার প্রায় এক কোটি লোকসংখ্যার মধ্যে মাত্র এগার লক্ষ আদিবাসী । সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষ কেন আদিবাসী রাজ্যে যাবেন ? আসলে এই সব যুক্তিহীন দাবি তোলার একমাত্র উদ্দেশ্য হচ্ছে গোলমাল পাকানো। সেই উদ্দেশ্য পশ্চিমবঙ্গে সফল হবে না । আদিবাসীদের একটা বড় অংশও ওই দাবির পক্ষে নন ।

ছবি : কৃষ্ণমোহন শর্মা, পার্থসারথি

উইং কম্যান্ডার ভূপ : লক্ষ্যভেদের অর্জুন

অঞ্জলি চন্দ

উইং কম্যান্ডার ভূপ সেই ভয়ংকর লড়াইয়ের দিনগুলিকে এখনও পরিষ্কারভাবে মনে করতে পারেন। পেশাগত দক্ষতার তুঙ্গে উঠে যখন তাঁর ক্ষেপণাস্ত্রগুলি একের পর এক অব্যর্থভাবে শত্রুপক্ষের ব্যূহ ছিন্নভিন্ন করেছিল-সেই মুহূর্তগুলি এখনও তাঁর স্মৃতিতে অম্লান।

১৯৬৫ সালের আগস্টের মাঝামাঝি সময়। ভারতের আকাশে প্রতিকূলতার কাল মেঘ, সমস্ত সামরিক বৈমানিকদের ক্যাম্পে থাকার কড়া আদেশ জারি করা হয়েছে যাতে দরকার পড়লেই সঙ্গে সঙ্গে হাজির হতে পারেন।

৪ সেপ্টেম্বর। হিণ্ডন এয়ার বেসে হঠাৎ রাত ৯ টায় সাইরেনের পাগলা ঘন্টি উত্তাল হয়ে উঠল। লাউডস্পীকারে সমস্ত বৈমানিক ও অন্যান্য কর্মচারীদের অবিলম্বে হাজির হওয়ার নির্দেশ ভেসে এল। যুদ্ধ বিমান চালক ভূপিন্দর কুমার বিশনোই (ভূপ নামেই যিনি বেশি পরিচিত) ২০ নং স্কোয়াড্রনের দপ্তরে ছুটে গেলেন। প্রস্তুত হলেন আদেশ আসা মাত্র উড়ে যেতে। ঠিক তাই হল। আদেশ এল। স্কোয়াড্রন কমাণ্ডার চাইলেন চারটি যুদ্ধ বিমান সকালবেলায়ই উড়ে যাক উত্তরের এয়ার বেস 'হালওয়ারাতে'। এর দ্বারা ২৭ নং স্কোয়াড্রনকে সাহায্য করাও হবে। তিনি স্বেচ্ছাসেবকদের সাহায্য চাইলেন। নির্দ্ধিধায় প্রথম হাত তুললেন ভূপ। পরের দিন সকালে ভূপের নেতৃত্বে উড়ে চলল 'হান্টার' এর দল। হালওয়ারাতে দলটিকে আদেশ দেওয়া হল লাহোরের কাশুর অঞ্চলে টহলদারী করার। কাজ হল নির্দিষ্ট বাহিনীকে চিহ্নিত করা এবং অস্ত্রশস্ত্রবাহী ট্রেন ধ্বংস করা।

আবহাওয়া ছিল পরিষ্কার। চারপাশে নজর রাখতে কোনও অসুবিধা হচ্ছিল না। দলটি ঘন্টায় ১০০০ থেকে ১১০০ মাইল গতিবেগে খুব নিচু দিয়ে উড়ে যাচ্ছিল। পাকিস্তানী সীমানায় প্রবেশ করার পর থেকেই তাদের খুব সতর্কতার সঙ্গে এগোতে হচ্ছিল শত্রুপক্ষের তীক্ষ্ণ নজর এড়িয়ে। সন্ধ্যে নেমে এল। অবশেষে তাদের নজরে এল প্রতীক্ষিত লক্ষ্য বস্তু। রায়ইন্দ স্টেশনের কাছে দাঁড়িয়ে থাকা একটি ট্রেন। নিচু দিয়ে উড়ে প্রথমে তারা নিশ্চিত হয়ে নিলেন সেটি যাত্রীবাহী ট্রেন নয়। এবার শুরু হল আক্রমণের উদ্যোগ। ডানদিকে গেলেন বৈমানিক মেনন, ভূপ চললেন বাঁদিকে, নাগি এবং খুল্লার ছিলেন মাঝের সারিতে। ভূপ তাঁর মারণাস্ত্র তাক করে নিলেন। খুব তাড়াতাড়ি লক্ষ্যবস্তুর তিন থেকে চার কিলোমিটারের মধ্যে বিমানটিকে নিয়ে এলেন তিনি। টেলিস্কোপে একটি বিন্দুর মতো অবস্থা থেকে আস্তে আস্তে ট্রেনের ছবিটি পুরো টেলিস্কোপের লেন্স জুড়ে ফেলল।

মারাত্মক রকমের বিধ্বংসী টি-১০ রকেট ব্যবহার করার আগেই ভূপ দেখলেন মাটি থেকে শত্রুপক্ষের প্রত্যাঘাত শুরু হয়ে গেছে। তিনি বুঝলেন নিচের স্টেশন থেকে অ্যান্টি-এয়ারক্রাফট গান চালু হয়ে গেছে। কিছুক্ষণের মধ্যেই পুরো এলাকাটি বোমা, আর ধোঁয়ার সম্মিলিত প্রভাবে অন্ধকার হয়ে গেল। হতোদ্যম না হয়ে তাঁরা লড়াই চালিয়ে গেলেন। মেনন, নাগি, খুল্লার ক্ষেপণাস্ত্র নিক্ষেপ করেই চললেন। ভূপ দেখলেন ওয়াগনগুলি রেললাইন থেকে লাফিয়ে উঠেই বিস্ফোরণে নিশ্চিহ্ন হয়ে যাচ্ছে।

আক্রমণভাগে তিনিই ছিলেন শেষ ব্যক্তি। সুতরাং মাটিতে বসান বিমানবিধ্বংসী কামানগুলির সম্মিলিত লক্ষ্য হয়ে দাঁড়ালেন তিনি। নির্দ্ধিধায় তিনি ক্ষেপনাস্ত্রের সুইচ টিপে দিলেন। বিমানের সামনে থেকে উৎক্ষিপ্ত সেই বিকট গর্জনে তাঁর কানে তালা ধরে যেতে লাগল। কয়েক মুহূর্ত স্থানুবৎ থেকে লক্ষ্যভেদ হয়েছে কিনা এ বিষয়ে নিশ্চিত হতে চাইলেন তিনি। তাঁর লক্ষ্য ছিল অব্যর্থ। তিনি দেখলেন ট্রেনটির ডানদিকের অবশিষ্ট অর্ধেক অংশ বিস্ফোরণের কবলে পড়ে ভেঙে গেল। বজ্রের মতো শব্দ হল। শব্দের প্রচণ্ডতায় ভূপের বিমান কেঁপে উঠল। আক্রমণস্থল থেকে বিমানকে তিনি ওপরে উঠিয়ে আনলেন এবার। নিচে তাকিয়ে দেখলেন শুধু জ্বলন্ত ট্রেনটি পড়ে আছে।

অন্যদের সঙ্গে মিলিত হয়ে এবার তিনি রেললাইনের নিশানা বরাবর কাশুরের দিকে এগিয়ে গেলেন। রাস্তার মধ্যেই তাঁরা দূরে এক জায়গায় যেন ধোঁয়ার এক মেঘপুঞ্জ দেখতে পেলেন। লক্ষ্য করে দেখলেন সেটি পাক বাহিনীর একটি সামরিকযান ও প্যাটন ট্যাংকের বাহিনী। যেহেতু পাইলটদের কাছে বেশ কিছু রকেট ছিল, তাই আক্রমণের সিদ্ধান্ত নেওয়া হল। ডাইভ দেওয়ার আগে ভূপ তার লক্ষ্য হিসাবে দুটো ট্যাঙককে ঠিক করে ফেললেন। দেখে মনে হচ্ছিল ট্যাঙকের চালকেরা খুবই সতর্ক। সম্ভাব্য আঘাত থেকে বাঁচবার জন্য যথেষ্ট দক্ষতার সঙ্গে ট্যাঙক-দুটি নিজেদের আড়াল করে রাখছিল। রকেটের নিশানার মধ্যে দুটো ট্যাঙককেই রাখার জন্যে দরকার ছিল অসাধারণ দক্ষতার। আজ, এই নিরুদ্বিগ্ন প্রশান্তির মধ্যে তিনি খুব স্পষ্ট ভাবেই স্মরণ করতে পারেন, সেদিন সেই বিপজ্জনক মৃত্যুর মুখোমুখি পাঞ্জা কষতে কষতে যখন তাঁর রকেট লক্ষ্যবস্তু ভেদ করল তখন পেশাদারী সৈনিকের সেই চরমতম আনন্দই তিনি পেয়েছিলেন। শত্রুপক্ষের জীবন্ত, প্রাণবন্ত, মানুষজন ভরা ট্যাঙকগুলি হঠাৎ শ্মশানের নিস্তব্দতায় নিথর হয়ে গেল।

রাত গভীরতর হল। এবার ফেরার পালা। ঘাঁটিতে পৌঁছে ভূপ যখন বিমান থেকে নামলেন, দেখলেন এক বিরাট জনতা অবাক বিস্ময় নিয়ে তাঁর দিকে তাকিয়ে আছে। যেন তাঁরা ভৌতিক কিছু দেখছেন। কর্কপিট থেকে নেমে এসে তিনি নিজেই আশ্চর্য হয়ে গেলেন। তাঁর গোটা বিমানটি গোলার আঘাতে যেন ঝাঁঝরা হয়ে গেছে। পড়ন্ত বেলার আলো-আঁধারিতে তিনি খুঁটিয়ে দেখে বিমানের ডানায় এবং ইঞ্জিনের হাওয়া ঢোকার জায়গায় মোট ৩৬ টি গর্ত আবিষ্কার করলেন।

এই আক্রমণের ফলাফলের গুরুত্ব কি ধরনের ছিল, তা বোঝা গেল তার পরের দিন। পাক বাহিনীর ঐ ট্রেনটি বোঝাই ছিল জ্বালানী এবং সমরাস্ত্রে। চালান যাচ্ছিল পাঞ্জাব সেক্টরে ভারতীয় বাহিনীর উপর ট্যাঙক আক্রমণের রসদ হিসাবে। এই মূল্যবান রসদ থেকে বঞ্চিত হয়ে পাকিস্তানীরা খেমকরনের বিখ্যাত ট্যাঙক যুদ্ধে হাস্যকরভাবে পর্যুদস্ত হয়। এরপর এই যুদ্ধ চলাকালীন ভূপ নানা সময়ে অন্তত ১৪ বার বিমান হানা দিয়েছেন। প্রথমবারের সেই অসাধারণ সাফল্যের কারণে দলের বাকি দুজন বৈমানিকের সঙ্গে তাঁকে বীরচক্র উপাধিতে ভূষিত করা হয়।

পরের সাত বছর নিরবচ্ছিন্ন শান্তিতে কাটল। তারপর পূর্ব পাকিস্তানে নামল অশান্তির ঝড়। অবিরাম শরণার্থীর দল হু হু করে ভারতে প্রবেশ

করতে থাকল। উইং কম্যাণ্ডার ভূপ তখন ইস্টার্ন সেকটরের তেজপুরে মিগ-২১, সুপারসোনিক বিমানের ২৮ নং স্কোয়াড্রনের নেতৃত্ব দিচ্ছেন।

১৯৭১ সালের ৩ সেপ্টেম্বর। ঐ দিন বিকেলে খবর এল পূর্ব পরিকল্পনা অনুযায়ী পাকিস্তানী এয়ার ফোর্স পাঞ্জাব-হরিয়ানা সেক্টরে ভারতীয় বিমানবাহিনীর ঘাঁটিতে আক্রমণ চালাবে। ভূপের উপর আদেশ হল খুব তাড়াতাড়ি সামনের অপারেশন বেসে তার বাহিনীকে এগিয়ে নিয়ে যেতে। মাঝরাতে গুপ্ত অপারেশন কক্ষে পরের দিন সকালের আক্রমণের বিস্তারিত পরিকল্পনা তৈরি করা হল। গোটা বিমানক্ষেত্রটি তখন ছিল ঘন কুয়াশায় আচ্ছন্ন। পরের দিন দুপুর পর্যন্ত কুয়াশা সরে যাবে বলে মনে হচ্ছিল না।

সেপ্টেম্বর মাসের চার তারিখে শিলং-এর হাইকম্যাণ্ড ভূপের বাহিনীকে ঢাকা বিমান ক্ষেত্রে আক্রমণের আদেশ দেন। ভারতীয় বিমানবাহিনীর চার বৈমানিক যখন, রাত থাকতেই সেই স্কোয়াড্রনে পৌঁছলেন তখন দৃষ্টি ৫০০ মিটারের বেশী যাচ্ছিল না। খুব ভোরে আক্রমণ চালাবার আশা ক্রমে দুরাশায় পরিণত হচ্ছিল। কিন্তু তবুও বেস কম্যাণ্ডার এই অভিযানের উপর খুবই গুরুত্ব আরোপ করেছিলেন। নিজস্ব যোগ্যতা প্রমাণের পক্ষে যে কোন ফাইটার পাইলটের পক্ষে দিনটি ছিল আদর্শ। ভূপের নেতৃত্বে তাঁর চার সঙ্গী যখন বিমানে উঠে 'টাইগার ফর্মেশন'-এ এগোতে থাকলেন, তখনও রাতের অন্ধকার পুরো কাটে নি। তাঁদের বিমানে অস্ত্রশস্ত্রের মধ্যে ৩২ টি ৫৭ মি.মি. রকেট এবং ফ্রন্ট-গান শেল মজুত ছিল। তাদের প্রতিরক্ষার জন্যে আরও দুটি ফাইটার সেক্টর ক্ষেপণাস্ত্র বহন করে নিয়ে যাচ্ছিল। গ্রাউণ্ড ক্রুদের দুঃশ্চিন্তা যেন কিছুতেই কাটছিল না। বারবার তারা বিমানগুলির নিরাপত্তার জন্য প্রতিটি খুঁটিনাটি পরীক্ষা চালাচ্ছিলেন। এই পাইলটদের অক্ষত রাখবার জন্যে সর্বক্ষেত্রেই চলছিল বিরামহীন প্রস্তুতি।

কুয়াশার স্তর তখন এত ঘন ছিল যে, তারা রানওয়ের শেষ ভাগটাও দেখতে পাচ্ছিলেন না। শুধু মাত্র মানসিক শক্তি, দুরন্ত সাহস, আর নিবিড় অনুশীলনকে সম্বল করে তাঁরা ঢাকার পথে এগিয়ে চললেন। দূরত্ব মাত্র ৩০০ কিলোমিটার।

শত্রুপক্ষের রাডারের নাগালের বাইরে থাকার জন্য তাঁরা খুবই নিচু দিয়ে উড়ে যাচ্ছিলেন। এমন কি বেতার ব্যবস্থাকেও থামিয়ে রেখেছিলেন তাঁরা। তেজপুর থেকে মাত্র কুড়ি মিনিটে ঢাকা পৌঁছে গেলেন ফাইটার পাইলটেরা। গোটা বিমানক্ষেত্রটি তখন ঘন কুয়াশার আস্তরণে মোড়া। ঢাকার মানুষজনের পক্ষে সেদিনটা ছিল বিস্ময়ের। চারপাশের কলকারখানা ধূম উদ্‌গীরণ করছে। জীবনযাত্রা পুরোপুরি নিরুত্তাপ। এরই মধ্যে বৈমানিকেরা আঘাত হানার জন্যে প্রস্তুত হলেন। প্রত্যেকের জন্যে লক্ষ্যবস্তু ভাগ করে দিলেন ভূপ। তিনি দেখলেন দুটি জেট নীচের রানওয়ে দিয়ে ওড়ার জন্য প্রস্তুত হচ্ছে। 'মিশনের নেতাকে ডেকে বল্লেন, দ্যাখো শত্রুরা নিচে তোমাদের সঙ্গে লড়াইয়ের অপেক্ষায়। পরিষ্কার তেজি গলায় উত্তর ভেসে এল, "রজার, স্যার, কন্‌ট্যাক্ট।"

দখলে আসার পর ঢাকা বিমানবন্দরে চার ভারতীয় বৈমানিক।

আক্রমণ শুরু হল। ৪০ মি.মি. ভারি ক্যালিব্যরের শেল ফাটতে লাগল মুহুর্মুহু। মাঝে মাঝে ভূপ কানের পাশ দিয়ে চলে যাওয়া আগুনের ঝলক টের পেতে লাগলেন। জেট দুটি এবং তার আচ্ছাদনের উপর আক্রমণ চলতেই থাকল। শুরু হল রকেট দিয়ে আক্রমণ। ঢাকা বিমান—ক্ষেত্র দারুণভাবে সুরক্ষিত। মোটামুটি দুর্ভেদ্য। কিন্তু মিগ বাহিনী অক্ষত অবস্থায়ই উড়ে চলল। পিছনে পড়ে রইল শুধু একরাশ ধোঁয়া। আর ধ্বংসাবশেষ।

সেপ্টেম্বর ৪ এবং ৫, ঢাকা বিমানক্ষেত্রে ভূপের নেতৃত্বে আক্রমণের ঝড় বয়ে গেল। ৬ সেপ্টেম্বর ঢাকা বিমানক্ষেত্র কাজের পক্ষে অযোগ্য বলে ঘোষণা করা হল। স্থিরনিশ্চিত হবার জন্যে স্কোয়াড্রন ৫৭ মি.মি. রকেট না চালিয়ে বোমাবর্ষণের পদ্ধতি গ্রহণ করল। প্রতিটি বিমান ১০০০ পাউণ্ডের দুটি করে বোমা বহন করছিল। অভিযানটি খুবই কষ্টকর ছিল কারণ নিপুণ মুন্সীয়ানার সঙ্গে বোমাবর্ষণের জন্যে প্রথমে খুবই উঁচুতে উঠে যাওয়াটা ছিল একান্ত জরুরী। ফলতঃ তাদের দীর্ঘ সময় ধরে থাকতে হবে বিমান বিধ্বংসী কামানের পাল্লায়।

প্রথম দুটি অভিযানের নেতৃত্ব দেন ভূপ স্বয়ং। প্রথমটি রাত ৩.৩০, মিনিটে, দ্বিতীয়টি বেলা এগারটায়। ঢাকা বিমানক্ষেত্রকে পুরো ধ্বংস করে দেবার জন্যে বৈমানিকেরা সেদিন ছিলেন দৃঢ় প্রতিজ্ঞ।

ভারতীয় বিমানবাহিনী যখন তাদের আক্রমণের তুঙ্গে, বিমানক্ষেত্রকে ঘিরে রাখা সমস্ত পাকিস্তানী বিমান-ধ্বংসী কামানগুলি একসঙ্গে চালু হয়ে গেল। আকাশ আচ্ছন্ন হয়ে গেল বোমার টুকরো আর কালো ধোঁয়ায়। গোটা রানওয়েটি ভাগ করে দখলে নিয়ে নিলেন আক্রমণকারী চার বৈমানিক। একেবারে আড়াআড়ি ভাবে আকাশের বুক চিরে নামল ভূপের বিমান। লক্ষ্যবস্তুর দিকে শ্যেনদৃষ্টি রেখে বোমা ফেললেন তিনি। বোমাটি ফাটল রানওয়ের একেবারে মাঝখানে। ধ্বংসের পরিমাণ হ'ল বিপুল রকমের। চারটি বিমান থেকে নিক্ষিপ্ত আটটি বোমার মধ্যে সাতটি বোমা অব্যর্থভাবে লক্ষ্যভেদ করল। এ যেন অর্জুনের লক্ষ্যভেদ। একেবারে অক্ষত অবস্থায়ই গর্বিত মিগ গুলো ফিরে এল তাদের ঘাঁটিতে।

এই সময়েরই এক বোমাবর্ষণ অভিযানে ভূপ তাঁর ব্যক্তিগত ৩৫ মি.মি. ভয়েগল্যাণ্ডার ক্যামেরা দিয়ে ছবি তুলতে চাইলেন। বোমাটি ছুড়ে প্রায় চার কিলোমিটার উচ্চতায় নিয়ে গেলেন তার বিমানকে। বাঁ হাতে বিমান চালিয়ে, ডানহাত দিয়ে রানওয়ের ওপর ক্যামেরা ফোকাস করলেন। বোমাটি তখন বিশাল এক কালো ছাতার মত ধোঁয়া সৃষ্টি করে ফাটছিল। তিনি ক্যামেরার সাটার টিপলেন। পর পর অনেকগুলি ছবি তুললেন। পরে পাওয়া খবরের সুত্রানুযায়ী মিগ আক্রমণের সাফল্য সম্পর্কে গুপ্তচর বিভাগ এতই নিশ্চিত ছিলেন যে, যখনই খবর আসছিল ঢাকার বিমানক্ষেত্রে সারান হচ্ছে, তখনই হানা দেওয়া হচ্ছিলপূর্ণোদ্যমে। এমন কি যে ধরনের আক্রমণের কথা আগে ভাবা হয়নি সেই সব পরীক্ষামূলক আক্রমণেও এই বাহিনী পিছপা হচ্ছিলেন না।

তারপর এল সেই মহান সন্ধিক্ষণ। ভূপ নেতৃত্ব দিলেন ঐতিহাসিক 'ঢাকা গর্ভনমেন্ট হাউস' আক্রমণের। উদ্দেশ্য ছিল পাকিস্তানী বাহিনীর মনোবল ভীষণভাবে ভেঙে দেওয়া।

যখন প্রথম বোমাটি পড়ল, তখন পূর্ব পাকিস্তানের তৎকালীন গভর্নর মালিক বাড়ি থেকে বেরিয়ে এসে কাছাকাছি ট্রেঞ্চে আশ্রয় নিলেন। সেদিনই তিনি পদত্যাগপত্র দাখিল করে হিলটন হোটেলের নিরাপদ আশ্রয়ে চলে গেলেন। পাকিস্তানের শোচনীয় পরাজয় এবং নতুন দেশ হিসাবে বাংলাদেশের উত্থানের মূলে যেসব ঘটনাবলী প্রত্যক্ষ ভাবে সাহায্য করেছে, তার মধ্যে অন্যতম ছিল এই আক্রমণগুলি। ভূপ যার নেতৃত্ব দেন মোট ১৯ বার।

ভারতীয় বিমানবাহিনীর উজ্জ্বল জ্যোতিষ্ক ভূপিন্দর কুমারবিশনোই-এর ভারতীয় বিমান বাহিনীতে যোগদানের ব্যাপারটা পুরোপুরি কাকতালীয়। ১৯৫১ সালে তিনি দিল্লি বিশ্ববিদ্যালয়ে বি.এস. সি, পড়তেন। একজন বিমানবাহিনীর কর্তা সেসময় বিশ্ববিদ্যালয়ে বিমানবাহিনীতে যোগদানেচ্ছু যুবকদের মধ্যে আবেদন-পত্র বিলি করতে এসেছিলেন। ভূপের তখন বয়স মাত্র ১৭ বছর। কিন্তু তিনি একটি আবেদন পত্র নিয়ে ভর্তি করে তা পাঠিয়েও দিলেন। লিখিত পরীক্ষায় পাশ করে গেলেন। ইন্টারভিউ হল দেরাদুনে। নির্বাচিত হয়ে যোধপুর এয়ার ফোর্স এ্যাকাডেমীতে ফ্লাইট ক্যাডেট হিসেবে যোগ দিলেন তিনি। ঐ দলের তিনিই ছিলেন কনিষ্ঠতম ব্যক্তি। বোমারু বিমানের কাজ ছাড়া ভূপ অন্য ধরনের কাজে সন্তুষ্ট হতে পারতেন না। তিনি এয়ার এগর্জামিনেশান শাখার পরীক্ষক নিযুক্ত হন। কিন্তু যুদ্ধবিমান চালানোর আকুতি তাকে তাড়া করে ফিরছিল সর্বক্ষণ। ১৯৫৫ সালে পালাম থেকে হিণ্ডনে সরে যাওয়া ২ নং স্কোয়াড্রনে তিনি প্রবেশ করতে সক্ষম হলেন। সেখানেই কাটে শিক্ষানবিশীর দিনগুলি। তিনি তাঁর শিক্ষক 'স্কোয়াড্রন কম্যাণ্ডার,' এ. এল বাজাজকে সব খুলে বলেন। ফাইটার পাইলট হবার জন্য তার নামটি দাখিল করার জন্য বিশেষভাবে অনুরোধ করেন। প্রথমেই তিনি দায়িত্ব পান দুধর্ষ 'হান্টার' বিমানের। এরপর আর তাঁকে পিছন ফিরে তাকাতে হয়নি ◐

নখের উপরের উজ্জ্বলতা দিল মোরে রূপ ঝলমল, অন্তর মম খুশি-উচ্ছল সদ্যফোটা শতদল!"
ল্যাকমে নেল কালার। এ হল সবচেয়ে বেশী বিক্রীর নেল কালার —
যার সম্ভারে আছে সবচেয়ে বেশী রকমের রঙ ! পার্ল আর মেটালিক
ফিনিশের সবচেয়ে কেতাদুরস্ত হালফ্যাশানের রঙ এনেছে — সবার আগে !
ল্যাক্‌মে-তে যদি আপনার মনের মত রঙ না পান, জানবেন,
আর কোথাও পাবেন না !
রূপ ঝলমল, অন্তর খুশি-উচ্ছল করতে Lakmé
Lakmé
NAIL PEARL
Lakmé
NAIL PEARL

রাজস্থানী চিত্রকলার ঐতিহ্যপুরুষ হিসামুদ্দিন উসতা

রাজস্থানের কর্মচঞ্চল শহর, শিল্পাঞ্চল, রাস্তা-ঘাট, ও আঁকা-বাঁকা সরু গলির ভীড়ে বিকানীরের উসতা স্ট্রীট কখনো হারিয়ে যাবার নয়। অজন্তা, ইলোরা, খাজুরাহের ভাস্কর্য যেমন শৈল্পিক সুষমায় অমর, অক্ষয় হয়ে আছে, তেমনিভাবে উসতাদের বংশ-পরম্পরায় রাজস্থানী ঘরাণার ফ্রেসকো, মিনিয়েচার ও উটের চামড়ায় সোনা-জলের সুক্ষ্মশিল্পকার্য এবং তার ঐতিহ্য রক্ষার সংগ্রামের জন্য ইতিহাসে চিহ্নিত থাকবে এই উসতা স্ট্রীট।

বিকানীরের এই উসতা স্ট্রীট উস্তাদের বংশানুক্রমিক শিল্পীসত্তার পরিচয় বহন করে। এখানের একটি ছোট্টবাড়িতে শেষ বংশধর হিসাবে ফ্রেসকো শিল্পের নিরলস সাধনারত শিল্পী হিসামুদ্দিন উসতা। যাঁর ঐতিহাসিক ও অবিস্মরণীয় অবদান 'বিকানীর (কিষেণ গড়) স্কুল অফ্ পেন্টিং'। গত এক শতাব্দীর নিরন্তর প্রয়াসে যেটিকে গড়ে তুলেছেন উসতা-গোষ্ঠীর বংশধরেরা। যার খ্যাতি বর্তমানে ছড়িয়েছে দেশ ছেড়ে বিদেশেও।

হিসামুদ্দিন উসতা। ৭২ বছরের বৃদ্ধ অথচ 'চিরনবীণ' শিল্পী। ১৯৬৬ সালে রাষ্ট্রপতি পুরস্কারে সম্মাণিত, এ বছরেরও তাঁকে দেওয়া হয়েছে 'পদ্মশ্রী' পুরস্কার। তবু মনে হয় শিল্পীর প্রতিভাকে যোগ্য মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করা হয়নি। দীর্ঘদিনের কঠোর অধ্যবসায় ও শৈল্পিক প্রতিভায় যিনি রাজস্থানের প্রাচীন শিল্প-ঐতিহ্যের একনিষ্ঠ ধারক, আজ তিনি সব হারানোর ভয়ে ভীত। কারণ তাঁর মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে শেষ হয়ে যাবে পূর্ব পুরুষদের অপরিসীম যত্নে সুরক্ষিত এই গৌরবময় ফ্রেসকো, মিনিয়েচার, উটের চামড়ায় সোনা-জলের শিল্পের এক সুবর্ণযুগ।

শিল্পী হিসামুদ্দিন–ঐতিহ্যময় ভারতীয় রাজস্থানী ঘরাণার শিল্পকলার এক প্রাণপুরুষ। রাজ্যের ও জাতীয় সংগ্রহশালায় রক্ষিত হিসামুদ্দিন ও তাঁর উত্তরসূরীদের তৈরি ফ্রেসকো-'ঝরোখা' 'মানোতি', 'সুষমাবরদারি', 'তাবাবন্দি', মিনিয়েচার, শিল্পপ্রেমিকদের কাছে এক নতুন দিগন্তের দ্বার খুলে দেয়। বিকানীরের তিনটি প্রসিদ্ধ মিউজিয়াম ছাড়াও সুপ্রসিদ্ধ আর্কিটেকট হারম্যান গোয়েজৎ ও ঐতিহাসিক কে.এম. পানিক্করের সঙ্গেও বিশেষভাবে যুক্ত শিল্পী হিসামুদ্দিন।

ফিরে তাকানো যাক মুঘল রাজত্ব কিংবা তার অব্যবহিত সময়ে। সে সময় দেশীয় রাজা-মহারাজারা সঙ্গীত ও নৃত্যশিল্পের পাশাপাশি কদর করতেন শিল্প

ও কারিগরদের। শিল্পীর নিজস্ব সত্তাকে বোঝার জন্য অনেকটা সময় তাদের সঙ্গে কাটাতেন। শুধু 'নজরানা' নয়, গলার হীরকখচিত রত্নহার দিয়েও শিল্পীর প্রতিভাকে উৎসাহ ও অনুপ্রেরণা দিতেন। আজকের দিনে স্টেট ডাইরেকটরেট পরিচালিত 'ক্যামেল হাইড সেন্টার'-এ হিসামুদ্দিনের আট জন প্রিয় ছাত্রের প্রায় প্রত্যেকেই
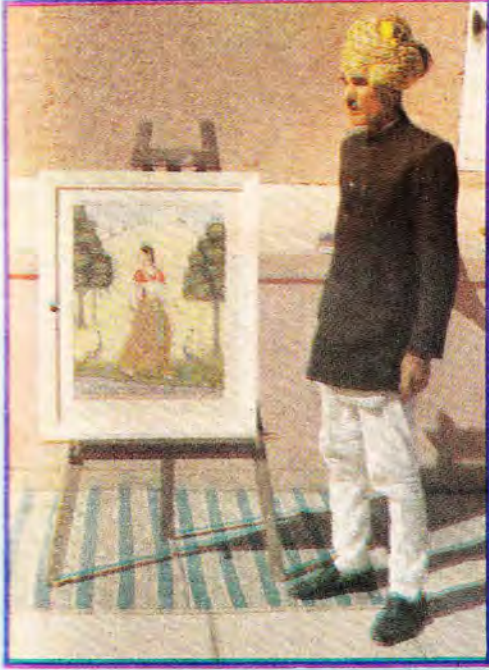
তাদের নিজ নিজ প্রতিভার পরিচয় দিয়েও উপেক্ষিত এবং বঞ্চিত। অর্থ সংকুলানের অভাবে অকালে ঝরে যাচ্ছে সদ্য কুসুমিত এই কচি প্রতিভাগুলি।

মুঘলসম্রাট আকবরের আমলে সভাসদদের আসন অলংকৃত করতেন 'বিকানীর শৈলীর' শিল্পী আলি রাজা। তাঁর প্রতিভার কদর বুঝে সেখান থেকে নিজের দরবারে নিয়ে আসেন তৎকালীন মহারাজা রাই সিং। তিনি শিল্পী আলিকে দিলেন প্রচুর জমি-জায়গির। এই আলিরাজা-ই মধ্যযুগীয় 'রসিকপ্রিয়া শৈলী'-র নতুন রূপের সৃষ্টি করেন। মহারাজা রাই সিং শিল্পী প্রতিভাকে সম্মাণ জানান 'উস্তাদ' আখ্যা দিয়ে। তখনকার দিনে কেবলমাত্র নৃত্যশিল্পী ও সঙ্গীতশিল্পী ছাড়া এই উপাধি অন্য কারো কপালে জুটত না। ধীরে ধীরে উস্তা গোষ্ঠীর তুলির টানে সুরম্য রাজপ্রাসাদ, হাভেলি, মন্দিরগুলির প্রাচীর-গাত্র হয়ে ওঠে অরূপরতন। ইতিহাসের পাতা ওলটালে দেখা যাবে ১৮৮৬ সালে ইংলন্ডে এক প্রদর্শনীর আয়োজন হয়। সেখানে কাদির বকস উসতা তাঁর সূক্ষ্ম কাজের এক উল্লেখযোগ্য নিদর্শন রাখেন। কুড়িয়ে নেন সমবেত দর্শকমণ্ডলীর ভূয়সী প্রশংসা।

শিল্পী হিসামুদ্দিন উসতা বরাবরই প্রচারবিমুখ। মাত্র পনের বছর বয়সে শিল্পী হিসামুদ্দিনের শিল্প সাধনায় প্রবেশ। ১৯২৯ সাল। রাজা গঙ্গা সিং-এর রাজত্ব। তখন থেকেই শিল্পীর ধীরে ধীরে উত্তরণ।

স্মৃতির অতলান্তে গিয়ে হিসামুদ্দিন কুড়িয়ে আনেন সেসব দিনের কথা। অতীতের স্মৃতিচারণে তিনি বলেন: একবারের এক ঘটনার কথা আমার এখনো পরিষ্কার মনে আছে। ডিসেম্বর মাস। চারিদিকে জাঁকিয়ে শীত পড়েছে। মহারাজা সাধু সিং আমায় ডেকে পাঠালেন এক পেন্টিং-এর জন্য। হাড় কাঁপানো শীতের মধ্যেও কাজ করতে রাজী হলাম। কারণ আমার কাছে শিল্পীর চেয়েও শিল্প অনেক বড়। কাজ চলতে লাগল। হঠাৎ একদিন যাত্রাপথে মহারাজা সেখানে উপস্থিত হলেন। আমাকে কাজ করতে দেখে বিস্ময় প্রকাশ করে বললেন, 'আরে, এ তো ঠাণ্ডায় এক্ষুণি মারা পড়বে।' টেনে নিলেন বুকে। দশ হাজার টাকা মূল্যের 'নামদা' দিয়ে শিল্পীর কদর করলেন। শুধু উপহারের জন্য নয়, তখন রাজা-মহারাজারা যে গুণীর কদর কতটা উপলব্ধি করতেন-এ তারই এক সামান্য নমুনা।'

'আমাদেরও তখন গ্যাজুয়েট রাজপুত তহশীলদারের মত মাসিক পঞ্চাশ টাকা মাসোহারা দেওয়া হতো। বিবাহ-উৎসবে রাজবাড়ি থেকে আসত প্রচুর উপহার সামগ্রী। আমাদের মধ্যে কারোর সন্তান হওয়ার খবর পেলে তৎক্ষণাৎ 'নজরানা' পাঠিয়ে দিতেন। রাজপরিবারের অকৃপণ পৃষ্ঠপোষকতায় আমরা সমাজে অনেক উঁচু স্থান পেতাম। রাজা, পারিষদবর্গের মাঝে বলতেন: শিল্পীমাত্রেই আবেগ ও কোমল অনুভূতি প্রবণ, তাই এদের সঙ্গে যোগ্য ব্যবহার করা উচিত।'

'আমরা শিল্পকে পূজো করি। প্রতিভাকে কমার্শিয়াল ভাবে ব্যবহার করতে শিখিনি। অর্থ যত বড়ই হোক, তা কখনো প্রতিভা সৃষ্টি করতে পারে না। বরং অর্থ, খ্যাতি, যশ শিল্পীর একান্ত অনুগত দাস। আজকের দিনে অবশ্য হুসেইন ও তার অনুগামীরা সে আদর্শ থেকে সরে এসে নিজেদের বিকিয়ে দিয়েছেন।'

মিনিয়েচার, ফ্রেসকোয় সাধারণ পাথুরে রঙ ব্যবহার করা হয়, যা কিনা পাঁচ-ছ'মাসের বিভিন্ন প্রণালীতে তৈরি। কাঁচ বা কাঠের উপর কাজ, কিংবা পৌরাণিক কাহিনী সম্বলিত দেওয়ালচিত্র–প্রায় সবক্ষেত্রেই এই রঙের ব্যবহার। অনেকটা মুক্তোবিন্দুর মত 'মানোতি', আকাশের উজ্বল তারার মত দেখতে 'তারাবন্দি', সোনাগলানো রঙের 'সুনেইরি'–মানে উন্নত টেকনিকে প্রথমসারির। 'সুষমাবরদারি' পেন্টের তো তুলনাই নেই।

৪,০০০-৫,০০০ 'ঝরোখা' পেন্টিং করেছেন শিল্পী হিসামুদ্দিন উসতা। যেখানে অনেকের এক-একটা 'ঝরোখা' তৈরি করতেই লেগে যায় দু' থেকে তিন মাস। একটানা সকাল-সন্ধ্যে শিল্পীকে ব্রাশ ও রঙ তুলি নিয়ে ডুবে থাকতে হয় নিজস্ব জগতে। বর্তমানে একটি ঝরোখা পেন্টিং-এর দাম নিদেনপক্ষে দশ হাজার টাকা। কারণ, এই পেন্টিং তৈরির মূল উপদান সোনাগলানো রঙ-যার দামই চার থেকে পাঁচ হাজার টাকা। সেদিক থেকে বিচার করলে 'বিকানীর স্কুল অফ পেন্টিং'-এর অবদান অপরিসীম। প্রতিটি চিত্রের চোখ-নাক সূক্ষ্ম ব্রাশের টানে জীবন্ত করে তোলে এখানে শিল্পীরা। 'মীনে'-র কাজও তাদের অনন্যসাধারণ প্রতিভার নজির।

বার্ধক্যের বোঝাকে উপেক্ষা করেও কাজ করে চলেছেন শিল্পী হিসামুদ্দিন। যৌবনের শুরুতে যেভাবে তাজা মনে কাজ করতেন, এখনও তারকোন খামতি নেই। ব্রাশ আর রঙ-তুলিতে এখনো অপরাজিত এই 'সব্যসাচী'। দিনের পর দিন ক্রমশ: উন্নত থেকে উন্নততর কাজ করে মহাকালের বুকে নিজের আসনটি পাকা করে ফেলেছেন।

শিল্পীর একান্ত সঙ্গী-ব্রাশ তৈরি করা হয় কাঠবেড়ালী বা গরুর লেজের অগ্রভাগের মসৃণ লোম দিয়ে। যাতে শিল্পীর প্রতি সূক্ষ্ম টানের মধ্যে কর্কশভাব ফুটে না ওঠে।

প্রাচীন এই ফ্রেসকো শিল্প-ঘরানা প্রসঙ্গে শিল্পীর বক্তব্য: 'আধুনিক কালে এই ঘরানার প্রথম ফ্রেসকো তৈরি হয় ১৯২০ সালে। বলতে পারেন এর স্রষ্টা আমিই। বিকানীরের গজলমহলকে প্রথম ফ্রেসকো দিয়ে সাজাই। তারপর থেকে রাজস্থানের সম্ভ্রান্ত ধনী সম্প্রদায়, মাড়োয়ারী, সবার হাভেলীতেই পাকা আসন করে নিয়েছে এই ফ্রেসকো।'

'পঞ্চদশ শতকের কোন এক সময় এই ফ্রেসকো শিল্পের হঠাৎ-ই অবলুপ্তি ঘটে। অনেক পরে আমাদের পূর্বপুরুষেরা অক্লান্ত পরিশ্রমে তার পুনরুজ্জীবন ঘটান। অসওয়ালের মন্দিরে যে গনেশ পেন্টিং আছে, সেটি আমার বাবার হাতের তৈরি।'

১৯৭৫ সালে ক্যামেল হাইড ট্রেনিং সেন্টার-এর জন্ম হলে তারা মাত্র মাসিক ১,০০০ টাকা মাসোহারার বিনিময়ে শিল্পী হিসামুদ্দিন কে নিয়ে আসেন। যেখানে এর বেশী টাকা রোজগার করে একজন কেরানী, তার চাকরীর শুরুতেই সেখানে হিসামুদ্দিনের মতো পারণত শিল্পীর জন্য মাত্র ১,০০০ টাকা! ভাবতেও অবাক লাগে। আমরা ভুলে যাই শিল্পের জন্যই শিল্পীর জন্ম হলেও তারা তো আর পাঁচজন সাধারণ মানুষের মতই বাঁচতে চান। জীবন ধারণের সামান্য রসদটুকু না পেলে কেমন করে জন্ম হতো লিওনার্দো-দ্য-ভিঞ্চির মোনালিসা-র!

শিল্পীদের অবহেলা আর বঞ্চনার কথা শোনালেন শিল্পী হিসামুদ্দিন: আমার ছাত্রেরা মাত্র মাসিক ৭৫ টাকা বৃত্তি পায়। এখন তা ১০০ করা হয়েছে। তিনবছর কাজ করলে পাবে মাসিক ৩০০ টাকা। এই সামান্য টাকায় কি ওরা দামী উটের চামড়া কিংবা সোনা-জলের ব্যবস্থা করতে পারে? নাকি তাদের প্রতিভার বিকাশ সম্ভব? দশ বছরের অক্লান্ত পরিশ্রম করে এখন মাসে ১,২০০ টাকা পায় আমার প্রিয় ছাত্র হানিফ। বলুন কি করে এই অর্থে ফ্রেসকো-কে অবলুপ্তির হাত থেকে বাঁচাবে ওরা?'

পাঁচগুণ বেশী টাকা দিয়ে এই শিল্পীসত্তাকে কিনতে চেয়েছিলেন বিদেশে পেন্টিং রপ্তানীকারকেরা। তাদের পছন্দ মাফিক কাজ করলে আরও বেশী পারিশ্রমিক পেতে পারতেন তিনি। কিন্তু শিল্পীসত্তা তো স্বতঃস্ফূর্ত। তাকে কোন সীমায় তো সীমায়িত করা যায় না। তারা আধুনিক টেকনোলজির যুগের রোবট বা কম্পিউটার নন যে, মানুষের ইচ্ছাধীন যন্ত্রদানব হয়ে কাজ করবেন। শিল্পী তাঁর আপন জগতেই বিচরণশীল। সেখানে তিনি মুক্ত-বিহঙ্গ। অবারিত তাঁর স্বাধীনতা। এরই মধ্যে শিল্পের নতুন দিকগুলি তিনিই তো মেলে ধরবেন আগামী প্রজন্মের কাছে।

তাই কমার্শিয়াল আর্টে নিজেকে বিকিয়ে দেন নি শিল্পী হিসামুদ্দিন উসতা। জীবনে এমন অনেক শিল্পীকে দেখেছেন যারা ঝরোখা কিংবা পাথর খোদাইয়ে নাম-ডাক করলেও অর্থ সংকুলানের জন্য বাধ্য হয়েছেন লোকোমটিভ ওয়ার্কসে কাজ নিতে।

ঘুরে ফিরে সেই এক কথাই আবার এসে যায়। আজকের দিনে সবাই যখন 'ফেস্টিভল অফ ইন্ডিয়া' নিয়ে মাতামাতি করছে, সে সময় এককোণে এক বিষণ্ণ জগতে নির্বাসিত অবহেলিত এই শিল্প প্রতিভাগুলি। শিল্পী হিসামুদ্দিনের কথায় তাঁর অন্তরের ক্ষোভ, দুঃখ ঝরে পড়েছে: 'সব বরাদ কর রহে হ্যায়, কলাকার কো কোহি ফ্যায়দা নেহি হুয়া।' (সবই বৃথা আস্ফালন, শিল্পীদের এতে কোনও লাভ হয় নি।)

এতসব অবহেলার মাঝেও শিল্পীসত্তা হিসামুদ্দিন উত্তুঙ্গ দুর্গম লক্ষ্যে পৌঁছানোর সংগ্রাম অব্যাহত রেখেছেন। 'ঈশা আল্লার' নামে শপথ করে তাঁর শেষ মন্তব্য, 'যতদিন আমার হাতে তুলি, রঙ আর ব্রাশ থাকবে, ততদিন ফ্রেসকো শিল্পকে কখনোই হারাতে দেব না।'

জ্যোতি সাবরওয়াল
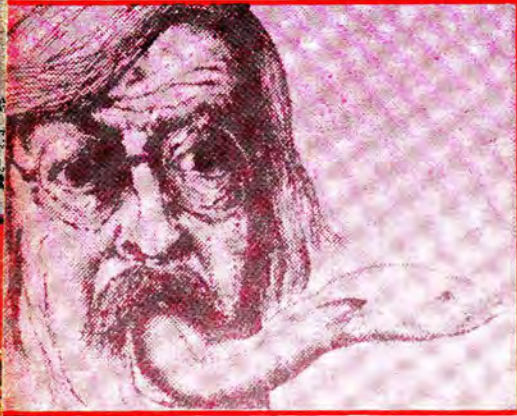
কলকাতায় দুই সাহেব প্রেমিক

গুন্টার গ্রাস : আত্ম প্রতিকৃতি
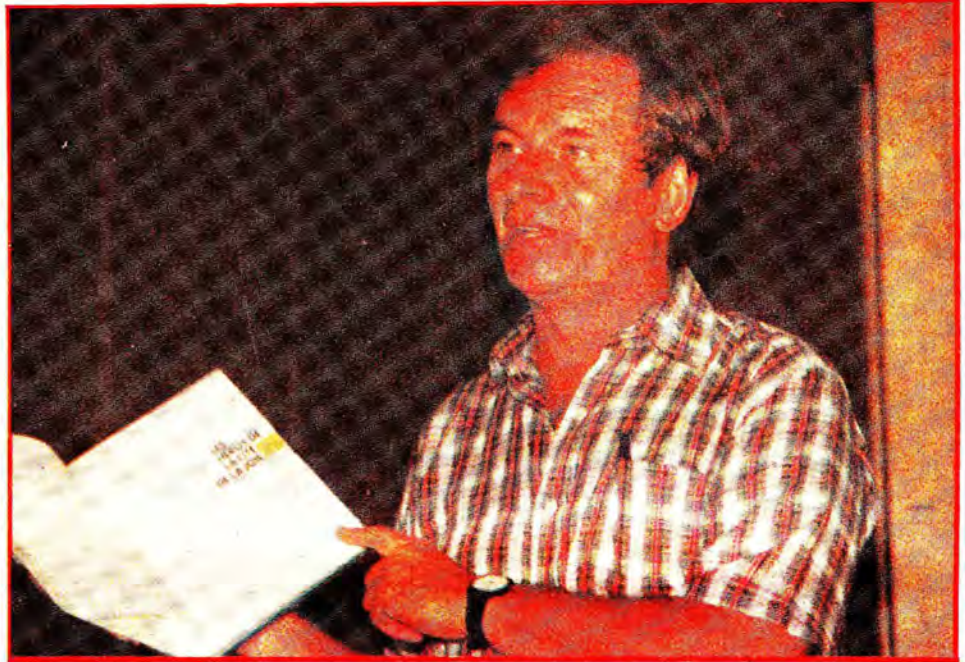
ডোমিনিক লাপিয়ের, সিটি অব জয়–এর বিতর্কিত লেখক

মহানগরে এসেছেন দুই প্রেমিক-লাপিয়ের এবং গুন্টার। একজন বিতর্কিত অন্য জন নীরবে সম্বর্ধিত। ডোমিনিক লাপিয়ের এমন কি লিখলেন যার জন্য বস্তিবাসীরা তার বেস্ট সেলিং উপন্যাস 'সিটি অব জয়'–এর আর্থিক ভাগ প্রত্যাখ্যান করলেন ? অন্যদিকে মানুষের মধ্যে মেয়ে ইঁদুর ও দুর্ধর্ষ শামুক খুঁজে পাওয়া লেখক গুন্টার গ্রাস কেন একবছর কলকাতায় থাকছেন ? কলকাতার দুই আশ্চর্য অতিথির সঙ্গে কথা বলে আমাদের দুই প্রতিনিধি আলো চৌধুরী এবং হাবিব আহসান অনেক অজানা তথ্য তুলে ধরেছেন।

গুন্টার গ্রাসকে নিয়ে আজকের দিনেও অনায়াসে এপিক লেখা চলতে পারে। যাঁর কলমের রেখাম্বিত শব্দপুঞ্জে এক একটি চরিত্র হয়ে ওঠে দুর্মুখ বিদূষক এবং আত্মপ্রকাশের সঙ্গে সঙ্গেই তামাম দুনিয়াকে করে আন্দোলিত, জীবননাট্যের বিচিত্র বৈভবে সেই যুগন্ধর লেখক নিজেই যেন এক মহাকাব্যের নায়ক–অনেকটা তাঁর সৃষ্ট চরিত্রের মতই।

মাত্র সতের বছর বয়সে আজকের দুর্জয় শিল্পীর হাতে কলমের বদলে গর্জে উঠেছিল বন্দুক। অবশ্যই নাৎসী প্ররোচনায়। সেই সুবাদে যেতে হল কয়েদখানায়। কেন জানি না মার্কিণ সান্ত্রীরা তাঁকে মুক্তিও দিয়েছিল নাটকীয় ভাবেই। হয়তো গ্রাসের বরাত-জোর। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের দুন্দুভি তখন থেমে গেছে। ক্লান্তি ও বিপর্যয়ে পৃথিবী সমাহিত। গ্রাসও ক্লান্ত। বিষন্ন জীবনের ভার। বন্দুকের প্রয়োজন ফুরিয়ে গেছে জার্মানীর। অতএব কিশোর যোদ্ধা বেকার হয়ে পড়লেন। তাহলে উপায় ? গ্রাস রিক্ত চোখে বাইরে তাকালেন। মাথার ওপর যুদ্ধক্লীষ্ট ঘোলাটে আকাশ। ঝাঁক ঝাঁক সাদা পায়রা উড়ছে আকাশ জুড়ে। শান্তির প্রতীক। কিন্তু আকাশতলে কাঠফাটা রূঢ় বাস্তব। বিধ্বস্ত মাটিতে শুধু হাহাকার, আর্তনাদ। সদূরপ্রসারি সেই দৃশ্য, অন্তত যতদূর গ্রাসের দৃষ্টির সীমানা। চাকরি, সামান্য একটি চাকরির জন্য তাঁকে বাউণ্ডুলের মত ঘুরতে হল জার্মানী থেকে ফ্রান্স, বিস্তর জমিনে। কিন্তু গ্রাসকে চাকরি দেবার মত একজন মানুষ পৃথিবীতে পাওয়া গেল না। আত্মবিশ্বাসই তখন একমাত্র পাথেয়। গ্রাস ভাবলেন। ভাবনা আর দীর্ঘশ্বাস। মাঝখানে জোড়াতালি দেওয়া জীর্ণ জীবন। এ যেন আরেক রণক্ষেত্র–মৃত্যুঞ্জয়ের সংগ্রাম।

গ্রাস সে যুদ্ধে হারেননি। ঘুরতে ঘুরতে একদিন ছোট্টখাটো একটি স্টুডিও বানিয়ে ফেললেন ফ্রান্সের রাজধানী প্যারিসে। একেবারেই অনাদৃত ঘিঞ্জি বস্তিতে। তবু সব হতাশা মনের সিন্দুকে জমা রেখে গ্রাস বসে গেলেন ছবি আঁকতে। যেন পাঁকের ভেতরে পদ্ম ফোটানোর সাধনা–গ্রাফিক আর্ট। সেই সঙ্গে শুরু হল গল্প লেখার কেরামতি। উপকরণ জুটে গেল যুদ্ধের সেই সব বীভৎস স্মৃতি আর নিজের চোখে দেখা অগণিত মানুষের বিচিত্র জীবনলীলা। তার ওপর ঠিকরে পড়ল 'গ্রুপ ৪৭'–এর প্রখর কিরণ। নরকের আগুনের চেয়েও ক্ষুরধার সেই বিচ্ছুরণ আরও উজ্জ্বল হয়ে গ্রাসের সৃষ্টিকে তাতিয়ে দিল। ১৯৫৯ সালে বেরল সেই যুগন্ধর বই–'ডি ব্লেসট্রোমেল' অর্থাৎ টিনের চাক। চাক পিটিয়েই চকিত অভ্যুদয়ে গ্রাস সরাসরি উঠে এলেন বিশ্বসাহিত্যের প্রথম সারিতে, হয়ত বা শীর্ষস্থানেই। বয়স তখন মাত্র বত্রিশ। টগবগে তরুণ-বেকার ও বিদ্রোহী। এরপর আর পিছন ফিরে তাকাতে হয়নি। শুধুই এগিয়ে চলা, ক্রমাগত ব্যবধান্ রচনার চরৈবেতি। তখন থেকেই গুনটার গ্রাস জার্মানীর শ্রেষ্ঠ লেখক, পয়লা নম্বর। বিশ্বসাহিত্যে তাঁর জনপ্রিয়তা অপ্রতিরোধ্য।

'ডি ব্লেসট্রোমেল'-এর নায়ক অসকার মাতসেরাত। সে নিতান্তই একজন বালক। এক আজগুবি পরিবেশে তার শৈশব লালিত হয়েছে, যার প্রভাব অসকারের শরীর ও মনের খুব ভেতর পর্যন্ত ক্রিয়াশীল। ফলে কোনটিরই স্বাভাবিক বিকাশ সম্ভব হল না। তৃতীয় জন্মদিনে তাকে

উপহার দেওয়া হল একটি টিনের ঢোলক। তখনই সে শিশুসুলভ সিদ্ধান্ত নেয়, সে তার বড় হবে না। ফলে সমাজ ও বয়স্কদের কাছ থেকে নিজেকে বিচ্ছিন্ন করে ফেলে। তার অনির্বচনীয় পরিণাম, নিজের এবং আশপাশের পরিবেশ তার কাছে অপরিচিত মনে হয়। সুতরাং মানসিক সংঘাত। সবই যেন তার কাছে অস্বাভাবিক। বয়োসন্ধি-কালে অসকারের জেদ আরও বেপরোয়া হয়ে ওঠে। এভাবেই একদিন অস্বাভাবিকতার বিরুদ্ধে বেজে ওঠে তার টিনের ঢোলক। সে চিৎকার করে ছুটে বেড়ায় পৃথিবী জুড়ে। সব কিছু ভাঙতে চায়। শেষ পর্যন্ত আটক হয় পাগলা গারদে। শেষের দিকে অসকার সামান্য বড় হতে চেয়েছে। উপলব্ধি করেছে, মাত্রাহীন প্রতিবাদ হঠকারিতার নামান্তর। নিজের চেষ্টায় বাবা-মার সঙ্গে সম্পর্ক চুকিয়ে সে অনাথ হয়েছে। সে বোঝে কম, বলে কম-অথচ মনের ভেতরে ভীষণ জেদী। আত্মাভিমান তাকে নিয়ন্ত্রণ করে। সে খামখেয়ালী, আবার সুযোগসন্ধানীও বটে। অসকারের জেদ ও প্রতিবাদ আসলে যুগের ধর্ম। সামান্য একটি বালকের বিরূপ আচরন হয়তো বরাদাস্ত করা যায়। কিন্তু মধ্যবিত্ত শ্রেনীর মানুষ, বয়স্ক হয়েও যারা অস্বাভাবিক খোকামী পরিহার করতে পারেন না-কথাবার্তা, চাল-চলন কৃত্রিম, দায়িত্বহীন, অসকার তাঁদেরই প্রতিনিধি। এক তির্যক প্রতিবাদ।

'ডি ব্লেসট্রোমেল'-এর ইংরেজি অনুবাদ 'দ্য টিন ড্রাম' প্রকাশিত হয় ১৯৬২ সালে। সতেরটি ভাষা মিলিয়ে সম্ভবত বিশ্বের সর্বাধিক বিক্রিত উপন্যাস। দীর্ঘ সাতাশ বছরেও 'দ্য টিন ড্রামে'র জনপ্রিয়তা এতটুকু কমেনি, বরং বেড়েই চলেছে। প্রথম বইয়ের এই সর্বপ্লাবী জনপ্রিয়তার নজির হয়ত আরও বহুকাল অক্ষুণ্ণ থাকবে। আমাদের দুর্ভাগ্য বইটি আজও বাংলায় ভাষান্তরিত হয়নি।

১৯৮৬ সালে সাহিত্যে নোবেল পুরস্কার পেয়ে-ছিলেন জাপানের ইয়াসুনারি কাওয়াবাতো। কিন্তু কি করে জানি না গুজব ছড়িয়ে যায় পুরস্কার পাচ্ছেন গুনটার গ্রাস, তাঁর 'ডি ব্লেসট্রোমেল' উপন্যাসের জন্য। জীবনের প্রথম বইয়েই গ্রাস বিশ্ববন্দিত। ফলে গুজবের ডানায় ভর করে ঝাঁকে ঝাঁকে সাংবাদিক উড়ে আসেন বার্লিনে। বার্লিন থেকে হামবুর্গ। কিন্তু গরু খোঁজা করেও কোথাও গ্রাসের নাগাল পাওয়া গেল না। দরজায় তালা ঝুলিয়ে তিনি যেন কোথায় হাওয়া হয়ে গেছেন, কিন্তু কোথায়? কেউ বললেন বিদেশে, কেউ বল-লেন অসুস্থ। এদিকে টেলিফোন ডাইরেকটারিতেও গ্রাসের নাম-গন্ধ নেই।

আসলে গুজবের কথা গ্রাসের কানেও পৌঁছে-ছিল। তাই ডামাডোল থেকে গা বাঁচাতে তিনি পালিয়েছিলেন জন্মভূমি ডানজিগে। সেই অজ্ঞাত-বাসেই সৃষ্টি হয় গ্রাসের যুগান্তকারী নাটক 'ডেভর'। নতুন লেখায় হাত দিলে তিনি সম্পর্ক রাখেন না পৃথিবীর সঙ্গে। সর্বতোভাবে ভাবনার গহনে ডুবে যান। সারা পৃথিবীতে গ্রাসের সেই অজ্ঞাতবাসের ঠিকানা জানেন একজনই, তিনি সোসাল ডেমো-ক্রাট দলের নেতা এবং জার্মানীর প্রাক্তন চ্যান-সেলর উইলি ব্রান্ট। ব্রান্টই গ্রাসের সবচেয়ে

> **গুনটার গ্রাস, যিনি শুধু রেখা ও অক্ষরমালার স্তবকে তাঁর বিশ্বাস ও প্রতিবাদ ব্যক্ত করেন না, জীবনের বহুমুখী বৈচিত্র মাপতে নেমে আসেন রাস্তায়-পাতালে। বিশ্বের সবচেয়ে ধনী লেখক হয়েও গ্রাসের নিজের কোন গাড়ি নেই।**

ঘনিষ্ঠ বন্ধু। শুধু তিনিই সেখানে যেতে পারেন দুনিয়ার হাল-হকিকত জানাতে, তাও অতি সং-ক্ষেপে এবং দিনে মাত্র একবার। যাঁর দম্ভ ও বদমেজাজের তীব্র শ্লেষে বিদ্ধ হয় ইশ্বর থেকে রাষ্ট্রপ্রধান তাঁকে কোন সম্মানই আত্মহারা করতে পারে না। দুর্মুখ গ্রাস সেই অর্থে দুর্লভ সৌভাগ্যেরও অধিকারী। কারণ তার শীর্ষদেশী জনপ্রিয়তা কমছে না, বেড়েই চলেছে।

শুধু ১৯৬৮ সালেই নয়, ১৯৭৪ সালেও সুইডিশ একাডেমীর সম্ভাব্য তালিকায় গ্রাসের নাম উঠে-ছিল। কিন্তু সম্ভাবনা শেষ পর্যন্ত 'সম্ভবের'স্তরে পৌঁছেনি। সেবার পুরস্কার পান জার্মান উপন্যাসিক হাইনরিশ বোল। সেই থেকে প্রতি বছরই গ্রাসের নাম সুইডিশ একাডেমীর সম্ভাব্য তালিকায় ঘুর-ঘুর করছে, কিন্তু কোন অজ্ঞাত কারণে শিরোপাটি এখনো তাঁর বরাতে জোটেনি। তা নিয়ে অবশ্য এই দুর্ধর্ষ স্রষ্টার বিন্দুমাত্র মাথাব্যথা নেই। তিনি বিশ্ব-সাহিত্যের মুকুটহীন সম্রাট।

সেই যুগন্ধর পুরুষ-একাধারে যিনি সাহি-ত্যিক, শিল্পী, ভাস্কর, চলচ্চিত্রবিদ, আবার সক্রিয় রাজনীতিবিদ-তিনি এখন কলকাতার অতিথি। উত্তর শহরতলির এক ছায়াঘেরা বাগানবাড়িতে পাততাড়ি সাজিয়েছেন টানা এক বছরের জন্য। এই নিয়ে দ্বিতীয়বার কলকাতায় এলেন। গ্রাসের প্রথম কলকাতা সফরের স্মৃতি উজ্জ্বল হয়ে আছে তাঁর অনবদ্য ফ্যানটাসি 'দ্য ফ্লাউনডারে'র ১৭২ থেকে ১৮৯ পৃষ্ঠায়: 'সেনড আ পোস্টকার্ড উইথ রিগার্ডস ফ্রম ক্যালকাটা....মিট ইয়োর দামাসকাস ইন ক্যালকাটা....গেট লস্ট ইন ক্যালকাটা....অন অ্যান আনইনহ্যাবিটেড আইল্যানড রাইট আ পোয়েম অ্যাবাউট ক্যালকাটা.... রিকোমেন্ড ক্যালকাটা টু আ ইয়ং কাপল অ্যাজ আ গুড প্লেস টু ভিজিট অন দেয়ার হনিমুন.....রাইট আ পোয়েম কলড 'ক্যালকাটা' অ্যানড স্টপ টেকিং প্লেস টু ফার অফ প্লেসেস...ট্রানসফার দ্য ইউ এন টু ক্যালকাটা...' নির্ঝরের মত স্বতশ্চল এইসব স্বগ-তোক্তিই প্রমাণ করে কলকাতা গ্রাসের চেতনাকে কত গভীরভাবে নাড়া দিয়েছিল। অবশ্য এরই পাশে তীব্র অপ্রিয় অভিব্যক্তিও গোপন থাকেনি ঠোঁট কাটা গ্রাসের মেজাজী কলমে: 'লেটস নট ওয়েস্ট অ্যানাদার অন ক্যালকাটা। ডিলিট ক্যালকাটা ফ্রম অল গাইড বুকস'-এ ধরনের শ্রুতিকটু মন্তব্য নিশ্চয়ই কলকাতাপ্রেমীদের আহতও করেছে দারুণভাবে। বস্তুত এই ক্ষোভেরই প্রকাশ ঘটেছে জার্মান প্রবাসী কলকাতা প্রেমিক আলোকরঞ্জন দাশগুপ্তের একটি কবিতায়।

আসলে উত্তাল, উদ্বেলিত কলকাতার নির-তিশয় বৈপরীত্য বোধহয় গ্রাসকে সেবার দিশে-হারা করে তুলেছিল। উপনিবেশের স্মৃতিবিজড়িত গভর্নর হাউসের নিশ্ছিদ্র দুর্গে বসে কলকাতার সমান্তরাল বৈপরীত্য তিনি প্রত্যক্ষ করলেও মান-সিকভাবে তিনি ছিলেন নির্বাসিত। গ্রাস এবার তাই কলকাতার অন্তরে প্রবেশ করতে চান, অনুভব করতে চান তার হৃদ স্পন্দনের প্রতিটি সংকেত। সে জন্যই কোলাহল থেকে দূরে গ্রামীন পরিবেশে তাঁর এবারের আস্তানা।

সাহিত্যকর্মে গ্রাস খুব প্রত্যক্ষভাবে সমাজ সচেতন। একে রাজনীতি বললে গ্রাস অবশ্যই রাজনৈতিক লেখক। শিল্প এবং রাজনীতি তাঁর নিজের কথায়, মানুষের আত্মা আর শোনিতের অভিন্ন ব্যাপার। বলা বাহুল্য, জার্মানীর রাজ-নীতিতেও তিনি জড়িয়ে আছেন আঠার মত। সোসাল ডেমোক্রাট দলের এত ভেতরে তিনি ঢুকে গেছেন, অনেকের মতে, একজন শিল্পীর পক্ষে যা অত্যন্ত ক্ষতিকর। ব্রান্টের সব গুরুত্ব-পূর্ণ ভাষণ তিনি লিখে দেন, এমন কি প্লাকার্ড ও ফেস্টুন হাতে তিনি রাস্তায় রাস্তায় শ্লোগান দিচ্ছেন সেই ১৯৬৫ সালের নির্বাচন থেকে। শুধু তাই নয়, লেখক সংঘের (ভি-এস) মহাসম্মেলনে লেখক-দেরও তিনি ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনে যুক্ত হবার আহ্বান জানিয়েছেন। মুখ্যত তাঁর প্ররোচনাতেই লেখক সংঘ প্রিনটিং অ্যানড পেপার ওয়ারকারস ইউনিয়নের সঙ্গে গাঁটছড়া বেঁধেছে। লেখক, শিল্পী এবং প্রকাশনার সর্বস্তরের কর্মীদের তিনি ঐক্য-বদ্ধ করতে চান। চান একটি গণতান্ত্রিক সমীকরণ। যদিও গ্রাসের নিজের ক্ষতিই তাতে সর্বাধিক। কারণ পৃথিবীতে তার সমান রয়্যালিটি আর কোন লেখকই বা পান।

এই হলেন গুনটার গ্রাস, যিনি শুধু রেখা ও অক্ষরমালার স্তবকে তাঁর বিশ্বাস ও প্রতিবাদ ব্যক্ত করেন না, জীবনের বহুমুখী বৈচিত্র মাপতে নেমে আসেন রাস্তায়-পাতালে। বিশ্বের সবচেয়ে ধনী লেখক হয়েও গ্রাসের নিজের কোন গাড়ি নেই। ঘুরে বেড়ান ব্রান্টের গাড়িতে, প্রায়শই পায়ে হেঁটে। বার্লিন ও হামবুর্গের এমন সব জায়গায় তাঁকে ঘুরতে দেখা যায়, যেখানে কোন ভদ্রলোকের পদধূলি পড়ে না। এভাবেই সাহিত্যের উপকরণ তুলে নেন জীবনের নির্দিষ্ট বেদীমূল থেকে। ফলে 'দ্য ফ্লাউনডারে' এমন সব আঞ্চলিক ও অপ-ভাষার প্রয়োগ ঘটে, প্রচলিত অভিধানে যার চিহ্ন খুঁজে পাওয়া যায় না। তামাম দুনিয়া থেকে অনু-বাদকদের জার্মানী ছুটতে হয় সেগুলির মানে বুঝতে। আর তখনই নতুন করে প্রমাণিত হয়, বিশ্বসাহিত্যে গ্রাস আজ কতখানি অপরিহার্য। ভাষার জটিলতার দিক দিয়ে জেমস জয়েসের 'ইউলিসিস' বা 'ফিনেগান ওয়েকে'র সমগোত্রীয় 'দ্য ফ্লাউনডারে'র মূল পটভূমি ডানজিগ এবং

বিষয়বস্তুর একটি বড় পরিসর দখল করে আছে রান্নাবান্না। তাই গৃহিণীরাও বইটি সযত্নে কিচেনের র‍্যাকে তুলে রাখতে পারেন। গ্রাস নিজেও নাকি খুব পাকা রাঁধুনী। সুযোগ পেলেই বন্ধুদের রান্না করে খাইয়ে দেন।

এমন উদ্দাম পুরুষ তাঁর অদ্ভুত জীবন দর্শনের কথা বললেন 'একসার্পটি ফ্রম আ স্নেইল'স ডায়েরিতে। এই রাজনৈতিক উপন্যাসে বিরাজ করছে একটি 'বড় শামুক'। বলা বাহুল্য, সযত্নে নির্মিত এই চরিত্রটি স্বয়ং উইলি ব্রান্টের। শামুক এখানে ধীর ও স্থিরতার প্রতীক। 'লাফ মারা' শামুকদের লম্ফ ঝম্ফে জার্মানীর কি ভয়ানক ক্ষতি হয়েছে সে কথা স্মরণ করে লেখক বলেছেন, জার্মানীর রাজনৈতিক জীবনে চাই ব্রান্টের মত একটি 'বড় শামুক'–বুদ্ধিতে যিনি ধীর ও স্থির এবং গতিতে শ্লথ। গ্রাসের রাজনৈতিক আদর্শও তা-ই।

শামুকের মত শ্লথগতি হলেও ফি-বছর গড়পড়তা একটি করে গ্রাসের চাউস উপন্যাস বেরিয়ে চলেছে। জনপ্রিয়তার দিক দিয়ে বিশ্বের কোন সাহিত্যিকই তাঁর ধারে কাছে আসতে পারছেন না। 'ডি বেলসট্রোমেল' প্রকাশের আগে হাইনরিশ বোল–এর জনপ্রিয়তা মনে হয়েছিল গগনবিদারি মিনারের মত। কিন্তু বোলকে ছাড়িয়ে গ্রাস এতদূর এগিয়ে যান, যেখান থেকে ফিরে তাকালে হাইনরিশ বোল বা জারড গেইসাবকে খুবই ঝাপসা দেখায়। বোল যেখানে যুদ্ধকে চুনকাম করে ফেলতে চান, গ্রাস সেখানে এক নতুন যুদ্ধের কথা বলেন। দুজনের মৌলিক পার্থক্য বোধহয় এখানেই।

হামবুর্গে গ্রাসের ঘরের জানলায় কোন পর্দা নেই। পর্দা নেই মনের জানলাতেও। উঁচু টেবিলে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে তিনি লেখেন। প্লট গুছিয়ে নেন পায়চারি করতে করতে। এভাবেই ভাবেন, জিরিয়ে নেন। মুহূর্মুহূ টেলিফোন বাজলেও তখন ভ্রুক্ষেপ থাকে না। নিরাবরণ অর্গল ভেদ করে গ্রাসের দৃষ্টি তখন চলে যায় বার্লিন থেকে ডানজিগে, সুদূর তৃতীয় রাইখ পর্যন্ত। সেই অন্তর্লীন বিশ্বে এমন সব চরিত্রের সঙ্গে তাঁর দেখা হয়, আমাদের চোখের সামনেই যাদের ঘোরাফেরা অথচ আড়াল হলেই মুখগুলি মনের পরিধির বাইরে হারিয়ে যায়। আর এসব আটপৌরে চরিত্রের পাশাপাশি গ্রাসের লেখায় কুকুর, বেড়াল, ইঁদুর, শামুক, মাছ প্রভৃতি ইতর প্রাণীর নির্বিকার সহবাস।

বহুধা বিস্তৃত গ্রাসের কর্মজগত–কবি, ঔপন্যাসিক, নাট্যকার, মঞ্চ নির্মাতা, ড্রাফটসম্যান, সাংবাদিক–এমন কি সমাজ ও রাজনীতির পুরোগামী সৈনিক।

প্রখ্যাত জার্মান পরিচালক ভলকার শ্লোনডরক 'ডি বেলসট্রোমেল' চলচ্চিত্রায়িত করেছেন। ১৯১৯ সালে কান ফেসটিভালে সেটি 'গোলডেন পাম' পুরস্কার পায় ফ্রানসিস কোর্ড কপোলার মার্কিন ছবি 'দ্যা অ্যাপোকেলিপস'–এর সঙ্গে যৌথভাবে। গ্রাসের নিজের খাটুনিও তাতে কম ছিল না। সমস্ত দৃশ্যই তৈরি হয়েছে তাঁর আজ্ঞাধীনে। এমন কি কিছু কিছু সংলাপও তিনি লিখে দিয়েছেন সিনেমার উপযোগী করে। পরিচালকের ভরসা বা পরোয়া কোনটিই করার পাত্র তিনি নন।

জার্মানীর নাট্য আন্দোলনেও গ্রাস প্রায় সেনাপতির ভূমিকা পালন করেছেন। এখানে তিনি প্রয়োগ করেন অ্যাবসার্ড নাটকের ভাষা। শুধু অন্ধকারের সংলাপ দিয়েই গ্রাস তাঁর দায়িত্ব শেষ করেন না। অন্যায় ও অন্ধকারকে শাণিত আঘাতে দীর্ণ করে ব্রেশটের যোগ্য উত্তরসূরী হিসাবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেছেন। সাহিত্যের মত গ্রাফিক শিল্পী হিসাবেও গ্রাসের খ্যাতি বিশ্বজোড়া। প্রায়শই নিজের বইয়ের প্রচ্ছদ তিনি নিজেই আঁকেন।

কলকাতার এই সম্মানীয় অতিথির প্রতি রইল স্নিগ্ধ শুভেচ্ছা। গুজবের শিকড় ছিঁড়ে এবার যদি তিনি নোবেল পুরস্কার পান তাহলে গ্রাস যে অভিভূত হবেন না একথা নিঃসন্দেহেই বলা যায়। নোবেল পুরস্কার গ্রাসের মত কালজয়ী প্রতিভাকে আর কতটুকুই বা সম্মানিত করতে পারে, বরং নোবেল পুরস্কারই সম্মানিত হবে এই যুগন্ধর শিল্পীর নামের স্পর্শে। কিন্তু কলকাতাবাসীদের কাছে সেটি কি এক দুর্লভ সৌভাগ্যের বিষয় হয়ে দাঁড়াবে না ?

লাপিয়ের ডোমিনিক : লেখক না ব্যবসাদার ?

এ কি কথা শুনি আজি মন্থরার মুখে। আবহমান কাল থেকে দেশী ও বিদেশী মানুষের কাছে কলকাতা ও হাওড়া শহর সম্বন্ধে বিরূপ মন্তব্য শুনে আসছি। কিন্তু ফরাসী লেখক লাপিয়ের ডোমিনিক কলকাতা ও তার শহরতলীকে (হাওড়াও অন্তর্ভুক্ত) 'আনন্দনগর' নামের আবরণে বিদেশীর চোখে হেয় প্রতিপন্ন করে বাণিজ্যিক সাফল্য লাভ করেছেন। শুধু তাই নয় 'গরু মেরে জুতো দানের মত' বিক্রিত বইয়ের রয়্যালটির এক অংশ হাওড়ার ওয়াটকিনস্ স্ট্রীটের সমাজ কল্যাণ মূলক প্রতিষ্ঠান সেবা সংঘ সমিতিকে পিলখানা বস্তির উন্নতির জন্য দান করেছেন। ঐ প্রতিষ্ঠান আনুমানিক হিসেব করে দেখেছেন বস্তি উন্নতির জন্য ঐ টাকার পরিমাণ প্রায় ৪০ লক্ষ টাকা। না জানি, রয়্যালটির মোট অর্থ কত ? লেখক বইটির বাণিজ্যিক সাফল্য অনুমান করেই কি উপন্যাসটির নাম দেন-এ সিটি অব জয় অর্থ্যাৎ আনন্দনগরী ?

হাওড়া যে কুলি টাউন সে কথা আমরা জানি। অধ্যুষিত পিলখানা অঞ্চলে দারিদ্র, অপুষ্টি, অশিক্ষা, কুসংস্কার আছে একথা স্বীকার করতেই হয়। ২০০ বছরের বিদেশী শোষণের ফসল এগুলি। এসব অতিরঞ্জিত করে পাঠকের কাছে তুলে ধরে উন্নত দেশের অধিবাসীদের কাছ থেকে বাহবা ও বাণিজ্যিক সাফল্য লাভ করা যায় কিন্তু লেখকের পরিচিতি লাভ করা যায় কি ?

ভারতবর্ষ গণতান্ত্রিক দেশ। গণতন্ত্রের সম্মান ভারতবাসীর কাছে প্রাণ অপেক্ষা প্রিয়। তাঁর বইয়ের ১৫৮ নং পাতায় উল্লেখিত রিক্সাওয়ালার প্রতি আরোহীর দুর্ব্যবহার মধ্যযুগের ইউরোপীয় সামন্ততন্ত্রের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। আজকের দিনে আত্মসচেতন ও গণতন্ত্র সচেতন মানুষ কলকাতার জনবহুল রাস্তায় এক আরোহী একটি রিক্সা চালককে চাবুকের অভাবে নিজের জুতো দিয়ে মারছে দেখলে কি নীরব থাকবে ? ১৫৩ নং পাতায় লেখা আছে–একজন যক্ষা রোগগ্রস্ত রিক্সা চালকের মুখ দিয়ে রক্ত উঠত। এজন্য সে পান খেত। গরীব দেশের গরীব রিক্সা চালকেরা অপুষ্টির দরুণ সহজেই রোগের শিকার হয়। কিন্তু 'আনন্দনগরী'র পাতায় যে পানের পিকের কথা বলা হয়েছে তা অতিরঞ্জিত নয় কি ? আর যদি সত্যি হয়ও তাহলেও এটা লেখার দরকার কি ? অনেক লোকই রোগ লুকিয়ে সমাজে বাস করে।

১৯৮৫ সালে ফ্রান্সে বইখানি প্রথম প্রকাশিত হয়। ১৯৮৬ সালে এটি ইংরেজীতে অনুবাদ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে এর বিক্রির পরিমাণ হু হু করে বেড়ে যায়। বইটির প্রচ্ছদে লেখা আছে-দি নাম্বার ওয়ান বেস্টসেলার।

হাওড়ার পিলখানার সেবা সংঘ পরিচালকমণ্ডলী মনে করে–বইখানি লিখতে লাপিয়ের কাল্পনিক কাহিনীর আশ্রয় নিয়েছেন। ভারত সম্বন্ধে আগ্রহী পাঠকদের মনোযোগ আকর্ষণ করার জন্যই তিনি এই পথ বেছে নিয়েছেন। কিন্তু উপন্যাসের কোথাও এ বিষয়ে তাঁর কোন স্বীকারোক্তি নেই। ফলে সহজেই পাঠককে আকৃষ্ট করেছে। তিনি হাওড়া-কলকাতার বাসিন্দাদের বিশ্বের দরবারে হেয় করেছেন। তাই তাঁর অযাচিত দান গ্রহণ করা সম্ভব নয়। বইটির একেবারে শেষের এপিলগে লাপিয়ের সেবা সংঘ সমিতির কাজকর্ম বর্ণনা প্রসঙ্গে একজায়গায় লিখেছেন– 'ডঃ সেন (সেবাসংঘ সমিতির সভ্য) একজন উদার হৃদয় সম্পন্ন বাঙালি ডাক্তার এবং গত তিরিশ বছর ধরে তিনি গরীব মানুষদের বিনা পারিশ্রমিকে চিকিৎসা করছেন।' কিন্তু উল্লেখ করা যেতে পারে সেবাসংঘ সমিতির নামের স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনটি একটি ধর্মনিরপেক্ষ অরাজনৈতিক সংস্থা। এই সেবাসংঘ সমিতির বিভিন্ন ইউনিট চালাতে ফ্রান্সের অনেক সাধারণ মানুষ সাহায্য করেন। এই সাহায্য সংগঠিত করার জন্য ফ্রান্সে এই সমিতির একটি 'মিত্র সংস্থা'ও আছে।

গত সেপ্টেম্বর মাসে লাপিয়ের সপরিবারে কলকাতায় আসেন ও বেশ কয়েকদিন কলকাতায় কাটিয়ে যান। মহরমের দিন হাওড়ার পিলখানা অঞ্চলে যান। পিলখানার বাসিন্দাদের কাছে মিস্টার লাপিয়ের সানন্দে ঘোষণা করলেন–তাঁর 'সিটি অব জয়' উপন্যাসটি চলচ্চিত্রে রূপায়িত হচ্ছে। ছবির প্রযোজক সংস্থা লণ্ডনের গোল্ড ক্রেস্ট ফিল্মস্ কোম্পানি। অর্থ্যাৎ 'গান্ধী' ছবির প্রযোজক সংস্থা এ ছবিরও প্রযোজনা করছে। না জানি এ ছবিতে আরও কত কাল্পনিক কুৎসা চিত্রয়িত হবে।

লাপিয়েরের কলকাতা-প্রেম সর্বজন স্বীকৃত। 'এ সিটি অব জয়' উপন্যাসটির একটি অধ্যায়ের নাম 'ক্যালকাটা মাই লাভ'। কিন্তু 'দি সিটি অব্ জয়' (আনন্দনগরী)–উপন্যাসটি পড়ার পর লাপিয়েরকে লেখক বা সাংবাদিক হিসেবে গণ্য করা যায় কি ? বরঞ্চ তাকে এক সুচতুর ব্যবসায়ী বলা যেতে পারে।

ছবি : অনিল গ্রোভার

আজকের বিধান সরণীতে যে স্টার থিয়েটার দাঁড়িয়ে আছে নটী বিনোদিনী সেখানে অভিনয় করেন নি! আসলে বাঙালীর হৃদয়ে স্টার থিয়েটার এক মানস-প্রতিমার মত। সেখানে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ থেকে মহাকবি গিরিশচন্দ্রের স্মৃতির ছোঁয়া উজ্জ্বল হয়ে আছে। আগামী ১৯৮৮-তেই একশ বছর পূর্ণ হবে স্টার থিয়েটারের। অনেক নট ও নটী এবং তাদের প্রিয় রঙ্গমঞ্চ স্টারের উদ্দেশ্যে কৃষ্ণেন্দু রায়ের এই স্মৃতিচিত্রণ।

স্টার থিয়েটার

বাংলা নাট্য সাম্রাজ্যের সম্রাজ্ঞী নটী বিনোদিনী

সেদিন মহল্লায় যাবার সময় দেখা হয়ে গেল থিয়েটারের অন্যতম উদ্যোক্তা দাশু নিয়োগীর সঙ্গে। মনে পড়ে গেল, আজই তো থিয়েটারের নাম রেজিস্ট্রি হবার কথা। তাই দাশু নিয়োগীকে জিজ্ঞেস করে বিনোদিনী

—থিয়েটারের নাম রেজিস্ট্রি হয়ে গেল ?

—হ্যাঁ।

—কি নাম হলো ?

—স্টার থিয়েটার।

নামটা শুনে মনে হল কে যেন তার মাথায় আনন্দের ডালিটি তুলে বসিয়েছে। তার দু' চোখ দিয়ে অঝোর ধারায় তখন অশ্রুর বন্যা নেমেছে। গুমুখ রায় বলেছিলেন, বিনোদিনীর নামে এই থিয়েটারের নাম হবে বি থিয়েটার। বিনোদিনী রাজী হয়নি। সকল স্টারের প্রাণ, তাই স্টার থিয়েটার।

১৮৮৩ সালের ২১ জুলাই রাত্রি ৯ টায় গিরিশচন্দ্রের 'দক্ষযজ্ঞ' নাটক নিয়ে স্টার থিয়েটারের উদ্বোধন হল। দক্ষ গিরিশচন্দ্র ঘোষ, নন্দী: অঘোর পাঠক, ভৃঙ্গী: প্রবোধ ঘোষ, মহাদেব: অমৃত মিত্র, প্রসূতি: কাদম্বিনী, তপস্বিনী: ক্ষেত্রমণি, ভৃগুপত্নী: গঙ্গামণি, দধিচী: অমৃতলাল বসু আর সতী বিনোদিনী।

পুরোনো কর্ণওয়ালিশ স্ট্রীট বা আজকের বিধান সরণিতে যে স্টার থিয়েটার দাঁড়িয়ে আছে, নটী বিনোদিনী সেখানে অভিনয় করেন নি। তবু স্টার থিয়েটার নাম উঠলেই আমাদের মনে পড়ে যায় নটী বিনোদিনীর কথা। কারণ স্টার থিয়েটারের প্রকৃত স্রষ্ঠা তিনিই। কিন্তু বর্তমান স্টার থিয়েটারের সঙ্গে বিনোদিনীর তো কোন সংস্রব নেই বললেই চলে। এবং আজকের রঙ্গমঞ্চের বাড়িটিতেও পুরনো ইতিহাসের ছাপ নেই। আসলে বাঙালির হৃদয়ে 'স্টার' থিয়েটার যেন কোন বিশেষ রঙ্গমঞ্চের বাড়ি নয়, প্রায় যেন কোন মানসপ্রতিমার মত, যার সর্বাঙ্গে উনিশ শতকের শেষভাগের নাট্য ঐতিহ্যের সৌরভ মিশে আছে। যেন যবনিকা উঠলেই পাদপ্রদীপের সামনে এসে দাঁড়াবেন মহাকবি গিরিশচন্দ্র, বিনোদিনী দাসী, তারাসুন্দরী, তিনকড়ি, অমৃতলাল বসু, দানীবাবু, অপরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় এবং অনেক নট ও নটীরা।

আসলে পুরনো স্টার থিয়েটার আর এখন নেই, যা বিনোদিনীকে ভালোবেসে গুর্মুখ রায় বানিয়ে ছিলেন। বাগবাজারের কীর্তি মিত্রের জমি লিজ নিয়ে ৬৮ নং বিডন স্ট্রিটে স্টার থিয়েটার খোলা হয়। গিরিশচন্দ্রের 'দক্ষযজ্ঞ' নাটক নিয়ে শুরু হয়েছিল পুরনো স্টার থিয়েটার। 'দক্ষযজ্ঞ'র পরে স্টারের জন্য আরও দু'খানা নাটক লিখলেন গিরিশচন্দ্র—'ধ্রুবচরিত্র' ও 'নল দময়ন্তী'।

আস্তে আস্তে দিব্যি জমে উঠছিল 'স্টার' থিয়েটার, এমন সময় ডিসেম্বর ১৮৮৩ তে গুর্মুখ রায় হঠাৎ বেঁকে বসলেন। তিনি আর স্টার থিয়েটার চালাবেন না। ঠিক করেছেন, স্টার থিয়েটার বেচে দেবেন তিনি। কথা হল বিনোদিনীর সঙ্গে—

—থিয়েটার চালানো আর আমার পক্ষে সম্ভব হচ্ছে না বিনোদ।

—আমার জন্যই তুমি থিয়েটার করলে, আর এখন সম্ভব হচ্ছে না কেন ?

—মায়ের আপত্তি।

—আর ?

—আর আমাদের সমাজে এ ব্যবসা নিন্দনীয়।

—তাহলে থিয়েটারের কি হবে ?

দলের সকলের হয়ে গিরিশচন্দ্র গুর্মুখ রায়ের সঙ্গে নানারকম কথাবার্তা বললেন। গুর্মুখ জানালেন, এগারো হাজার টাকার বিনিময়ে তিনি স্টার থিয়েটার গিরিশচন্দ্র, অমৃতলাল প্রমুখদের দিয়ে দিতে রাজি আছেন।

গিরিশচন্দ্র দলের সকলকে ডেকে বললেন—কে টাকা আনবে আন। টাকা যে আনতে পারবে সে-ই থিয়েটারের মালিক হবে। অমৃতলাল মিত্র, অমৃতলাল বসু, হরি প্রসাদ বসু ও দাসুচরণ নিয়োগী জোগাড় করে ফেললেন কয়েক হাজার টাকা। বাকি টাকা ধার করে জোগাড় হল। ধার দিলেন জোড়াসাঁকোর কৃষ্ণধন দত্ত। স্টার থিয়েটারের নতুন স্বত্বাধিকারী হলেন চারজন—অমৃতলাল মিত্র,

মতিলাল শীলের নাতি গোপাল লাল শীলের খেয়াল হল থিয়েটার খুলবেন। শোনা যায়, গোপাল লালের থিয়েটারের খেয়ালের মূলে নাকি ছিল অন্তর্জ্বালার ইতিহাস। গোপাল লালের রঙ ফর্সা ছিল না এবং তা নিয়ে স্টার থিয়েটারের কোন নটী নাটকে গানের মাধ্যমে ঠাট্টা করেছিল। সেই ঠাট্টায় রেগে গিয়েই গোপাল লালের মাথায় থিয়েটার খোলার মতলব এল।

অমৃতলাল বসু, দাশুচরণ নিয়োগী ও হরিপ্রসাদ বসু।

পুরনো স্টার থিয়েটার আবার সগৌরবে চলতে লাগল। গিরিশচন্দ্রের কয়েকখানা নাটক, পঞ্চরং ও গীতি নাট্যের অভিনয় হতে লাগল পরপর,– কমলে কামিনী, বৃষকেতু, হীরার ফুল, শ্রীবৎস-চিন্তা, চৈতন্যলীলা, প্রহ্লাদ চরিত্র, নিমাই সন্ন্যাস ইত্যাদি। এই সময়েই স্টার থিয়েটারে এসেছিলেন রামকৃষ্ণ পরমহংসদেব, বিদ্যাসাগর প্রমুখেরা। শ্রীরামকৃষ্ণের সঙ্গে বাংলা নাট্যের সম্পর্ক যেমন নিবিড়, তেমনি স্টার থিয়েটারের সঙ্গেও তার সম্পর্ক অচ্ছেদ্য। বলাই বাহুল্য বর্তমান স্টার থিয়েটারে রামকৃষ্ণদেব আগে আসেন নি, কেননা বর্তমান স্টার থিয়েটার প্রতিষ্ঠার আগেই, ১৮৮৬ সালে তিরোধান হয়েছিল তাঁর। নটী বিনোদিনীও এর কিছু আগে অভিনয় ছেড়ে দিয়ে সংসারজীবনে প্রবেশ করেছিলেন। তবু বাংলা নাটকের সঙ্গে শ্রীরামকৃষ্ণের সম্পর্কের মধ্যে দিয়েই বা পুরনো স্টারে তিনি যে এসেছিলেন, সেই অতীতই যেন কখন স্পর্শ করে ফেলে বর্তমান স্টারকেও। যেহেতু তাঁর ভাবশিষ্য গিরিশচন্দ্র তো বর্তমান স্টারেও অভিনয় করেছিলেন, যদিও তখন আজকের বাড়িটি ছিল না।

একটু পুরনো দিনে ফিরে যাই। স্টার থিয়েটারকে ঘিরে অনেক ইতিহাস জমে আছে বাঙালির মনে। সেই ইতিহাসের মূল কুশীলব শ্রীরামকৃষ্ণদেব, গিরিশচন্দ্র এবং বিনোদিনী। ২২ সেপ্টেম্বর ১৮৮৪, স্টার থিয়েটারে পরিপূর্ণ প্রেক্ষাগৃহে 'চৈতন্য লীলা'র অভিনয় হচ্ছে। রয়েল বক্সে বসে সশিষ্য শ্রীরামকৃষ্ণদেব অভিনয় দেখছেন। ভাবে বিভোর হয়ে চৈতন্য রূপিণী বিনোদিনী গাইছে–

'রাধা বই আর নাইক আমার
রাধা বলে বাজাই বাঁশী–'

গান শুনতে শুনতে পরমহংসদেব ভাব সমাধিস্থ। দুই গাল বেয়ে নেমেছে অশ্রুর ধারা। নাটক শেষ হলে গিরিশচন্দ্র আসেন ঠাকুরের কাছে। জিজ্ঞেস করেন– কেমন দেখছেন? ঠাকুর ধ্যান ভেঙে জেগে

শ্রীরামকৃষ্ণ : বাংলা নাটকের প্রেরণা

নাট্যাচার্য গিরিশ ঘোষ

ওঠেন–বড় ভালো নিকেছো গো। বড় ভালো নিকেছো। আসল নকল এক হয়ে গেছে। আর সেদিনই ঠাকুর বিনোদিনীকে আশীর্বাদ করলেন, মা, তোর চৈতন্য হোক।

কথার খেই ধরি আবার। গিরিশচন্দ্র বলেছেন : 'সংসার বৃহৎ রঙ্গালয়। নাট্যরঙ্গালয় তারই ক্ষুদ্র অনুকৃতি।' নাটকে ট্র্যাজেডি থাকে : ঠিক তেমনই এক ট্র্যাজেডি ঘনিয়ে এল পুরনো স্টার থিয়েটারে। কিন্তু সব বিপর্যয়ই বোধহয় নতুন সৃষ্টির বীজ বয়ে আনে। বিধান সরণীর স্টার থিয়েটারের ভিত্তির বীজও তেমনিভাবে লুকনো ছিল পুরনো স্টার থিয়েটারের বিপর্যয়ের মধ্যে 'রূপ সনাতন' নাটক অভিনয়ের সময়ে স্টার থিয়েটারে যা ঘটল, তা যেন কোন বিপ্লব। মতিলাল শীলের নাতি গোপাল লাল শীলের খেয়াল হল থিয়েটার খুলবেন। শোনা যায়, গোপাল লালের থিয়েটারের খেয়ালের মূলে নাকি ছিল অন্তর্জ্বালার ইতিহাস। গোপাল লালের রঙ ফর্সা ছিল না এবং তা নিয়ে স্টার থিয়েটারের কোন অভিনেত্রী নাটকে গানের মাধ্যমে ঠাট্টা করেছিল। সেই ঠাট্টায় রেগে গিয়েই গোপাল লালের মাথায় থিয়েটার খোলার মতলব এল। টাকার ভাবনা নেই তার। স্টার থিয়েটারের জমি কিনে ফেললেন গোপাললাল। থিয়েটারের বাড়ি সরিয়ে নেবার নোটিশ জারি করে দিলেন তিনি।

গিরিশচন্দ্রের পরামর্শে স্টার থিয়েটারের বাড়িখানা গোপাল লালের কাছে তিরিশ হাজার টাকায় বেচে দেওয়া হল। ইংরেজিতে একটা কথা আছে– গুড উইল, স্টার থিয়েটারের নাম তো সেই রকমই। অতএব নামটি ছেড়ে দিলেন না স্বত্বাধিকারীরা। হাতিবাগানে জমি কিনে নতুন করে স্টার থিয়েটার খুলবার আয়োজন চলতে লাগল। বর্তমান স্টার থিয়েটারের জন্মলগ্ন এসময়েই। আর পুরনো স্টার থিয়েটারের নতুন নাম এমারেল্ড থিয়েটার। পুরনো স্টার এখন আর নেই, ১৯২৭ সালে চিত্তরঞ্জন এ্যাভিনিউ তৈরির জন্য কর্পোরেশন সেটিকে ভেঙে ফেলে।

রঙ্গালয়ের জন্য গিরিশচন্দ্রের নিঃস্বার্থ দানের কথা এখানেই মনে পড়ে যায় আমাদের। নতুন স্টার থিয়েটার গড়ে উঠবার পিছনে তার অবদান অনস্বীকার্য। এমারেল্ড থিয়েটারে ম্যানেজার হিসেবে যোগ দিয়েছিলেন গিরিশচন্দ্র। গোপাললাল তাঁকে বিশ হাজার টাকা বোনাস ও সাড়ে তিনশ টাকা মাইনের প্রস্তাব দিয়েছিলেন। গিরিশচন্দ্রকে স্টারের লোকজন ছাড়তে রাজি নয়। গিরিশচন্দ্র বললেন–'বোনাসের টাকায় হাতিবাগানে নতুন স্টার থিয়েটারের বাড়ি তৈরির বিস্তর সুবিধা হবে।' বোনাসের টাকা থেকে ষোল হাজার টাকা তিনি দিয়ে দিয়েছিলেন হাতিবাগানে নতুন স্টার থিয়েটার গড়ে তুলবার জন্যে।

১৮৮৮, কর্নওয়ালিস স্ট্রীট, আজকের বিধান সরণীতে প্রতিষ্ঠিত হল নতুন স্টার থিয়েটার। নতুন স্টার থিয়েটারে প্রথম অভিনীত নাটক 'নসীরাম'। 'নসীরাম' গিরিশচন্দ্রের লেখা, কিন্তু বিজ্ঞাপনে সে সংবাদ ছিল না। স্টার থিয়েটারের

জন্য গোপনে 'নসীরাম' লিখে দিয়েছিলেন গিরিশ-চন্দ্র। ইতিমধ্যে গোপাললালের থিয়েটারের শখ মিটে গেল, তিনি এমারেল্ড থিয়েটার ইজারা দিয়ে দিলেন। গিরিশচন্দ্র এমারেল্ড ছেড়ে স্টারে চলে এলেন।

এই সময় গিরিশচন্দ্রের 'মলিনা বিকাশ' ও অমৃতলালের 'বাঞ্ছারাম' একসঙ্গে প্রথম অভিনীত হয়েছে স্টারে। তখন স্টার থিয়েটারের খুব একটা সুনাম নেই। ১৮৯০ সালের ৩০ সেপ্টেম্বর 'অনুসন্ধান' পত্রিকায় লেখা হয়েছে

এই ধরুন, স্টার থিয়েটারের স্ত্রীলোকদিগের বসিবার আসন সম্বন্ধে কতই কলংক-কেলেংকারীর কথা উঠিয়াছে। বেশ্যার সহিত ভদ্রঘরের মেয়ে-ছেলেদিগকে একত্রে বসিবার আসন দেওয়া, সে সব বেশ্যাকে আবার সেই ক্ষেত্রে মদ-না কি খাইতে দেওয়া—এসব কথা শুনিলে কি আর ভদ্রলোকের ঘরের স্ত্রী-কন্যা অভিনয় দেখিতে যাইবেন? সুতরাং যখন এ কথাটা উঠিয়াছে তখন যাহাতে তাহার সংস্কার হয়, কোম্পানির এরূপ করা উচিত।

বাইরে যখন স্টার থিয়েটার সম্পর্কে এমন দুর্নাম, ভিতরেও তখন শুরু হয়ে গেছে ছন্দপতন। স্টারের স্বত্বাধিকারীদের সঙ্গে গিরিশচন্দ্রের মনোমালিন্য। গিরিশচন্দ্রের 'মুকুল মুঞ্জরা' ও 'আবু হোসেন' তো স্টারে অভিনীত হলোই না উপরন্তু এই দুখানা নাটক পড়ে স্টার কর্তৃপক্ষ মন্তব্য করলেন, গিরিশচন্দ্র উন্মাদ হয়ে গেছেন। গিরিশ-চন্দ্রেরও তখন দুর্দশা চলছে। সাংসারিক বিভিন্ন শোকে তিনি তখন উন্মাদপ্রায় সত্যিই। দুটি কন্যার মৃত্যু, দ্বিতীয় পত্নীর মৃত্যু ও শিশুপুত্র রোগশয্যায়। নিয়মিত থিয়েটারে আসতে পারেন না তিনি। এরপর স্টার থেকে সত্যি সত্যিই বরখাস্ত হয়ে গেছেন গিরিশচন্দ্র। গিরিশচন্দ্র স্টার থেকে বরখাস্ত হবার পর পরই স্টার ছেড়ে চলে গেলেন নীলমাধব চক্রবর্তী, অঘোরনাথ পাঠক, প্রবোধচন্দ্র ঘোষ, শরৎ বন্দ্যোপাধ্যায় (রানুবাবু), দানীবাবু (গিরিশ-চন্দ্রের ছেলে), মানদা সুন্দরী, প্রমদাসুন্দরী প্রমুখ অভিনেতা, অভিনেত্রীরা। স্টার থিয়েটার এরপর নাট্যকার হিসেবে নিয়ে আসে রামকৃষ্ণ রায়কে।

স্টার ছেড়ে গিরিশচন্দ্র গিয়েছিলেন মিনার্ভায়। এর মধ্যে একটা মজার ব্যাপারও ঘটেছিল। মিনার্ভা থিয়েটার 'প্রফুল্ল' করবে, স্টার থিয়েটার ঠিক করল, একই সময়ে স্টারেও আবার 'প্রফুল্ল' হবে। একই সময়ে কাছাকাছি দুই থিয়েটারে একই 'প্রফুল্ল'-র অভিনয় আরম্ভ হল। মিনার্ভায় যোগেশ গিরিশচন্দ্র, স্টারে যোগেশ অমৃতলাল মিত্র। প্রতিদ্বন্দ্বিতায় সকলেই প্রায় গিরিশচন্দ্রকে জয়মাল্য পরিয়েছিলেন। কেউ কেউ বললেন—অমৃতলালই শ্রেষ্ঠ অভিনয় করেছেন। অমৃতলাল তাদের সবিনয়ে বলেছিলেন—'ও কথা মুখে আনবেন না মশাই। আমি তাঁকে প্রণাম করে রঙ্গমঞ্চে উঠি।' আসলে স্টার থিয়েটারের ইতিহাস মানেই এইসব নানা ঘটনা, কেননা নাটমঞ্চের তো স্বতন্ত্র অস্তিত্ব নেই, কুশীলবদের জীবনের নানা ঘাত-প্রতিঘাত, উত্তাপেই রঙ্গমঞ্চ বেঁচে থাকে।

গিরিশচন্দ্র এরপর আবার স্টারে এসেছিলেন। কিন্তু বেশিদিন থাকেন নি। তাঁর মনে হয়েছিল

রসরাজ অমৃতলাল
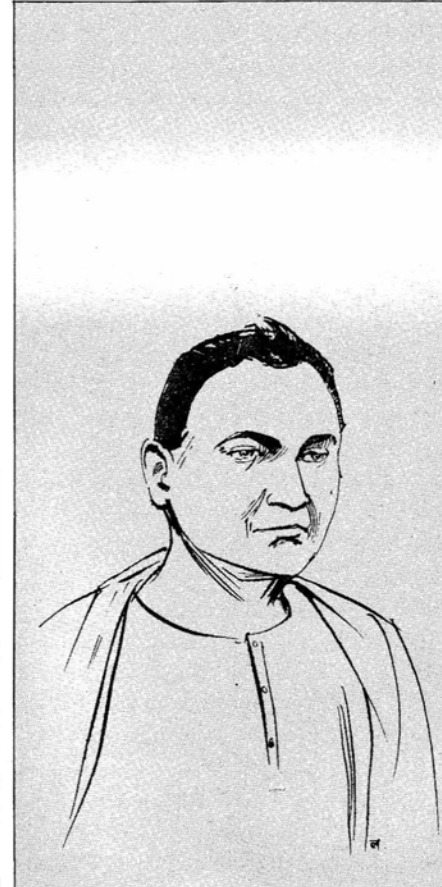
বাংলা নাটকের নতুন যুগের পুরোধা শিশির কুমার ভাদুড়ি

স্টার থিয়েটার প্রসঙ্গে বিশেষভাবে একজনের কথা আমাদের মনে পড়বেই। তিনি অমরেন্দ্রনাথ দত্ত। স্টার থিয়েটারের প্রথম নাটক 'নসীরাম', অমরেন্দ্রনাথ দেখেছিলেন তেরো বছর বয়সে। তারপরেই মনে মনে ঠিক হয়ে গেল, অভিনেতা হতে হবে।

স্টার কর্তৃপক্ষ তাঁকে যথাযথ মর্যাদা দিচ্ছে না। অতএব এবার গিরিশচন্দ্র নিজেই স্টার ছেড়ে দিলেন।

কিন্তু স্টার থিয়েটার মানে তো শুধুই গিরিশ-চন্দ্র নন। আরও অনেকেই আছেন। সতেরো বছর বয়সে অভিনয় জগতে এসেছিলেন অর্দ্ধেন্দু-শেখর মুস্তাফি। গিরিশচন্দ্র নিজেই বলেছেন '...অর্দ্ধেন্দু যে অংশ স্পর্শ করিতেন, তাহাই অননুকরণীয় হইত।' ১৯০৩ সালে অর্দ্ধেন্দু শেখর অভিনয় করেছেন স্টারে। ক্ষীরোদপ্রসাদের 'প্রতাপাদিত্য' নাটকের মহড়া চলছে। অভিনয় শেখানোর ভার অর্দ্ধেন্দু শেখরের ওপর। ১৫ই আগস্ট স্টারে 'প্রতাপাদিত্য' অভিনীত হল। অর্দ্ধেন্দুশেখর বিক্রমাদিত্য ও রডার ভূমিকায় অবতীর্ণ। দর্শকদের উচ্ছ্বসিত প্রশংসা পেলেন। সে সময় অর্দ্ধেন্দুশেখর মঞ্চে নামলেই দর্শকেরা আনন্দে উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠত।

স্টার থিয়েটার প্রসঙ্গে বিশেষভাবে একজনের কথা আমাদের মনে পড়বেই। তিনি অমরেন্দ্রনাথ দত্ত। স্টার থিয়েটারের প্রথম নাটক 'নসীরাম' অমরেন্দ্রনাথ দেখেছিলেন তেরো বছর বয়সে। তারপরেই মনে মনে ঠিক হয়ে গেল, অভিনেতা হতে হবে। স্টার থিয়েটারে 'চন্দ্রশেখর' নাটকে শৈবালিনীর ভূমিকায় তারাসুন্দরীকে দেখে মুগ্ধ হলেন অমরেন্দ্রনাথ। এই মুগ্ধতার ফল অনেকদূর গড়াল। বর্তমান স্টারে বিনোদিনী যদিও অভিনয় করেন নি, কিন্তু স্টারের মঞ্চ মাতিয়ে তুলেছিলেন তারাসুন্দরী। বাংলা নাটকের ইতিহাসে অবিস্মরণীয় হয়ে আছে তারাসুন্দরীর কয়েকটি অভিনয়—'দুর্গেশনন্দিনী'তে আয়েষা, 'চন্দ্রশেখর' এ শৈবালিনী, 'হরিশচন্দ্রে' শৈব্যা, 'রিজিয়া'তে রিজিয়া।

প্রথমদিকে স্টারে এসে অমরেন্দ্রনাথ মাত্র দু'মাস ছিলেন। প্রথম স্টারের মঞ্চে তাকে দেখা গেল 'চন্দ্রশেখর' নাটকে প্রতাপের ভূমিকায়। কিন্তু কিছুদিন পরে অমরেন্দ্রনাথ স্টারে ফিরে এলেন। ইতিমধ্যে প্রবল প্রতাপান্বিত স্টারের দরজা বন্ধ হয়ে গেছে। স্টারের কর্তৃপক্ষের সঙ্গে নতুন বন্দোবস্ত হল যে এবার থেকে স্টারের সম্পূর্ণ ভার নেবেন অমরেন্দ্রনাথ, কেবলমাত্র ভাড়া বাবদ অমরেন্দ্রনাথ প্রতি রাতের বিক্রির টাকা থেকে এক চতুর্থাংশ কমিশন দেবেন। এতকাল অমৃতলাল

বসু স্টারের ম্যানেজার ছিলেন, এখন থেকে অমৃতলাল হবেন নাট্যাচার্য এবং অমরেন্দ্রনাথ কর্মকর্তা। ১৯১১ সালের শেষ দিকে অমরেন্দ্রনাথের অধিনায়কত্বে স্টার প্রথম খুলল, সেদিন অভিনয় আরম্ভ হবার আগে অমৃতলাল বসু রঙ্গমঞ্চ থেকে দর্শকবৃন্দের উদ্দেশ্যে বললেন অমরবাবুই এখন নাট্যজগতে যোগ্য ও যথার্থ উপযুক্ত পরিচালক। তাঁহার মত থিয়েটার পরিচালনের শক্তি আর কারো নাই। তাঁর মতন লোকের হাতে স্টার থিয়েটারের ভার দিতে পেরে ভগবানকে অসংখ্য ধন্যবাদ জানাই।

স্টার থিয়েটার আবার সগৌরবে চলতে লাগল। এরপর ১৯১৫ সালের ১২ ডিসেম্বর স্টারে ঘটল মর্মান্তিক ঘটনা। সেদিন 'সাজাহান' অভিনীত হবে। ঔরংজেব সাজবেন অমরেন্দ্রনাথ। থিয়েটারে প্রচণ্ড ভিড় হয়েছে। শরীর অসুস্থ থাকা সত্ত্বেও অমরেন্দ্রনাথ সেদিন দর্শকদের নিরাশ করতে চাইলেন না। ঔরংজেবের ভূমিকায় অভিনয় করতে করতে তৃতীয় অংক শেষ হবার আগেই তাঁর মুখ দিয়ে রক্ত উঠতে লাগল। আর অভিনয় করতে পারলেন না তিনি। স্টারের মঞ্চে ঔরংজেবের অসমাপ্ত ভূমিকাই অমরেন্দ্রনাথের শেষ অভিনয় হয়ে রইল।

অমরেন্দ্রনাথের মৃত্যুর পর কয়েক বছরের মধ্যে স্টার থিয়েটারে কয়েকবার কর্তাবদল হল। ১৯২০ সালে স্টার থিয়েটার ইজারা নিয়ে চালাতে শুরু করলেন অপরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়। তাঁকে সাহায্য করেন প্রবোধচন্দ্র গুহ ও তারাসুন্দরী।

১৯২১ সালের গোড়ায় স্টার থিয়েটারের দিকে তাকালে বাংলা নাটকের দৈন্যদশা প্রকট হবে। কোন সৃজনধর্মী নাট্যশিল্পী নেই। দানীবাবু তখন সবচেয়ে বড় অভিনেতা, কিন্তু তিনিও সময়ের নিরিখে পুরনো হয়ে গেছেন।

এই সময়েই 'আর্ট থিয়েটার লিমিটেড' নামে নতুন একটি কোম্পানির জন্ম হল। অপরেশচন্দ্র ও প্রবোধচন্দ্রের উদ্যোগেই এই নতুন কোম্পানির জন্ম। স্টার থিয়েটারের স্বত্ব আর সাজ সরঞ্জাম এই লিমিটেড কোম্পানি কিনে নিল পঞ্চাশ হাজার টাকায়। এই কোম্পানিতে চাকরি পেলেন অপরেশচন্দ্র ও প্রবোধচন্দ্র। ১৯২৩ সালের ৩০ জুন, স্টারের মঞ্চ আবার পাদ প্রদীপের আলোয় নতুন ঔজ্জ্বল্যে জ্বলে উঠল। নাটকের নাম 'কর্ণার্জুন'। 'কর্ণার্জুন' নাটকেই স্টারের মঞ্চে দেখা দিলেন পরবর্তীকালে খ্যাত নতুন তরুণ অভিনেতা– তিনকড়ি চক্রবর্তী, অহীন্দ্র চৌধুরী, ইন্দুভূষণ মুখোপাধ্যায়, দুর্গাদাস বন্দ্যোপাধ্যায়।

বাংলা নাটকের যে নতুন যুগ শুরু হল এসময়ে তার পুরোধা শিশিরকুমার ভাদুড়ি। সম্ভবত ১৯৩০ সালেই শিশিরকুমার আর্ট থিয়েটারে যোগ দিয়ে স্টারের মঞ্চে নতুন প্রাণের জোয়ার নিয়ে এলেন। স্টারের মঞ্চে শিশির কুমার নতুন দুটি ভূমিকায় অভিনয় করলেন–'মন্ত্রশক্তি'তে মৃগাংক এবং 'কর্ণার্জুন'-এ কর্ণ। ১৯৩০ সালের জুলাই মাসের 'নবশক্তি'তে লিখেছে–'শিশিরকুমার আজকাল নিয়মিতভাবে তাঁর সম্প্রদায়ের কয়েকজন নট-নটীর সঙ্গে স্টারের

অর্দ্ধেন্দু শেখর মুস্তাফি

তারাসুন্দরী

নাট্যমন্দির বন্ধ হয়ে যাবার ফলেই শিশিরকুমার আর্ট থিয়েটারে যোগ দিয়ে স্টারে চলে এসেছিলেন। এরপর শিশিরকুমার আমেরিকায় চলে গেলেন।

স্টার থেকে আর্ট থিয়েটারকেও একদিন বিদায় নিতে হল। আর্ট থিয়েটার উঠে যাবার পর স্টারের মঞ্চে অল্প সময়ের জন্য নাট্যকুঞ্জ নামে একটি নতুন দল অভিনয় করেছিল। তারপর ১৯৩৩ সালের শেষের দিকে খবর বেরুল 'আগামী ২৭ ডিসেম্বর হইতে স্টার বোর্ড ভাড়া লইয়া বর্তমান বাংলার নটগুরু শিশিরকুমার ভাদুড়ি মাত্র এক সপ্তাহের জন্য নাট্য মন্দিরের পুনঃপ্রতিষ্ঠা করিবেন।' ১৯৩৩ সালের ২৭ ডিসেম্বর থেকে ৩১ ডিসেম্বর পর্যন্ত সবই পুরনো নাটক। 'রমা'য় গোবিন্দ গাঙ্গুলি ছাড়া সবই শিশিরকুমারের পুরনো ভূমিকা। ১৯৩৪ সালের ১৯ জানুয়ারি স্টারে শিশিরকুমার নতুন নাটক খুললেন–'অভিমানিনী'। কয়েক সপ্তাহ পর ছোটদের জন্য নাটক 'ফুলের আয়না'। ১৯৩৪ সালের এপ্রিলে নাট্য মন্দিরের

ব্যাপারে স্টারের মঞ্চ আবার সরগরম করে তুললেন শিশিরকুমার।

১৯৩৪ সালের ২৮ জুলাই স্টারে শুরু হল শরৎচন্দ্রের 'বিরাজ বৌ'। শিশিরকুমার নীলাম্বর।

এরপর ১৯৩৪-এর ২৭ সেপ্টেম্বর খোলা হল 'সরমা'। শিশিরকুমার রাবণ। ২৪ নভেম্বর থেকে শুরু হল 'দশের দাবী'। শিশিরকুমার দয়াল। আর ২২ ডিসেম্বর 'বিজয়া'। শিশিরকুমার রাসবিহারী। এরপর স্টারে একের পর এক অভিনয় চলল। শিশিরকুমারই তখন স্টারের তারকা। ১৯৩৬ সালের ২৪শে ডিসেম্বর শুরু হল রবীন্দ্রনাথের 'যোগাযোগ'। শিশিরকুমার মধুসূদনের ভূমিকায়। কিন্তু বিপর্যয় ঘটল ১৯৩৭-এর মাঝামাঝি সময়ে। নব-নাট্যমন্দির বন্ধ হয়ে গেল। স্টার হারালো শিশিরকুমারের মত নাট্যজগতের উজ্জ্বল মণিকে। নব-নাট্যমন্দির বন্ধ হয়ে যাবার পর ঘুরে ঘুরে এখানে ওখানে অভিনয় করেছেন শিশিরকুমার। ১৯৪১-এ প্রতিষ্ঠা করলেন শ্রীরঙ্গম নাট্যশালা।

বর্তমানে স্টার থিয়েটারের স্বত্বাধিকারী শ্রীরঞ্জিতমল কাংকারিয়া। স্টার থিয়েটারের একটি অধ্যায় শেষ হয়ে গেছে শিশিরকুমারের সঙ্গে সঙ্গেই। শিশিরকুমারের পরেও স্টারের মঞ্চে অভিনয় করেছেন বাংলার বিখ্যাত অভিনেতা ও অভিনেত্রীরা। গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, মহেন্দ্র গুপ্ত, পাহাড়ি সান্যাল, উত্তমকুমার, কানু বন্দ্যোপাধ্যায়, কালী বন্দ্যোপাধ্যায়, সাবিত্রী চট্টোপাধ্যায়, মলিনা দেবী, প্রভা দেবী প্রমুখ। বর্তমানে সুপ্রিয়া দেবী অভিনয় করছেন 'বালুচরী' নাটকে। আজকের স্টার থিয়েটারে পেশাদারী নাটকের সঙ্গে সঙ্গে অভিনীত হচ্ছে বিভিন্ন রিক্রিয়েশন ক্লাবের অনুষ্ঠান। কিন্তু বাংলাদেশের নাট্যধারা থেকে স্টার যেন আজ বিচ্ছিন্ন। শিশিরকুমারের সময় পর্যন্ত স্টার থিয়েটার বাংলার নাট্য ঐতিহ্যের সঙ্গে মিলেমিশে ছিল। ব্যবসায়িক থিয়েটার গ্রাস করেছে নাটকের প্রাণ। অভিনেতা অভিনেত্রীদের সঙ্গে পারস্পরিক যোগাযোগ আর নেই। তারা বাঁধা মাইনেয় সময় মত এসে অভিনয়টুকু করে যান। তবু স্টার থিয়েটার ঐতিহ্যগতভাবে এখনও যে গিরিশচন্দ্র, শিশিরকুমারের সঙ্গে জড়িত, তার প্রমাণ বোধহয় এটুকুই যে ব্যবসার প্রয়োজনে স্টার এখনও ক্যাবারে নাচের মঞ্চ হয়ে ওঠেনি।

আগামী ১৯৮৮ তেই স্টার থিয়েটারের শতবর্ষ পূর্ণ হবে। স্টার থিয়েটারের দীর্ঘ পথ পরিক্রমায় বহু নট-নটীর প্রবেশ প্রস্থান ঘটেছে, বহু দল গড়েছে ভেঙেছে, বহুবার এই রঙ্গালয়ের বাতি জ্বলেছে নিভেছে, স্মৃতি এবং কিংবদন্তী ছড়ানো সেই কালের পুতুলদের কাহিনী উদ্ধার হবে কোন দিন। স্টার থিয়েটার সেইসব জীবন নাট্যের রঙ্গমঞ্চ হিসেবেই বেঁচে থাকবে। কেননা অভিনেতার বুকের রক্তেই একদিন স্টারের মঞ্চে লেখা হয়েছিল শিল্পের স্বাক্ষর।

ছবি: কল্যাণ চক্রবর্তি

নেতাজীকে আর কতবার কলংকিত করা হবে ?

অমল আল্লানার 'রাজ সে স্বরাজ' নিয়ে সর্বত্র চলছে তুমুল বিতর্ক, কেন্দ্রিয় তথ্যমন্ত্রী সংসদে ক্ষমা চেয়েছেন। সত্যি কি নেতাজী এবং আই. এন. এ কে অপমান করার জন্যই এই দূরদর্শন ধারাবাহিক ? এর আগে কে কতবার, কিভাবে নেতাজীকে কলঙ্কিত করার অপ-চেষ্টা করেছেন ? নেতাজী রিসার্চ ব্যুরো, আই.এন.এ.র নায়করা এবং বসু পরিবারের সঙ্গে কথা বলে এক চাঞ্চল্যকর পশ্চাদপটের দিকে রমাপ্রসাদ ঘোষালের আলোকপাত।

৬ নভেম্বর ১৯৮৬। বৃহস্পতিবারের বারবেলায় কেন্দ্রিয় তথ্য ও বেতার মন্ত্রী অজিত পাঁজা জমজমাট রাজ্যসভায় দাঁড়িয়ে মাইক্রোফোন টেনে নিয়ে বললেন, দূরদর্শনে কোন সিরিয়াল গৃহীত হওয়ার পদ্ধতি হল, প্রথমে কাহিনীটি সামগ্রিকভাবে অনুমোদিত হয়। পরে ১৩ টি এপিসোডে বিশদভাবে অনুমোদন পায়। এখন প্রযোজককে প্রাথমিক অংশটি দেখাবার নির্দেশ দেওয়া হয়, একে বলে 'পাইলট'। দূরদর্শন কতৃপক্ষ এই পাইলটটি অনুমোদন করে। 'রাজ সে স্বরাজ' এর প্রযোজক হলেন বিশিষ্ট নাট্যশিল্পী ডঃ নিসার আল্লানা। এক্ষেত্রে সমস্ত নিয়মকানুন মেনে নেওয়া হয়েছিল। ডঃ নিসার আল্লানা দূরদর্শন কর্তৃপক্ষকে বলেছিলেন, তিনি এই সিরিয়াল তৈরির জন্য দস্তুরমত গবেষণা করেছেন এবং আই এন এ-র সঙ্গে যুক্ত ব্যক্তিদের সঙ্গে পরামর্শ করেছেন। আই এন এ-তে অংশটি দেখানোর পর অভিযোগ আসে যে, নেতাজী চরিত্র সঠিক ভাবে উপস্থাপিত করা হয়নি। বরং বিকৃত করা হয়েছে এমনভাবে, যাতে মনে হয়েছে জাতীয় নেতা নেতাজী সুভাষ চন্দ্র বসুকে কলংকিত করা হয়েছে। সিরিয়ালটিতে দেখানো হয়েছে সহকর্মীদের কিছু সুখবর দেওয়ার পর নেতাজী সুভাষ ড্রিংকস আনতে বলেন। যখন নেতাজী দেখলেন কর্ণেল ধীলন ফলের রস পান করছেন তিনি তখন বিস্ময়ের সঙ্গে তাঁকে প্রশ্ন করেন, ফলের রস খাচ্ছেন কেন ? কর্ণেল ধীলন উত্তর দেন, যতদিন না আমাদের দেশ স্বাধীন হচ্ছে, ততদিন আমি মদ্যপান করব না। নেতাজী বলেন, ব্রেভো। এরপরেই সিরিয়ালে দেখা যায়, ওয়েটার নেতাজী ও লক্ষ্মী স্বামীনাথনকে বিভিন্ন ধরনের পানীয় বিতরণ করছে।

এই অংশটি দেখার পর অনেকের মনে হয়েছে, নেতাজী মদ্যপান করছেন এবং মদ্যপান করতে উৎসাহ দিচ্ছেন। নেতাজীকে সঠিকভাবে দেখানো হয়নি। এই ঘটনার জন্য দূরদর্শন কর্তৃপক্ষ দুঃখপ্রকাশ করেছেন। সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে, ভবিষ্যতে এই অংশটি বাদ দিয়েই সিরিয়ালটি দেখানো হবে। দূরদর্শনকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, 'ভবিষ্যতে কোন জাতীয় নেতার চরিত্র–চিত্রায়ণে বিশেষ যত্ন নেওয়া হবে। এই বস্তুনিষ্ঠতার সমস্ত দায়িত্বই প্রয়োজকের।'

গুজরাট থেকে নির্বাচিত কংগ্রেস সদস্য মির্জা ইরশাদ বেগই বিষয়টি প্রথম সংসদে তোলেন। রাজ্যসভায় নেতাজীকে বিকৃত করার বিতর্ক-প্রশ্নটির জের আছড়ে পড়ে লোকসভায়। সারা ভারত যুব কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদিকা এবং পশ্চিমবঙ্গের যাদবপুর লোকসভা কেন্দ্র থেকে নির্বাচিত সদস্যা ডঃ মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ওই একই সময়ে জিরো আওয়ারের সুযোগে লোকসভায় 'রাজ সে স্বরাজ' বির্তক তোলেন। দোষীদের শাস্তির দাবি করেন ফরোয়ার্ড ব্লকের এম.পি. অমর রায়প্রধান। পশ্চিমবঙ্গের জনমানসে এই বিতর্কের ঢেউ তোলেন বিশিষ্ট সাংবাদিক পদ্মশ্রী অমিতাভ

কংগ্রেসী মন্ত্রী অজিত পাঁজা

চৌধুরী। নভেম্বরের শুরুতে যুগান্তর পত্রিকায় এক চিঠির মাধ্যমে তিনি বিষয়ের বিতর্ক অবতারণা করেন, এরপরই পশ্চিমবঙ্গ জনতা পার্টি সুভাষ সংস্কৃতি পরিষদ এবং যুব লীগ বিষয়টি নিয়ে তুমুল বিক্ষোভের সূচনা করে।

অমল আল্লানার দূরদর্শন ধারাবাহিক 'রাজ সে স্বরাজ' এ প্রকৃতপক্ষে নেতাজী এবং আই.এন.এ.-কে আরও কুৎসিত ভাবে আঁকা হয়েছে। অকটোবর মাসে ৬ তারিখে প্রদর্শিত একটি অংশে দেখানো হয়েছে নেতাজী বর্মা রণাঙ্গনে সিঙ্গাপুর ক্লাবে ঝাঁন্সী ব্রিগেডের নেত্রী ক্যাপ্টেন লক্ষ্মী স্বামীনাথনের সঙ্গে মদ্যপান করছেন। আই এন এ-এর সহকর্মীদের মদ্যপানে উৎসাহিত করছেন, এমন কি যেন মদ খেয়ে মাতাল হয়ে তিনি নাচছেন। দৃশ্যটিতে নেতাজীকে পুরোপুরি ভাঁড় সাজানো হয়েছে। নেতাজীর উচ্চতা ছিল ৬ ফুট এবং চেহারা ছিল বলিষ্ঠ। এখানে দোহারা চেহারার একটি বেঁটেখাটো মানুষকে নেতাজীর ভূমিকায় নামানো হয়েছে। ঘটনা ঘটে গ্যাডগিল তথ্যমন্ত্রী থাকার সময়। ওই সময়ই ছবিটি অনুমোদিত হয়। আশ্চর্যের বিষয় তখন তথ্য দপ্তরের সচিব ছিলেন গণেশ নারায়ন মেহতা এবং দূরদর্শন অধিকর্তা ছিলেন ভাস্কর ঘোষ। আজও তাঁরা আছেন। এবং ক্ষমা চেয়ে পার পেয়ে গেছেন। ১৯৪৭ সালের ১৫ আগস্ট পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু লালকেল্লায় যে কথাটি বলে প্রথম স্বাধীন ভারতের পতাকা উত্তোলন করেন, সেই 'জয়হিন্দ' কথাটি নেতাজী সুভাষ চন্দ্র বসু প্রথম কলকাতার কংগ্রেস অধিবেশনে নেতাদের গার্ড অব অনারের সময় উচ্চারণ করেন। পরবর্তী কালে ওই একটি শব্দের মোহময় উচ্চারণে আই এন এ বাহিনীর হিন্দু, মুসলমান, শিখ, সব ধর্মের সৈনিকরা নির্ভয়ে গুলির মুখে বুক পেতে দিয়েছেন। সেই 'মিলিটারি জিনিয়াস' স্বদেশ যোদ্ধার চরিত্র হননের অপচেষ্টা অনেকবারই আমাদের দেশে হয়েছে।

১৯৪৩ সালে প্রথম নেতাজীর চরিত্র হনন করে অবিভক্ত কমিউনিস্ট পারটির দলীয় মুখপত্র 'জনযুদ্ধ' পত্রিকার প্রথম পাতায় আঁকা হয় একটি অবমাননাকর কার্টুন। তাতে দেখানো হয়, রেডিওর মাইক্রোফোনের সামনে জাপানী দেশনায়ক জেনারেল তোজো একটি কুকুরের ঘাড় ধরে তাকে দিয়ে কিছু বলাচ্ছেন। কুকুরের মুখটিতে বসানো হয়েছিল নেতাজীর মুখ। নেতাজীকে তোজোর কুকুর বলা কমিউনিস্ট পারটির সেক্রেটারি পি সি যোশী ১৯৪৮ সালে বলেছিলেন, 'সুভাষ বোস যদি ফিরে আসে, আমরা তাকে ফুলমালার পরিবর্তে বন্দুকের বেয়নেট দিয়ে বরণ করব।' পরবর্তী পর্যায়ে নেতাজী চরিত্রে কলংক আরোপ করা হয় নেতাজীর বিবাহ বিতর্ক তুলে। এরপর মাঝে মধ্যেই হিড়িক পড়ে নেতাজী আগমন ঘোষণার। শৌলমারির সাধু, রোটিবাবা, ফৈজাবাদের সাধু—এভাবে মাঝে মধ্যে খবরের কাগজ মারফৎ জনসাধারণকে স্টান্ট দেওয়া হতে থাকে। এ পর্যায়ের সর্বশ্রেষ্ঠ বিতর্কটি তোলেন প্রাক্তন লোকসভা সদস্য সমর গুহ। আনন্দবাজার পত্রিকায় তিনি সুপারইম্পোজ করা একটি ছবি প্রকাশ করে বলেন, ইনিই নেতাজী। তখন তিনি সংসদ সদস্য। কংগ্রেসকর্মীরা অবশ্য তাঁর পদত্যাগ দাবি করেন। পরে বিষয়টি ধামা চাপা পড়ে যায়। তবে নেতাজী সুভাষকে মর্মান্তিক অপমান করেন ভারত সরকারের প্রতিরক্ষা মন্ত্রক। পণ্ডিত নেহরু প্রধানমন্ত্রী থাকার সময় ভারতবর্ষের সমস্ত সেনাব্যারাক এবং সেনাছাউনিতে জারি করা হয় এক চাঞ্চল্যকর নিষেধাজ্ঞা। তাতে বলা হয়, কোন ব্যারাকে বা ছাউনিতে নেতাজী সুভাষ বোসের ছবি টাঙানো চলবে না।

চলতি বছরের ৫ নভেম্বর সি পি আই এর গুরুদাস দাশগুপ্ত রাজ্যসভায় ওই অপমানকর নিষেধাজ্ঞা বাতিলের দাবি করেন। অবশ্য অতীতে জনতা পারটির সংসদ সদস্য সমর গুহ আগেই এ দাবি তুলেছিলেন। এবং তাঁরই চেষ্টায় সংসদের সেন্ট্রাল হলে জনতা সরকার নেতাজীর প্রতিকৃতি রাখার ব্যবস্থা করে।

ভাস্কর ঘোষ
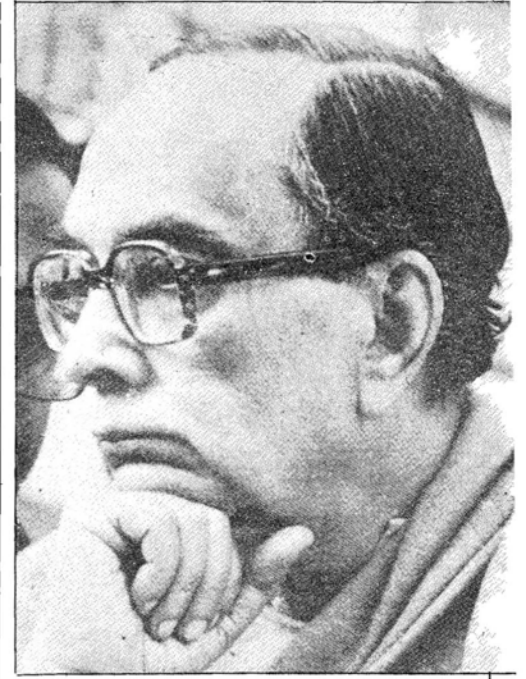
ডঃ শিশির বসু

নেতাজীর নাম নিয়ে সাম্প্রতিক বিতর্কিত কাজটি করেন তাঁরই ভ্রাতুষ্পুত্র ও সহকর্মী ডঃ শিশির বসু। সাধারণ ভাবে নেতাজীর ইমেজ সব রকম রাজনৈতিক কচকচির বাইরে। তবু বিতাড়িত কংগ্রেস নেতা প্রণব মুখার্জি ও তাঁর অনুগামী ডঃ শিশির বসু কংগ্রেস থেকে বেরিয়ে নিজ সমর্থকদের নিয়ে যে রাজ্য পর্যায়ের দল গড়লেন তার নাম রাখলেন জাতীয় কংগ্রেস (সুভাষ-ইন্দিরা)। এরপরেই ইন্দিরাপন্থী যুব ফোরামের আহ্বায়ক প্রণবপন্থী সুখেন্দু রায় প্রকাশ্যে বিবৃতি দিয়ে বললেন, 'দলীয় রাজনীতির মধ্যে এত ছোট পরিবেশে নেতাজী সুভাষ চন্দ্র বসু কে না নামালেই ভাল করতেন ডঃ শিশির বসু। নেতাজীকে আমরা ততটাই শ্রদ্ধা করি, ভালবাসি, যতটা শহীদ ক্ষুদিরাম। কিন্তু তাই বলে ক্ষুদিরাম বা প্রফুল্ল চাকীর নামে রাজনৈতিক দল বানানো খুব সুবুদ্ধির পরিচয় দেয় না। আমরা রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে ভালবাসি, শ্রদ্ধা করি। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের নামে দল করব একথা ভাবতে পারি না। আমাদের দলে এভাবে নেতাজীর নাম ব্যবহার না করলেই ভাল করতেন নেতারা।'

৪ নভেম্বর মঙ্গলবার, কলকাতা দূরদর্শন কেন্দ্রের সামনে 'রাজ সে স্বরাজ' বিতর্কের জেরে নেতাজী সুভাষ চন্দ্র বসুর চরিত্র হননের বিরুদ্ধে রাজ্য জনতা পার্টি এবং পশ্চিমবঙ্গ যুবলীগ সমর্থকরা বিক্ষোভে ফেটে পড়েন। পুলিশের সঙ্গে সংঘর্ষে দশ জন জখম হন। গলফগ্রিনের দূরদর্শন অফিস ভাঙচুর হয়। ইঁট পাটকেলের ঘায়ে তিনজন পুলিশ জখম হন। প্রায় দশ হাজার বিক্ষুব্ধ জনতা জবরদস্তি করে অফিসের মধ্যে ঢুকতে চায়। তাদের হাতে ছিল, নেতাজীর ছবি সমন্বিত কেন্দ্রবিরোধী স্লোগানের প্ল্যাকার্ড। তারা 'রাজ সে স্বরাজ' এর

৪৮ পৃষ্ঠায় দেখুন

সোনিয়া গান্ধী রাজনীতিতে নামছেন ?

শ্রীমতী সোনিয়া গান্ধী কি অচিরেই ভারতীয় রাজনীতিতে আসছেন ? এযাবৎ রহস্যমণ্ডিত ও বিতর্কিত চরিত্রটিকে নিয়ে দীপ বসুর প্রতিবেদন।

ইতালির তুরিণ থেকে নয়াদিল্লি। কেমব্রিজের পার্কারস পিস্, জেসাস গ্রীণ থেকে মধ্যপ্রদেশের বস্তার জেলা বা ওড়িশার প্রত্যন্ত গ্রাম অনেকটাই দূরের পথ। ১৯৮৪–র ৩০ অকটোবরের আগে এই সোনিয়া নামটিও সাধারণ্যে ছিল অপরিচিত। তারপর থেকে দূরদর্শনের ক্যামেরা অনেকবার ছুঁয়ে গেছে তার মুখ। সংবাদপত্রের পাতায় ধীরে ধীরে পরিচিত হয়ে গেছেন সোনিয়া গান্ধী। ইন্দিরা পরিবারের কনিষ্ঠ পুত্রবধু মেনকার মত কোনও হঠাৎ আলোর ঝলকানি নিয়ে রাজনীতিতে যদিও এখন পর্যন্ত আসেননি, সোনিয়ার রাজনৈতিক সম্ভাবনা কিন্তু ক্রমেই প্রকট হয়ে উঠছে।

দিল্লির রাজনৈতিক মহল থেকে জানান হয়েছে সোনিয়া অবিলম্বেই রাজনীতিতে আসছেন। দিনক্ষণ ঠিকঠাক, এবং এটা এখন শুধু নির্ভর করে আছে রাজীব গান্ধীর সর্ব্বোচ্চ সিদ্ধান্তের ওপর। নেপথ্যে যে ব্যাপারটা ঘটছে তা হ'ল কংগ্রেসের একটি গোষ্ঠী চাইছেন সোনিয়াকে রাজনীতিতে এনে একটি জবরদস্ত লবি তৈরি করে ফেলতে। কারণ কংগ্রেসের হাইকমাণ্ড বলতে ইদানীং কি বোঝায় সেটা নিয়ে এই শীতের দিল্লিতেও কোনও ধোঁয়াশার অবকাশ নেই।

সোনিয়াকে কংগ্রেসে কোনও বড়দরের পদ দেবার আর্জি জানিয়ে বিভিন্ন রাজ্যের প্রদেশ কংগ্রেস কমিটিগুলি থেকে বেশ কিছুদিন ধরেই দাবি উঠছে। পশ্চিমবঙ্গের ব্যারাকপুর থেকে নির্বাচিত লোকসভার সদস্য দেবী ঘোষালের নেতৃত্বে একদল কংগ্রেস নেতা হাইকমাণ্ডের কাছে দাবি রাখেন এ ব্যাপারে। অকটোবর মাসের প্রথম সপ্তাহে দিল্লি প্রদেশ কংগ্রেসের শ্রমিক সেল সোনিয়া গান্ধীকে কংগ্রেসের সভাপতি করার আর্জি জানান। এর পরই উত্তরপ্রদেশের কংগ্রেস নেতা, প্রাক্তন বিধানসভা সদস্য ভাস্কর পাণ্ডের নেতৃত্বে কিছু কংগ্রেসী, সোনিয়াকে কংগ্রেস সভাপতি পদে নির্বাচনের পক্ষে বেশ বড়রকমের ক্যাম্পেইনিং চালান।

ইদানীং কংগ্রেসের কার্যনির্বাহী সভাপতি কমলাপতি ত্রিপাঠী পদত্যাগ করেছেন, সহ সভাপতি অর্জুন সিংও মন্ত্রীসভার পদ পেয়ে ছেড়েছেন দলীয় পদ। প্রধানমন্ত্রীর ডান হাত বলে যাকে মনে করা হত সেই অরুণ নেহরুর সৌভাগ্য-সূর্যও অস্তাচলে। এ অবস্থায় রাজীব গান্ধীর একান্ত ঘনিষ্ঠ কেউ দলের মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ পদে থাকাটাই স্বাভাবিক। আর এক্ষেত্রে সর্বাধিক সম্ভাবনাময় সোনিয়াই।

দূরদর্শন এবং সংবাদপত্রের পাতায় রাজীবের ইমেজ বিল্ডিং–এর কাজটি ঘটেছে খুব তাড়াতাড়ি। রাজীব কেরল থেকে পশ্চিমবঙ্গ, রাজস্থান থেকে ওড়িশা সর্বত্রই এখন ঝটিকা সফর চালিয়ে যাচ্ছেন। তদুপরি সুনিয়মিত বিদেশ সফর। সবত্রই সোনিয়া সঙ্গিনী। কখনও তিনি বস্তারের আদিবাসীদের সঙ্গে সম্মিলিত নাচে অংশ নিচ্ছেন, কখনও রাজীবের হাত ধরে ওড়িশার গ্রামে কর্দমাক্ত পথ পার হচ্ছেন, এ সবই টাটকা ভেসে আসছে দূরদর্শনের জনপ্রিয় পর্দায়, কিংবা সংবাদপত্র–সাময়িকীর পাতায় পাতায়। ইদানিং সোনিয়া 'সার্ক' রাষ্ট্রপ্রধানদের ব্যাঙ্গালোরে সম্মিলন যেখানে।

দীর্ঘ ১৫ বছর ধরে প্রধানমন্ত্রীর বাসভবনের

(৪০ পৃষ্ঠায় দেখুন)

তুষার চিতার সন্ধানে

চার ফুট লম্বা একটি 'স্টিক' হাতে জ্যাকসন অনেকক্ষণ ধরে সেই মুহূর্তটির জন্যই অপেক্ষা করে ছিলেন–যখন জালবন্দী একটি তুষার চিতাকে তিনি ইনজেক্‌শন দিয়ে অচেতন করতে পারবেন। স্টিক-টির অপর প্রান্তে ছিল চিতাটিকে অজ্ঞান করার ইনজেক্‌শনের সিরিঞ্জ। কিন্তু এই দুর্লভ জন্তুটিকে শিকার করা জ্যাকসনের উদ্দেশ্য ছিল না। তাকে অজ্ঞান করে সাময়িক ভাবে নিজের বশে আনাই ছিল তাঁর অভিপ্রায়।

'স্নো লেপার্ড, বাংলায় যা তুষার চিতা কিংবা হিম চিতা–স্থানীয় নেপালী অধিবাসীদের কাছে তা 'সাবু' নামে পরিচিত। জ্যাকসনের জালে বন্দী এই চিতাটি বয়সের ভারে বৃদ্ধ একটি পুরুষ চিতা। মানুষ নামক সম্পূর্ণ অপরিচিত জীবটির এই অদ্ভুত খামখেয়ালির সাথে সহযোগিতা করার কোনওরকম ইচ্ছাই তার ছিল না। তাই হিমালয়ের ১৪,৪৭৫ ফুট উঁচুতে তাদের নিজস্ব বিচরণক্ষেত্রে মানুষের এই অনধিকার প্রবেশে সে একরকম ক্ষুব্ধই হয়েছিল। বড় বড় হিমশীতল চোখ দুটো তুলে সে জ্যাকসনের দিকে তাকাতেই সারা শরীর ঠাণ্ডা হয়ে যায় জ্যাকসনের। হতভম্বের মত কিছুক্ষণ তিনি সেখানেই দাঁড়িয়ে থাকেন। তার-পর কিছু একটা মাথায় আসতেই তিনি তার সঙ্গী, স্থানীয় শেরপা লোপসাংকে জালের অপরদিক থেকে চিতাটির কাছে যেতে বলেন। এতক্ষণ চিতাটির দৃষ্টি ছিল জ্যাকসনের উপরই নিবদ্ধ–

তুষার চিতা অর্থাৎ স্নো লেপার্ড–দুর্লভ এই জন্তুটির ঘাঁটি হিমালয়ের ১৪,৪৭৫ ফুট উঁচুতে। অভিযাত্রী রডনি জ্যাকসনের দু:সাহসিক অভিযান বরফের রাজ্য থেকে তুলে এনেছে এই অনন্য জীবটি সম্পর্কে অনেক অজানা তথ্য। সেই অভিযানেরই পরিপ্রেক্ষিতে বর্তমান প্রতিবেদনটি পেশ করেছেন আমাদের প্রতিনিধি।
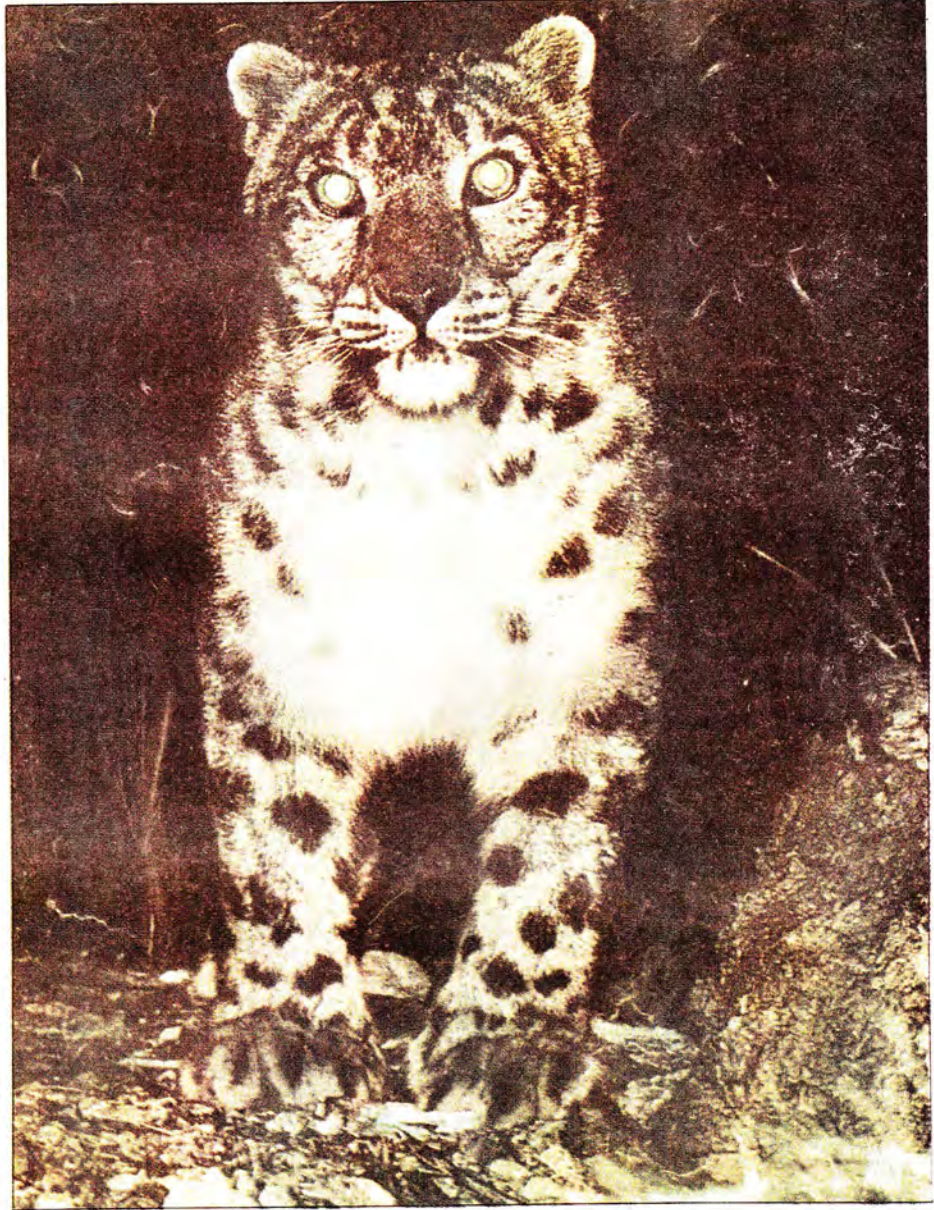
দুর্লভ পাহাড়ি জন্তু তুষার চিতা, মানুষ যার কাছে অপরিচিত

কিন্তু লোপসাং জালের অপর প্রান্তে গিয়ে একটি আওয়াজ করতেই তার দৃষ্টি সরে যায় লোপসাং-এর দিকে। জ্যাকসনও এক মুহূর্ত দেরী না করে ইনজেক্‌শনের ছুঁচটি বিঁধিয়ে দেন চিতাটির শরীরে।

কিছুক্ষণের মধ্যেই ওষুধের প্রভাব চিতাটিকে অচেতন করে দেয়। তার বড় বড় চোখদুটো বন্ধ করারও সময় সে পায় না। জ্যাকসন এবং লোপসাং কাছে এসে সযত্নে তাকে জালমুক্ত করেন। সময়টা ছিল বসন্তকাল। স্বচ্ছ, সোনালী রোদে তার সারা শরীর যেন ঝলমল করছিল। কিন্তু জ্যাকসনের হাতে বেশী সময় ছিল না। ওষুধের ক্রিয়া বড়জোর পনেরো মিনিট–তারপরই চিতাটি আবার তার আগের শক্তি ফিরে পাবে। কালবিলম্ব না করে জ্যাকশন তাঁর ব্যাগ থেকে একটি 'রেডিও কলার'

বের করে চিতাটির গলায় বেঁধে দেন। এই রেডিও কলার এমন একটি ছোট আকারের বেতারযন্ত্র যার সাহায্যে চিতাটির স্বাধীন গতিবিধি এবং আশপাশের সবরকম শব্দ রেডিও তরঙ্গের মাধ্যমে জ্যাকসনের পক্ষে পাওয়া সম্ভব হবে। এরপর জ্যাকসন চিতাটির বাঁ কানে '১' মার্কা একটি চিহ্ন এঁকে দেন-যাতে ভবিষ্যতে যদি তার গলা থেকে রেডিও কলারটি পড়েও যায় তাহলেও তাকে চিনতে যেন কোনও অসুবিধা না হয়। চিতাটির জ্ঞান ফিরতে আরও বেশ কিছু সময় বাকি-তাই জ্যাকসন খুব গভীরভাবে চিতাটিকে নিরীক্ষণ করতে থাকেন। প্রায় দু' ফুট সমান উঁচু এবং তিন ফুট লম্বা লেজ সমন্বিত চিতাটির শরীরও প্রায় তিন ফুটের। ওজন প্রায় ১০০ পাউন্ড, ভীষণ রকমের আকর্ষনীয় একটি জীব।

জ্যাকসন রেডিও কলার ঠিক করছেন

হঠাৎই চিতাটি একটু নড়ে চড়ে ওঠে। জ্যাকসন বুঝতে পারেন ধীরে ধীরে তার সম্বিৎ ফিরে আসছে। একটুও দেরী না করে জ্যাকসন তার জিনিসপত্র একটি বাক্সে ভরে ফেলেন। তারপর বিভিন্ন অ্যাংগেল থেকে চিতাটির ছবি নিতে থাকেন। খয়েরি ধোঁয়ার মতো গা, তার উপর কালো কালো ছোপ, লোমে ভর্তি লম্বা লেজ এবং বড় বড় নখরযুক্ত থাবা–সব মিলিয়ে একটি নয়নলোভন দৃশ্য। দেখতে দেখতে জ্যাকশন যেন অভিভূত হয়ে পড়েন। ঠিক তখনই গা ঝাড়া দিয়ে চিতাটি উঠে দাঁড়ায়। জ্যাকসন ও তার সঙ্গী লোপসাংও উঠে আড়ালে চলে যান–একটু দূর থেকে চিতাটির গতিবিধি লক্ষ্য করার জন্য। কিছুক্ষণের অবসন্নতার পর সেটি ধীরে ধীরে অদৃশ্য হয়ে যায়।

জ্যাকসন আর লোপসাং-ও কিছুক্ষণ তাকে নিরীক্ষণ করার পর বেস ক্যাম্পে ফিরে এসে টেলিমিটার রিসিভারটি চালু করে দেন। এরপরেই বিশ্বের প্রথম রেডিওকলার যুক্ত চিতাটি তাদের এখনও পর্যন্ত অজ্ঞাত বিভিন্ন বন্য আচরণের খবরাখবর বেতার সংকেতের মাধ্যমে শিবিরে পাঠিয়ে যেতে থাকে।

নেপালের উত্তর-পশ্চিম ভাগে হিমালয়ের সুউচ্চ পর্বতশ্রেণী প্রকৃতির এক অখণ্ড সাম্রাজ্য। সবসময়েই তুষারাবৃত এই বিপদসঙ্কুল পর্বতমালা। হিমালয়ের এই অংশ বিভিন্ন গাছপালা আর দুর্লভ জীব জন্তুতে সমৃদ্ধ। সজীব এবং নির্জীব এমন অনেক কিছু এখনও এই পর্বতের গহনে লুকিয়ে আছে যার খোঁজ আধুনিক বিজ্ঞানেরও অজানা। এরকমই একটি জীব হল তুষার চিতা বা স্নো লেপার্ড। উত্তর-পশ্চিম নেপালের উত্তাল নদী লাংগুর তীরবর্তী বিপদ সঙ্কুল গিরিখাতই যার মূল আবাস।

অতঃপর এই দুর্লভ জন্তুটির অনুসন্ধানের জন্য রডনি জ্যাকসন, তাঁর সঙ্গী ডারলা হিলার্ড এবং নেপালের বায়োলজিস্ট করণ শাহের সংযুক্ত দলটি একটি অভিযান চালায়। তাদেরই চেষ্টায় প্রথম একটি তুষার চিতাকে রেডিও কলারের সাহায্য তাদের গতিবিধি জানা সম্ভব হয়।

কিন্তু জ্যাকসনের পক্ষে এই অভিযান শুরু করা মোটেই সহজসাধ্য ছিল না। প্রথমদিকে যাকেই তিনি প্রস্তাব দেন সেই এটা আদৌ সম্ভবপর নয় বলে উড়িয়ে দেয়। কিন্তু জ্যাকসন তার সঙ্গীদের সাহায্যে এই অসম্ভবকেই একদিন সম্ভব করে তোলেন। এবং এই রেডিও টেলিমিটার যন্ত্রের সাহায্যে তুষারচিতা সম্পর্কিত অনেক অজানা তথ্যও আবিষ্কার করতে সমর্থ হন।

ছেলেবেলা থেকেই জ্যাকসন অসীম সাহসী–অদম্য তাঁর কৌতূহল। বড় হয়েও তিনি নানারকম দুঃসাহসিক অভিযান চালিয়ে যেতে থাকেন। তাঁর সাহস, পরিশ্রম করার ক্ষমতা এবং মনোবল এতই দৃঢ় ছিল যে যখন তিনি যা চেয়েছেন তাই বাস্তবায়িত করে দেখিয়েছেন। এবার তুষার চিতা নিয়ে স্টাডি করার ইচ্ছে প্রকাশ করলে তাঁকে আর্থিক সাহায্য দিতে প্রথমে সকলেই অস্বীকার করে। কিন্তু ১৯৮১ সালে দুঃসাহসিক অভিযানের জন্য পাঁচজন রোলেক্স পুরস্কার বিজয়ীর মধ্যে জ্যাকসনের নাম ওঠার পর চিতা সম্পর্কিত তাঁর এই অভিযানের কথা অনেকের কাছেই সম্ভাব্য বলে মনে হয়।

নেপাল সরকারের জাতীয় উদ্যান এবং বন্যজন্তু সংরক্ষণ বিভাগ এই প্রকল্পটি অনুমোদন করে। সেই সঙ্গে নেপালের জীববিজ্ঞানী করন বি.শাহকেও এই অভিযানের সঙ্গে যুক্ত করে দেওয়া হয়। নেপাল সরকারের স্বীকৃতি লাভের পর সারা বিশ্ব থেকে জ্যাকসনের কাছে এই প্রকল্পের জন্য আর্থিক সাহায্য আসতে থাকে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ন্যাশনাল জিওগ্রাফিক স্যোসাইটি, ওয়ার্ল্ড ওয়াইল্ডলাইফ ফাণ্ড, ইন্টারন্যাশনাল ট্রাস্ট ফর নেচার কনজারভেশন, দি ক্যালিফর্নিয়ান ইন্সটিটিউট ফর এনভায়রনমেন্টাল স্টাডিজ এবং দি ইন্টারন্যাশনাল স্নো লেপার্ড ফান্ড প্রায় আট মাসের এই প্রকল্পটির জন্য আর্থিক সাহায্য অনুমোদন করেন।

জ্যাকসনের এই অভিযানের আগে তুষার চিতা সম্পর্কিত অধিকাংশ মূল্যবান তথ্যই ছিল

চিতাটি জেগে ওঠে ও জ্যাকসনকে আক্রমণ করে

মানুষের অজানা। শুধু জ্বালানী কাঠ সংগ্রহের আশায় স্থানীয় গরীব অধিবাসীরা যখন এইসব অঞ্চলে চলে আসত নিরুপায় হয়ে তখনই হয়ত মাঝে মধ্যে তারা এই দুর্লভ জন্তুটির মুখোমুখি হয়ে পড়ত। সাধারণ্যে তা খুব কমই প্রকাশিত হত। মাত্র ১৯৭১ সালেই প্রথম একটি তুষার চিতার ছবি তোলেন জর্জ বি. শালর। ছবিটি আমেরিকার 'ন্যাশনাল জিওগ্রাফিক' পত্রিকার নভেম্বর ১৯৭১ সংখ্যায় প্রকাশিত হওয়ার পর থেকেই এই জীবটি সম্পর্কে মানুষের কৌতূহল এবং উৎকণ্ঠা বৃদ্ধি পেতে থাকে।

এই তুষার চিতা সম্পর্কে অনুসন্ধান চালানোর জন্য তাদের স্বাভাবিক আবাসস্থলের ধারে কাছে শিবির স্থাপন করা ছিল অপরিহার্য। পৃথিবীর দুর্গম অঞ্চলগুলির অন্যতম নেপালের বিপদসঙ্কুল পাহাড় পর্বতে ঘেরা এই এলাকা মাত্র কিছুদিন আগেও ছিল অপরিজ্ঞাত। বৃটিশ অভিযাত্রী জন টাইসন ১৯৬৪ সালে প্রথম এই অঞ্চলটির মানচিত্র প্রস্তুত করেন। তারপর থেকে মুষ্টিমেয় কয়েকজন অতিসাহসী পর্বতারোহী ছাড়া কেউই নেপালের এই লাংগু গিরিখাতে পদার্পণ করেনি।

এইরকম দূর দুর্গম অঞ্চলে আট মাস কাটানোর আগে প্রথমেই জ্যাকসন এই অঞ্চলটির ভূগোল সম্পর্কে নিজেকে ভালভাবে অবহিত করেন। তারপরই শুরু হয় অভিযানের জন্য প্রয়োজনীয় সাজসরঞ্জাম এবং খাদ্যবস্তু সংগ্রহের কাজ। এ বিষয়ে তাদের বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন করতে হয়। কারণ দুর্ভাগ্যক্রমে যদি কোনও দরকারী জিনিস বাদ পড়ে যায় তাহলে তা পাওয়ার একমাত্র সম্ভাব্য জায়গা নেপালগঞ্জ, যা বেস ক্যাম্প থেকে পায়ে হেঁটে প্রায় ১৬০ কিলোমিটার।

সমস্ত প্রস্তুতিপর্ব ঠিকমত সমাধা হওয়ার পর অভিযাত্রী দল বিমানে রওনা হয়ে যান। বিমান প্রথম অবতরণ করে কাঠমাণ্ডু থেকে ২০০ মাইল উত্তরপূর্বে জুমলা নামের একটি ছোট্ট শহরে। সেখান থেকে জ্যাকসনদের জন্য নির্ধারিত বেস ক্যাম্পের দূরত্ব ৩০ মাইল। কিন্তু বিমানে আসা সমস্ত সামগ্রী জুমলা থেকে শিবির পর্যন্ত বহন

মায়ের স্নেহের মতোই খাঁটি

কুক্‌মীর ডাটা গুঁড়ো মশলা
অন্য কিছুর সঙ্গে এর তুলনাই হয় না

কুকমীর ডাটা গুঁড়ো মশলায় রাসায়নিক পদার্থের ব্যবহার নেই ফলে স্বাদ আর অন্যান্য গুণ একেবারে বাটা মশলার মতোই অকৃত্রিম। কুকমীর ডাটা গুঁড়ো মশলা ছাড়া অন্য কিছুর কথা আমি ভাবতেই পারি না। একমাত্র কুকুমীর ডাটা গুঁড়ো মশলাই সরকার অনুমোদিত যা আপনার রেশন দোকানে ও খোলা বাজারে নিয়মিত পাবেন।

কৃষ্ণ চন্দ্র দত্ত (কুক্‌মী) প্রাঃ লিঃ
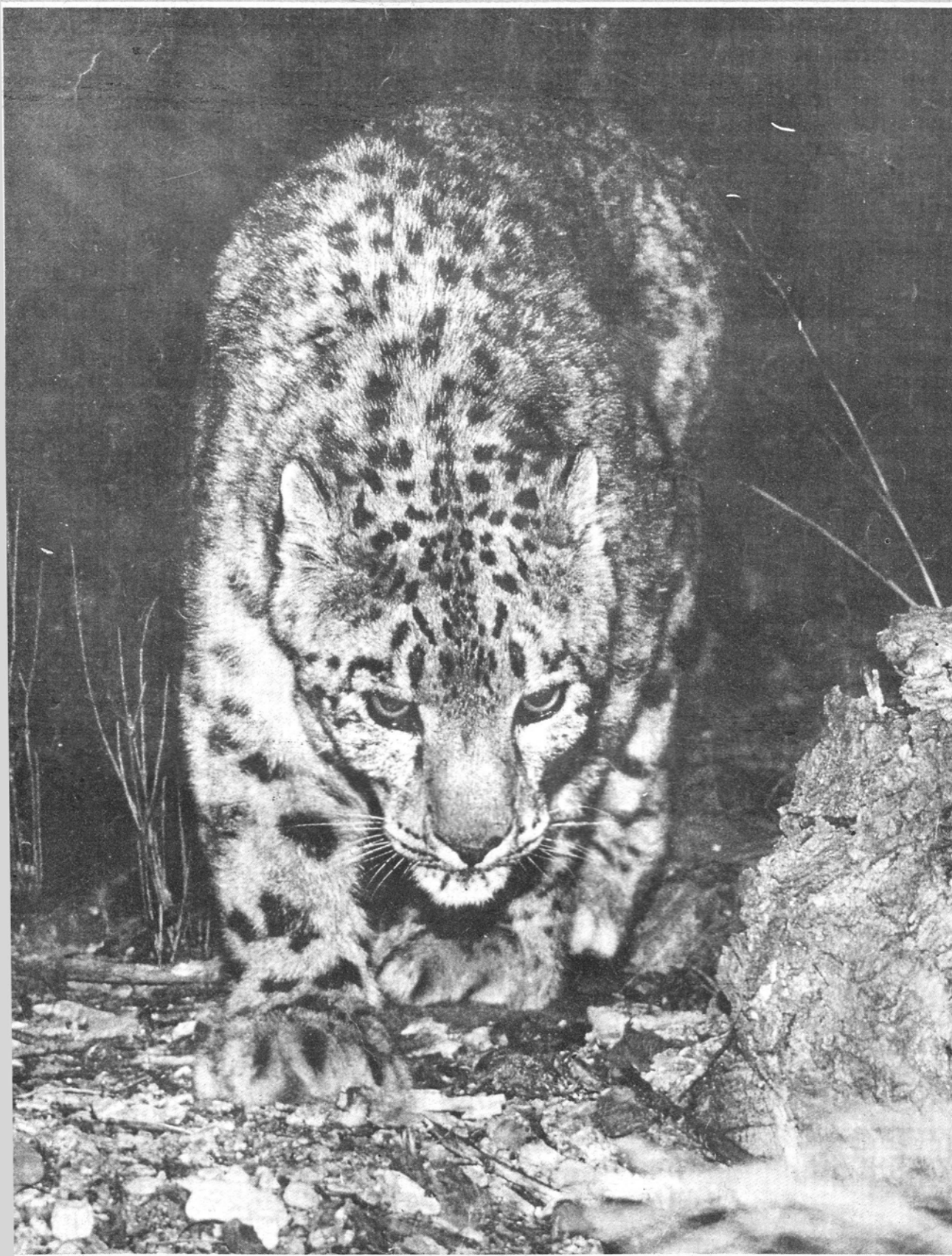
করাই একটা দু:সাধ্য ব্যাপার হয়ে দাঁড়ায়। প্রায় ৩০ জন পোর্টার দশ দিন ধরে অক্লান্ত পরিশ্রম করে সেগুলি বেস ক্যাম্পে বয়ে নিয়ে যায়। আগাগোড়াই ছিল প্রতিকূল আবহাওয়ার দাপট।

বেস ক্যাম্পটি ছিল একটি ছোট পাহাড়ী নদীর তীরবর্তী। কাছাকাছি একটি ছোট গ্রাম, ডোলপু–অধিবাসী মাত্র ২০০ জন। জুমলা ও ডোলপুর মধ্যে আরও একটি নদী-নাম লাংগু। নদীতে কোনও সেতু না থাকায় গাছের গুঁড়ির সাহায্যেই নদী পার হতে হয় অভিযাত্রীদের। এমনকি ডোলপু গ্রামের পর কোন নির্দিষ্ট রাস্তাও তাঁরা দেখতে পান না। বাধ্য হয়ে তাঁদের এই আট মাইল পথ বন্য জন্তু-জানোয়ারদের ব্যবহৃত রাস্তা ধরেই এগোতে হয়। অভিযাত্রীদের কাছে এই পথ ছিল বড়ই রোমাঞ্চকর আর উত্তেজনাপূর্ণ।

মানুষের নিজস্ব জগৎ থেকে অনেক দূরে প্রকৃতির গহনে জ্যাকসন ও তাঁর সতীর্থরা ধীরে ধীরে চরম আবহাওয়া–একঘেয়ে খাবার দাবার এবং পাহাড়ী জলবায়ুতে নিজেদের মানিয়ে নেন। তারপরই শুরু হয় তুষার চিতার অনুসন্ধান।

১৯৮৩ সালের এই দলটিতে ছিলেন গ্যারী অ্যালবোর্ন নামের একজন অভিযাত্রী। একদিন কিছু জ্বালানী কাঠের খোঁজে বেরিয়ে অদূরে আলপাইন ঘাস-এর মাঠের দিকে তার চোখ চলে যায়। সেখানে কিছু নীল রঙের পাহাড়ী ভেড়া চরছিল। কিন্তু তাকে দেখেও ভেড়াগুলির মধ্যে সামান্যতম চাঞ্চল্য আসে না। পরে অবশ্য জানা যায় সেই সময়টা ছিল তাদের মিলন ঋতু। সে জন্যই তাদের আচরণ ছিল অসংলগ্ন। গ্যারী সেদিকেই তাকিয়ে ছিল। হঠাৎই একটি পুরুষ ভেড়া তাঁর দিকে দৌড়ে আসে। পেছনে একটা তুষার চিতা। প্রায় একশ গজ দৌড়নোর পর ভেড়াটি চিতার নাগালের মধ্যে চলে আসে। একটা হুঙকার দিয়ে এবার চিতাটি লাফ দেয়। কিন্তু ভেড়াটি কোনক্রমে পাশ কাটিয়ে পালিয়ে যেতে সমর্থ হয়। এভাবে দৌড়তে দৌড়তে চিতাটি গ্যারীর প্রায় কাছে চলে আসে। প্রথমে গ্যারীর উপস্থিতি তার নজরে পড়ে না। তারপরই হঠাৎ গ্যারীকে সে দেখতে পায়। প্রায় পাঁচ মিনিট তার তুষার সবুজ চোখ নিয়ে চিতাটি গ্যারীর দিকে তাকিয়ে থাকে। ধীরে ধীরে তার মধ্যে একটা পরিবর্তন হতে থাকে। কান দুটো খাড়া করে সে ঝুঁকে নিজেকে মাটির সাথে এমনভাবে মিশিয়ে দেয় যে তাকে প্রায় দেখতেই পাওয়া যায় না। দু'জনেই দু-জনের কাছে অপরিচিত এক একটি জীব। এভাবেই কিছু সময় চলে যায়–তার পরই কিছু একটা ভেবে চিতাটি ছুটে পালাতে থাকে।

শিবিরে ফিরে গ্যারী তার সাথীদের চিতার সঙ্গে তার প্রথম সাক্ষাতের কথা বলে। সবাই বিস্ময়ে বিমূঢ় হয়ে যায়। এটা কারোরই মাথায় ঢোকে না, গ্যারীকে আক্রমণ না করে চিতাটি কেন পালিয়ে গেল! অবশ্য স্থানীয় অধিবাসীদের কাছেও খোঁজ নিয়ে জানা যায় কখনই নাকি কোন চিতা কোনও মানুষকে আক্রমণ করেনি।

ইতিমধ্যে জ্যাকসনের দল মোট পাঁচটি চিতার গলায় রেডিও কলার লাগাতে সমর্থ হয়। এক, দুই এবং তিন নম্বর চিতাটি ছিল প্রৌঢ় পুরুষ চিতা, চার নম্বর চিতাটি স্ত্রী এবং পাঁচ নম্বরটি হল একটি শিশু স্ত্রী চিতা। এছাড়াও ওই অঞ্চলে আরও পাঁচটি চিতা ছিল–বিভিন্ন কারণে যাদের গলায় রেডিও কলার লাগানো সম্ভব হয়নি।

তুষার চিতার বৈশিষ্ট হল, তারা একাকীত্বপ্রিয়। শুধু জানুয়ারী থেকে মার্চ–তাদের মিলনকালে পুরুষ এবং নারী চিতাকে একসাথে দেখতে পাওয়া যায়। তারা সাধারণত: যে রাস্তা ধরে যাতায়াত করে কোন না কোন চিহ্ন সেখানে রেখে যায়। বালুকাময় রাস্তায় পদচিহ্ন, পায়ের চাপে রাস্তায় পড়ে থাকা চুর্ণবিচুর্ন গাছের পাতা, মল-মূত্র এসব থেকে বোঝা যায় এখান থেকে কোন তুষার চিতা পার হয়েছে।

লাংগু গিরিখাত অঞ্চলে চিতার জীবনধারা অধ্যয়ন করতে অভিযাত্রী দলটিকে অনেক কষ্ট স্বীকার করতে হয়। চিতাগুলিকে ধরে তাদের ইনজেকশন দিয়ে অচেতন করা, রেডিও কলার লাগানো, তারপর পাহাড় পর্বতের গুহায় থেকে একটু একটু করে তাদের গতিবিধি, আচার-

অভিযানের গতিপথ
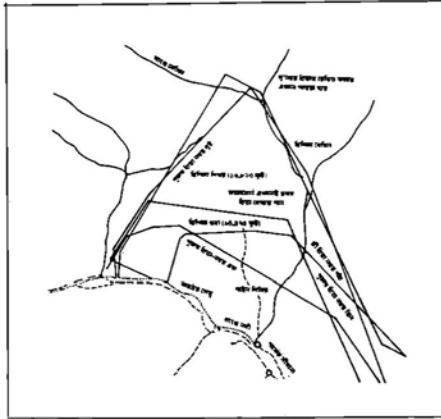
আচরণ প্রভৃতির দিকে লক্ষ্য রাখা সত্যিই ভীষণ কষ্টের কাজ। তার ওপর রেডিও কলার সম্বন্ধিত কিছু কিছু গোলোযোগ তো ছিলই। সাধারণত: এই বেতার যন্ত্রে ব্যবহৃত ব্যাটারিটি খুব বেশী হলে ২৪ মাস পর্যন্ত কার্যকরী থাকে। কিন্তু তা হলেও মাঝে মাঝে এগুলি ঠিকঠাক চলছে কিনা দেখে নেওয়াটা একান্ত জরুরী। দরকার মতো তা বদলও করতে হয়। গণ্ডগোলটা হয় তখনই। কারণ একবার ধরা পড়ার পর তারা আর দ্বিতীয়বার ধরা দিতে চায় না।

যে পাঁচটি চিতার গলায় রেডিও কলার লাগানো হয় তাদের মধ্যে দু'নম্বর চিতাটিই ছিল সবচেয়ে বেশী রাগী এবং চঞ্চল। তাকে ধরতেই সবথেকে বেশী কষ্ট করতে হয় অভিযাত্রীদের। অবশ্য এই দু'নম্বরটিকে সর্বমোট পাঁচ বার জালে আটকে অজ্ঞান করা হয়–তার রাগের কারণও সম্ভবত এটাই। পঞ্চমবার যখন তাকে ফাঁদে আটকানো হয়–তখন সে কিছুতেই তার শরীরে ইনজেকশন লাগাতে দেয় না। বিভিন্নভাবে বাধা দিতে থাকে। তারপর অনেক কষ্টে যখন ইনজেক্‌শন লাগানো হয়–দেখা যায় ইনজেক্‌শনের প্রভাব তার উপর বেশীক্ষণ কার্যকরী হচ্ছে না। রেডিও কলার লাগাতে লাগাতেই তার জ্ঞান ফিরে আসছে। তখন তাকে জ্যাকসন আবার ইনজেক্‌শন দেয়। এবারও তার প্রভাব দীর্ঘস্থায়ী হয় না। তাড়াতাড়ি করে পালিয়ে আসার সময় চিতাটির থাবার আঘাতে তিনি গুরুতরভাবে আহত হন। তার হাতের এক জায়গার মাংস উড়ে যায়। ক্ষতস্থান এত বেদনাদায়ক হয়ে ওঠে পরদিন জ্যাকসনকে তার অভিযানসঙ্গী ডারলা হিলার্ড-কে নিয়ে চিকিৎসার জন্য নিচে নামতে হয়। প্রায় আট দিন পায়ে হাঁটার পর তারা জুমলা পৌঁছয়। সেখানে ডাক্তারের পরামর্শে জ্যাকসন কাঠমাণ্ডুতে গিয়ে একজন বিখ্যাত শল্য চিকিৎসকের সাথে পরামর্শ করেন। চিকিৎসাধীন থাকার পর সুস্থ হতে জ্যাকসনের লেগে যায় প্রায় এক সপ্তাহ।

লাংগু অঞ্চলে তুষার চিতার অধ্যয়ন রেডিও কলার ছাড়া ছিল একরকম অসম্ভব। এরজন্য সর্বমোট তিনটি শিবির স্থাপন করা হয়। শেষটি ছিল প্রায় ১৪, ৪৭৫ ফুট উঁচুতে 'ত্রিশিলা কেভ'-এর ধারে কাছে। এছাড়াও লাংগু নদীর অববাহিকায় আরও কয়েকটি উপশিবির স্থাপন করা হয়।

প্রকৃতির কোলে হিমালয়ের উঁচু উঁচু পাহাড় পর্বতে ঘেরা অরণ্যের মাঝে তুষার চিতারা ঘুরে বেড়ায়। কদাচ ক্কচিৎ জঙ্গল ছেড়ে নেমে আসে নিচের পাহাড়ি গ্রামগুলিতে।

নেপালের এই তুষার চিতার আবাসস্থলে ভাগ বসাচ্ছে মানুষ। ফলে তুষার চিতা একদিকে যেমন খাদ্যাভাবে ভুগছে তেমনি আর একদিকে তারা আর আগেকার মত নিশ্চিত বোধ করতে পারছে না। তাই নেপাল সরকার এই সমস্যার সমাধান করার জন্য কিছু কিছু পদক্ষেপ গ্রহণ করেছেন। এই উদ্দেশ্যে 'কিং মহেন্দ্র ফার নেচার ট্রাস্ট' নামক একটি ট্রাস্ট গঠন করা হয়েছে। এই ট্রাস্টের কাজ হবে মানুষ এবং বন্য জন্তুদের মধ্যে সামঞ্জস্য রক্ষা করা–যাতে মানুষের সভ্যতার বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে প্রকৃতির সৌন্দর্যও অক্ষুণ্ণ রাখা সম্ভব হয়।

নেপালের লাংগু গিরিখাত ছাড়াও তুষার চিতার আস্তানা চীন এবং তিব্বতের সাইচুয়ান ও কুইংহান প্রদেশেরও কিছু কিছু অংশে। জ্যাকসনের মতে এই সব অঞ্চলে চিতার জীবনধারার অধ্যয়ন ও সংরক্ষণের জন্য অবিলম্বে আন্তর্জাতিক চুক্তি হওয়া প্রয়োজন। কেননা বিভিন্ন প্রাকৃতিক এবং সামাজিক কারণে এসব অঞ্চলে তুষার চিতা প্রায় বিলুপ্তির মুখে।

কিন্তু নেপালের সরকারী প্রয়াস এবং সেখানকার সামাজিক বিশ্বাস আমাদের আশ্বাস দেয় প্রকৃতির এই সুন্দর জীবকুল, তুষার চিতা হয়ত কোনদিনই হিমালয়ের কোল থেকে মুছে যাবে না। ডোলপু এবং বাংড়ীর মতো অনেক গ্রামেরই বাচ্চারাও বোঝে চিতার সুন্দর লোমযুক্ত চামড়ার চেয়েও জীবিত চিতা অনেক বেশী সুন্দর ও মূল্যবান। এইসব পাহাড়ি শিশুরা যখন বড় হবে, তখন তারা নিশ্চয়ই তুষার চিতার সংরক্ষক হয়ে কাজ করবে। ততদিনে তারাও বুঝতে শিখবে তুষার চিতা ছাড়া এই বিশাল হিমালয় কতটা প্রাণহীন।

সোনিয়া সাধারণ্যে ক্রমেই পরিচিত হচ্ছেন

(৪১ পৃষ্ঠার পর)
মত গুরুত্বপূর্ণ সুরক্ষাবলয়ে ইতালিয়ন নাগরিক হয়ে থেকেছেন যে মহিলা, তিনি সাম্প্রতিক কালে রাজীবের নির্বাচনক্ষেত্র আমেঠি নিয়ে অত্যন্ত ব্যস্ত। এটিকে অনেকেই বলেছেন সোনিয়ার রাজনৈতিক প্রশিক্ষণক্ষেত্র। আমেঠির ভূমিকা যে কতটা গুরুত্বপূর্ণ তা বোঝা যায় এ থেকেই যে, আগে এই কেন্দ্রের দায়িত্বে ছিলেন অরুণ নেহরু। তিনি আভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা দপ্তরের মন্ত্রী হওয়ার পর দায়িত্ব নেন ক্যাপটেন সতীশ শর্মা। বর্তমানে যিনি এম পি এবং অদূর ভবিষ্যতে রাজীবের ঘনিষ্ঠতম অর্থাৎ অরুণ নেহরুর পদটি নিতে চলেছেন।

সোনিয়া গান্ধী অবশ্য বিদেশি নাগরিক থাকাকালীনই 'ফেরা' অর্থাৎ ফরেন এক্সচেঞ্জ রেগুলেশন অ্যাকট লঙ্ঘন করে মারুতি টেকনিক্যাল সার্ভিসেস প্রাইভেট লিমিটেডের অংশীদার ডিরেকটর নিযুক্ত হন। গুজরাতের নর্মদা ফার্টিলাইজার –এর ক্ষেত্রে ইতালীয় কোম্পানি স্ন্যাম প্রোগেত্তিকে দায়িত্ব দেওয়া হয় এ ব্যাপারে অভিজ্ঞতা না থাকা সত্ত্বেও। হালে দেশের তিনটি বড়মাপের গ্যাসভিত্তিক সার প্রকল্পের জন্যও স্ন্যাম প্রোগেত্তিকে দায়িত্ব দেবার ব্যাপারে কেন্দ্রিয় সরকার সিদ্ধান্ত নেন। পরে অবশ্য এ ব্যাপারে গ্লোবাল টেণ্ডার ডাকার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। এগুলিতে সোনিয়ার ক্ষমতা সম্বন্ধে একটা দিকদর্শন অবশ্যই মেলে।

দীর্ঘ ১৫ বছর ধরে প্রধানমন্ত্রীর বাসভবনের মত গুরুত্বপূর্ণ সুরক্ষাবলয়ে ইতালিয় নাগরিক হয়ে থেকেছেন যে মহিলা, তিনি সাম্প্রতিক কালে রাজীবের নির্বাচনক্ষেত্র আমেঠি নিয়ে অত্যন্ত ব্যস্ত। এটিকে অনেকেই বলেছেন সোনিয়ার রাজনৈতিক প্রশিক্ষণক্ষেত্র।

একদা শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীর শপিং–এ সহায়তা করার সুবাদে শ্রীমতী পুপুল জয়াকর দেশে ও বিদেশে ভারতীয় কলাকৃতির সরকারী প্রসারকর্ত্রীর পদটি পেয়ে আসছিলেন এতদিন। এবার শ্রীমতী তেজি বচ্চন–এর ওপর অর্পিত হচ্ছে এই মহান দায়িত্বটি, সোনিয়ার সঙ্গে তার সুসম্পর্কের জন্য। এমনকি সোনিয়ার দুই সন্তান রাহুল আর প্রিয়াংকাকে হিন্দি পড়াতেন যিনি সেই রত্নাকর পাণ্ডেও কাশী থেকে রাজ্যসভার একটি টিকিট সংগ্রহ করে ফেলেছেন। সোনিয়াকে ঘিরে এখন তাই নির্মল থড়ানী (প্রখ্যাত ব্যবসায়ী মোহন থড়ানীর স্ত্রী), সুনীতা কোহ্‌লী–র মত রাজনৈতিক অভিলাষীবর্গের স্ত্রীয়েরা মৈত্রীর আবহ তৈরি করে চলেছেন।

অন্ধ্রপ্রদেশের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী ও এ আই সি সি–র সাধারণ সম্পাদক টি আঞ্জাইয়া মারা যাওয়ায় সম্প্রতি সেকেন্দ্রাবাদ লোকসভা আসনটি খালি হয়েছে। তেলেগু দেশম শাসিত এই রাজ্যের কংগ্রেসীরা চাইছেন উপনির্বাচনে সোনিয়াকে এই কেন্দ্র থেকে প্রার্থী করতে। দাবিটি প্রথমে তোলেন বিজয়ওয়াড়া সিটি কংগ্রেস কমিটি। পরে আরও একাধিক প্রস্তাব এ আই সি সি–র দপ্তরে এসে পৌঁছোয়। সেকেন্দ্রাবাদে কংগ্রেসের শক্তি অবশ্য রামারাও জমানায়ও উপেক্ষণীয় নয়।

রাজীব গান্ধীর ভারতীয় রাজনীতিতে আসাটাও পূর্বপরিকল্পিত ছিল না, ১৯৮৪–র ৩১ অক্টোবর তাকে সম্ভব করে দিল। এ দেশের রাজনীতিতে কংগ্রেসের বিপক্ষ কোনও শক্তির সম্ভাবনা যখন দূর অস্ত, আর কংগ্রেসী নেতৃত্ব উত্তর-স্বাধীনতা পর্বে যখন একটি বিশেষ পরিবারকে কেন্দ্র করেই আবর্তিত হয়েছে তখন সোনিয়ার রাজনীতিতে আসার সম্ভাবনায় কোনও সংশয় প্রকাশের কারণ এখন আর দেখা যাচ্ছে না।

ছবি : মঙ্গলকুমার, পি. আই. বি,

৪০ পৃষ্ঠার পর

জন্য কর্তৃপক্ষকে ধিক্কার জানায় এবং শাস্তি দাবি করে।

এই বিতর্কিত 'রাজ সে স্বরাজ' সিরিয়াল তৈরির নেপথ্যটি ছিল ভারি চাঞ্চল্যকর। নেতাজী রিসার্চ ব্যুরো কাউন্সিলের সূত্রে জানা যায়, কয়েক-মাস আগে নেতাজী রিসার্চ ব্যুরো শ্রীমতী আল্লানার কাছ থেকে একটি চিঠি পায়। শ্রীমতী আল্লানা লেখেন, 'আমরা আই এন এ ট্রায়ালের ওপর একটি দূরদর্শন সিরিয়াল করার দায়িত্ব পেয়েছি। এই ব্যাপারে নেতাজী রিসার্চ ব্যুরোর সাহায্য প্রয়োজন। তাঁকে জানানো হয়, সঠিক ভাবে ইতিহাস তুলে ধরলে রিসার্চ ব্যুরো সাহায্য করতে প্রস্তুত। এ চিঠির কোনও জবাব আসে না। এরপর শ্যামনন্দ জালান জানান, 'ভুলাভাই দেশাই এর চরিত্রে অভিনয় করব। তাই ভুলাভাই সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে চাই।' তাকে জানানো হয়, সব তথ্য রিসার্চ ব্যুরোতে আছে। জেনে যেতে পারেন। কিছুদিন আগে আল্লানা টেলিফোন করে বলেন– 'আমরা আই এন এ-এর একটি গান ব্যবহারের অনুমতি চাই।' তাঁকে বলা হয়, এভাবে অনুমতি দেওয়া হয় না। পদ্ধতি অনুসারে চিঠি পাঠাতে হয়। উনি চিঠি পাঠান। গান ব্যবহারের অনুমতি দেওয়া হয়। এরপর নেতাজী রিসার্চ ব্যুরোর তরফে ডঃ শিশির বসুর কাছে শ্রীমতী আল্লানা জানতে চান, 'সিরিয়াল তৈরি। ছবিটি দেখবেন ?' ডঃ বসু জানান, একাতো দেখতে পারি না। আই এন এ-র কয়েকজনকে নিয়ে দেখব।' শ্রীমতী আল্লানার তরফে কোনও সাড়া মেলে না। এরপর ওই 'রাজ সে স্বরাজ' ধারাবাহিকটি দেখে রিসার্চ ব্যুরোর কর্মকর্তাদের চক্ষু চড়ক গাছ। ক্ষোভে ফেটে পড়লেন তারা।

'রাজ সে স্বরাজ' নিয়ে নেতাজীর ভ্রাতুষ্পুত্র ডঃ শিশির বসুর বক্তব্য অমল আল্লানা ছবিটি করেছেন একটা বিশেষ উদ্দেশ্য নিয়ে। ওরা এমন একজন অভিনেতাকে বেছে নিয়েছেন,যিনি চেহারায় বা ব্যক্তিত্বে নেতাজীর ঠিক বিপরীত। এ দেখে মনে হয় যেন নেতাজীকেই করা হবে, আগে থেকেই ভেবে রাখা হয়েছিল।

আসলে আমাদের দেশে স্বাধীনতা আন্দোলনের ইতিহাস লেখা নিয়ে ভারি বিতর্কিত পথ অনুসরণ করা হয়। সেখানে সর্বত্র দেখানোর চেষ্টা হয়– অহিংসার ম্যাজিকে আমরা স্বাধীন হয়েছি। এবং যেহেতু অহিংস আন্দোলনের নেতা গান্ধীজী, তাই তাঁকেই প্রাধান্য দেওয়া হয়। স্বভাবতই সেসব তৈরি করা ইতিহাসে বাংলার সশস্ত্র আন্দোলনের ঐতিহ্য চাপা দেওয়ার চেষ্টা করা হয়। পঞ্চাশের দশকে তো অল ইন্ডিয়া রেডিওতে নেতাজীর জন্ম-দিনের কথাও বলা হত না। জাতীয় ছুটি তো দূর অস্ত। ইন্দিরা গান্ধীর আমলের জরুরি অবস্থার সময়ে দিল্লিতে প্রোথিত 'টাইম ক্যাপসুল' অর্থাৎ কালাধারের ইতিহাসে তো নেতাজীর নামই রাখা হয়নি। নয়া দিল্লির রাজঘাটের গান্ধী আশ্রমের দেওয়াল চিত্রে নেতাজীর সঠিক উপস্থিতি কই ? নেতাজী নিয়ে কমিউনিস্ট নেতারা এবং কট্টর জওহরলাল পন্থী কংগ্রেসীরা এমন সব কথা

প্রেম সায়গল

'রাজ সে স্বরাজ' নিয়ে নেতাজীর ভ্রাতুষ্পুত্র ডঃ শিশির বসুর বক্তব্য : অমল আল্লানা ছবিটি করেছেন একটা বিশেষ উদ্দেশ্য নিয়ে। ওরা এমন একজন অভিনেতাকে বেছে নিয়েছেন, যিনি চেহারায় বা ব্যক্তিত্বে নেতাজীর ঠিক বিপরীত।

মাঝে মাঝে বলেছেন, যেন 'নেতাজী দেশপ্রেমিক কিনা'–এ সার্টিফিকেট দেবার মালিক তাঁরাই। এখনও এক শ্রেণীর মার্কসবাদীরা মনে করেন নেতাজী 'ভ্রান্ত দেশপ্রেমিক'।

নেতাজীকে মর্মন্তুদ অপমান সইতে হয় নেহরু জীবনীকার ঐতিহাসিক এস. গোপালের মূল্যায়নে। এই ইতিহাসেকার বলেছেন, 'সুভাষ বোস ইন একজাইল এব্রড ফ্যাসিড হিমসেলফ আজ এ ফিউচার ফ্যাসিস্ট ডিকটেটর।' নেহরুর জীবনী লিখতে গিয়ে বিকৃত করা হচ্ছে নেতাজীকে। যখন নেতাজী কংগ্রেস সভাপতি ছিলেন তখন দুই ব্যক্তি জার্মান সরকারের পক্ষ থেকে এশিয়া সফর করছিলেন। তাঁরা দেখতে চাইছিলেন, এশিয়ার স্বাধীনতা সংগ্রামে অংশ নেওয়া মানুষজন জার্মানিকে কি চোখে দেখে। কংগ্রেস সভাপতি হিসাবে তাঁরা বোম্বাই শহরে নেতাজীর সঙ্গে দেখা করলেন।

দেখা করার পর তাঁরা একটা রিপোর্ট পাঠিয়ে-ছিলেন বার্লিনে। ১৯৩৮ সালের সেই রিপোর্টটি দেখে ডঃ গোপাল লিখলেন, 'নেতাজী জার্মানদের সঙ্গে ষড়যন্ত্র করেছিলেন।' কিন্তু রিপোর্টটি ভাল করে পড়লে বোঝা যায়, ডঃ গোপালের বক্তব্যই বরং ষড়যন্ত্রমূলক। সেই রিপোর্টের ৪টি পয়েন্ট পড়ে ডঃ শিশির বসু প্রকৃত সত্যটা আমাদের বোঝা-লেন। জার্মান গভর্মেন্টকে দেওয়া সেই রিপোর্টে বলা হয়েছে–৪টি পয়েন্ট সুভাষ বোস আমাদের বিরোধিতা করছেন। এক আমরা নাৎসীরা, জার্মানিতে গণতন্ত্র ধ্বংস করেছি। দুই আমরা সমাজতন্ত্রী ভাবধারা নষ্ট করেছি। তিন : ইহুদিদের প্রতি চরম অবিচার করছি। জাতপাতের প্রশ্নেও তিনি আমাদের আইডিয়ার সমালোচনা করেছেন। চার পররাষ্ট্র নীতিতে আমরা সরাসরি ইংরেজ বিরোধী নই।' ডঃ গোপাল অত্যন্ত অসত্যভাবে লিখেছিলেন 'নেতাজী রবীন্দ্রনাথকে দিয়ে লবি করিয়েছেন।'

এরপরই আসে রিচার্ড অ্যাটনবরোর 'গান্ধী' ছবি প্রসঙ্গ। এখানে অ্যাটেনবরো খুব দক্ষতার সঙ্গেই শিল্প সম্মত পথে একটি মিথ্যার যুগকে প্রতিষ্ঠা করেছেন। 'গান্ধী' চলচ্চিত্রে যে সময়টিকে প্রধানভাবে ধরা হয়েছে সেখানে নেতাজী ছিলেন এক বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ অংশীদার। কিন্তু কোন এক অদৃশ্য অঙ্গুলি সংকেতে সেইসময় থেকে সু-কৌশলে বাদ দেওয়া হয়েছে নেতাজীকে। যেন ওই সময় নেতাজী বলে জাতীয় সংগ্রামে কেউ ছিলেনই না। ভারতবাসীর টাকায় এই মিথ্যেটাকে প্রতিষ্ঠা করা হল রীতিমত ঢাকঢোল পিটিয়ে।

আজাদ হিন্দ ফৌজের তিন বিখ্যাত নায়ক শাহনওয়াজ খান, ধীলন এবং প্রেম সায়গল। এর মধ্যে এখন একমাত্র জীবিত প্রেম সায়গলই আছেন। 'রাজ সে স্বরাজ' দেখার পর সায়গল তীব্র প্রতিবাদ করেন। সায়গল বলেছেন, 'সিরি-য়ালের প্রথম পর্ব দেখার পরই আমি প্রতিবাদ জানিয়ে চিঠি পাঠাই তথ্য ও বেতার দপ্তরের সচিবের কাছে। দূরদর্শনে আজাদ হিন্দ ফৌজের বিচার দৃশ্যে দেখানো হল অভিযুক্ত তিনজন, বৃটিশ সোনাবাহিনীর ব্যাজ পরে আছেন। কিন্তু ইংরাজ-দের হাতে যখন আমরা ধরা পড়ি, তখন ওরা আমাদের আই এন এ ব্যাজ কেড়ে নিয়ে বৃটিশ বাহিনীর ব্যাজ পরতে বলেছিল। আমরা পরিনি। কিন্তু এই সিরিয়াল দেখানো হল আমরা তাই পরে আছি।

প্রসঙ্গত: উল্লেখযোগ্য যে এই সায়গলের স্ত্রীই হলেন সুভাষের ঝান্সী ব্রিগেডের নেত্রী লক্ষ্মী স্বামী-নাথন। সায়গল আরও বলেছেন : আজাদ হিন্দ ফৌজের সর্বাধিনায়ক হিসাবে নেতাজী প্রকাশ্যে কখনও অসামরিক পোষাক পরতেন না। অথচ টি ভি সিরিয়ালে দেখানো হয়েছে নেতাজী কোট প্যান্ট পরে আছেন। এই তথ্যের বিকৃতি ইচ্ছাকৃত ও ক্ষমার অযোগ্য।'

নেতাজী সুভাষ ছিলেন 'সোলজার স্টেটস-ম্যান'। জাতীয় সংগ্রামে তিনিই একমাত্র নায়ক যিনি মহাবিপ্লবী রাসবিহারী বসুর সার্থক উত্তরা-ধিকারী হিসেবে দেশের বাইরে থেকেও এক বিশ্বস্ত মুক্তি সেনাবাহিনী গড়তে পেরেছিলেন। সেই ভারত নায়ককে রাজনৈতিক কূটচালের বলি, ভারত-বাসী আর কতকাল তাঁর অপমানকর অবমূল্যায়ন সইবে। তাঁকে অপমান, শুধু বাঙালিকে অপমান নয়, গোটা দেশকে অপমান, মানবতাকে অপমান। এমন কি সত্যকেও। এ প্রসঙ্গে কেন্দ্রিয় তথ্যমন্ত্রী অজিত পাঁজার বক্তব্যই যথার্থ : জাতীয় নেতাদের চরিত্রায়ণে বিকৃতি রুখতে নিয়মকানুন চাই।

জীবন রহস্য

শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়
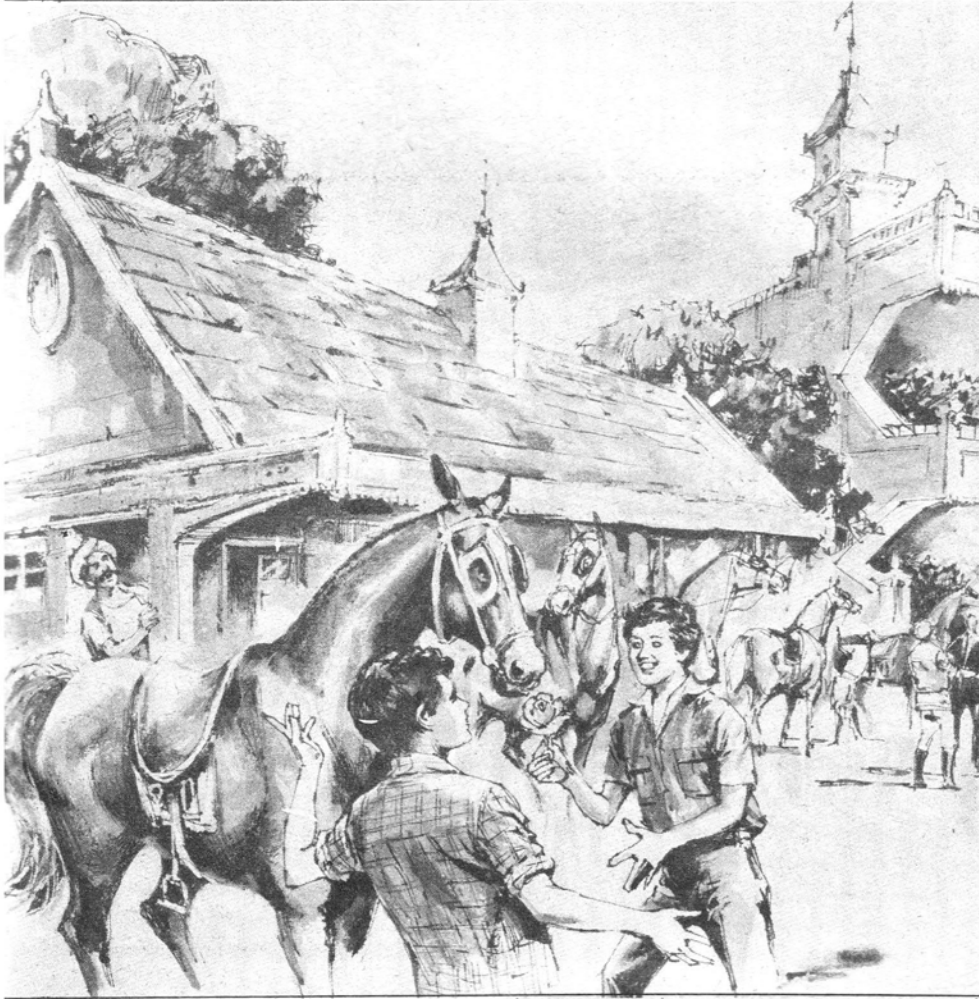
।। এগারো ।।

এই লাইব্রেরির বারান্দাতেই মনোজ ঘোষ আমায় দেখেই চিনতে পারল। পানু না? এখানে কি করছিস? লাইব্রেরি তো তোর জায়গা নয়।

—কেন? আমাদের কি লাইব্রেরিতে আসতে নেই?

হেসে ফেলল মনোজ। তা আসবি না কেন? আসবি। বাড়িটা-বইয়ের তাকগুলো ঘুরে ফিরে দেখে বাড়ি চলে যাবি। তা-বই আবার কেন?

—বই দেখতে বা নাড়তে আসিনি। এমনি এসে ম্যাগাজিন দেখছিলাম। তুই? তুই এখানে কি করছিস?

—আছে বন্ধু-আছে। এখনই বলব কেন? -যতদূর জানি-তুই তো এম বি-ও পড়লি না-বি এস সি-ও পড়লি না। কি করিস এখন? রহস্য রাখ ভাই।

কালীঘাট ফায়ার ব্রিগেড স্টেশনের পাশে প্যারাডাইস রেস্তোরাঁয় ঋত্বিক ঘটক আর মৃণাল সেন ফিল্মের বাজেট নিয়ে নিত্য আলোচনা চালাচ্ছেন। সত্যজিৎ রায় ছেঁড়া পাজামায় বোড়ালে ছবির লোকেশন দেখতে যাচ্ছেন। পাকেচক্রে বাঁকুড়ায় গিয়ে লেখক নিজেই হয়ে গেলেন ফিল্মস্টার। জীবন রহস্যের সেলুলয়েডের পরতে পরতেও এমনিই খুলে আসা ইস্টম্যানকালার ছবি।

—দেখবি? আয় তবে—

মনোজ আমায় নিয়ে একটা কিউবিকেলে তুলল। সোফার সামনে গোল টেবিলে গাদাগুচ্ছের বই। বেশির ভাগ বইয়ের মলাটে ঘোড়ার ছবি।

—ভেটারনারি ডাক্তারি পড়ছিস নাকি গোপনে?

—তা একরকম বলতে পারিস। চল,বেরোবি?

—আমি একবারে বেরিয়ে যাব মনোজ। চল। কিন্তু বইগুলো?

ওরা গুছিয়ে রাখবে'খন। কালই তো সকালে এসে আবার বসব।

—খুলে বলত মনোজ—কি পড়ছিস? ভেটার-নারি?

একদম মোমিনপুরের রাস্তায় পড়ে মনোজ বলল, পড়ে পড়ে দেখছি—ঘোড়ার আসল স্ট্রেংথ কোন পায়ে? পেছনের দুই দাবনার? না, সামনের দুই পায়ে?

তাহলে তো ঘোড়ার অ্যানাটমি, মাসেল—সব পড়তে হবে।

তাতো হচ্ছেই।

ছোটবেলার বন্ধুকে নিয়ে নির্জন'রাস্তা দিয়ে হাঁটছি। যুবক হয়ে গেছি। পড়া শেষ হয়নি। চাকরি পাইনি। মনোজও নিশ্চয় তাই। সুন্দর সুন্দর বাড়ি। সেসব বাড়ির বারন্দায় আরও সুন্দর ফুলের টব—লতাপাতা। ঝকঝকে গাড়ি বেরিয়ে এসে তীরবেগে নিশ্চয়ই পুলের দিকে চলে যাচ্ছে। আর আমরা? দু'জন অনিশ্চিত মানুষ। সব সময় ভাবি—সামনে নিশ্চয় ভাল কিছু আছে। কিন্তু ভালো কিছুর সঙ্গে আর দেখা হয় না। জীবনটাই যেন খড়ি ওঠা।

মনোজ ওদের বেহালার বাড়িতে নিয়ে গেল। মনোজের বাবা দেখলাম—সামনের ঘরে একগাদা লোক নিয়ে বসে। অনেক টাইপিস্ট টাইপ করছে। তিনি ডিকটেশন দিচ্ছেন ইংরিজিতে। মাই লর্ড—

কিরে মনোজ—মেসোমশায় কি চাকরি ছেড়ে দিলেন?

ছেড়ে নয়—ছাড়িয়ে দেওয়া হয়েছে।

শুনেছিলাম বড় প্রোমোশন পেয়েছেন।

বড় তো বটেই। স্বাধীনতার আগে আমাদের ছোটবেলায় বাবাকে দেখেছিস—হেড কনস্টেবল। তারপর এ এস আই হলেন। তখনো ইন্ডিয়া পরাধীন। স্বাধীনতার পর এস আই। বীরভূমে বদলি হলেন ইন্সপেকটর হয়ে। আলিপুরে এলেন অ্যাডিশনাল এস পি হয়ে। বীরভূম থেকেই হাত খুলে যায় বাবার—

আমি কিছু বুঝতে না পেরে তাকিয়ে আছি দেখে মনোজ বলল, বাবা তো প্রি-ইন্ডিপেনডেন্স ডেজ থেকেই রাইট অ্যান্ড লেফট ঘুষ খাচ্ছিল। স্বাধীনতার পর লাগাম ছাড়া হয়ে ওঠেন। তারপর একদিন হাতেনাতে। ব্যাস। সাসপেন্ড হলেন। নে—বোস এখন—পরে কথা হবে।

ব্যাপারটা খুব সিম্পিল। সাসপেন্ড হয়ে ওর বাবা নিজের কেস পুলিস কোর্টে লড়তে গিয়ে দেখলেন-পুলিশে তার মত সাসপেন্ড শয়ে শয়ে রয়েছে।

তখন মনোজের বাবা তাদের আনঅফিসিয়াল উকিল হয়ে দাঁড়ালেন।

বছর না ঘুরতে দারুণ পসার। কোথায় লাগে পুলিশের এস পি-র চাকরি।

ভেতরের ঘরে বসে মনোজের বাবার ডিকটেশন দেওয়া শুনতে পাচ্ছিলাম–

দেন মাই লর্ডশিপ–দি ফলেন ওম্যান টোল্ড দি সেইড প্লেইনটিফ–তামাশা পায়েছো ? ফেল কড়ি মাখো তেল.....

জানতে চাইলাম–মাস গেলে কত পান মেসো-মশায় ?

মনোজ বলল, তা ফেলে ছড়িয়ে বিশ হাজার টাকা তো আসেই।

মাসে বিশ হাজার ?

তা অবাক হচ্ছিস কেন ? বাবা তো তার লাইনে একজন দুঁদে অফিসার। তাকে খাটিয়ে সরকারের লস। আট বছর হয়ে গেল বাবা সাসপেণ্ড। ঘরে বসে মাইনের সেভেনটিফাইভ পারসেন্ট পান। তারপর পুলিশ কোর্টে ওকালতির আয়। ভগবান শেষ বয়সে বাবাকে ছপ্পড় ফুঁড়ে দিয়েছেন। তবে এই সঙ্গে বাবার অন্য সব গুণও বেড়েছে–

গুণগুলো ঘরে বসেই দেখতে পেলাম। কথায় কথায় শ'কার ক'কার করছেন স্টেনো টাইপিস্ট-দের। অথচ এই মানুষটিকেই ছোটবেলায় দেখেছি–পুলিশের সাধারণ চাকরি থেকে বাড়ি ফিরে বইয়ে মুখ করে পড়ে থাকতেন।

আরও দেখলাম–বসার ঘরের বইয়ের তাকের পেছনে লম্বা বোতল। গ্লাসের অভাবে বাচ্চাদের খেলনা বালতিতে ঢেলেই হলদে হুইস্কি খাচ্ছেন নিট, আর ঘুষখোর সাসপেণ্ড দারোগাদের সঙ্গে তাদের কেস নিয়ে কথা বলছেন মনোজের বাবা।

মনোজের মা দেখলাম-আস্ত একটি ধ্বংসস্তূপ। আমায় অনেকদিন পরে দেখে সামান্য হাসলেন।

অবাক হলাম–মনোজের এক মাসীকে দেখে। কালো সরস্বতী। আমাদেরই বয়সী। সবসময় হাসিতে–বেণীর দাপাদাপিতে জ্বল জ্বল করছে। আমাদের চা করে দিল। মনোজকে ধমকালো। পরিষ্কার বলল, পড়াশুনো ছেড়ে দিয়ে এ কোন ঘোড়ারোগে পড়লে।

আর অবাক হলাম–মনোজের একমাত্র বোন আশাকে দেখে। এত কাণ্ডের ভেতর ওর চোখে মুখে কোন দাগ পড়েনি। দিব্যি পরীক্ষার পড়া মুখস্ত করে চলেছে।

ওদের বাড়িটা তখনকার বেহালার এক প্রান্তে। বাড়ির গায়েই বাড়িওয়ালার পানাপুকুর। ভাড়া দেবার জন্যই বানানো একটেরে তিনখানা বাড়ি। সব ক'খানাই একতলা। সাদা রঙের। তাদের সামনে খেলাধুলোর একখানা সবুজ মাঠ। প্রত্যেক বাড়িতেই একখানা করে কুয়ো। সেই কুয়োতলার গায়েই একখানা করে টিনের ঘর।

মনোজদের টিনের ঘরখানায় দেখলাম–ওর বাবার দরবার প্যারেডের টুপি, সোর্ড অবহেলায় পড়ে আছে। একখানা পড়ার টেবিল। তাতে মনো-জের ডাক্তারি পড়ার কঙ্কালটার হাড়গোড়ের স্তূপ আর রেস খেলার কিছু হলুদ রংয়ের ছোট বই।

দেখে বোঝাই যায়–সারাটা বাড়ি মনোজের বাবার ওকালতিতে ওলট পালট।

মনোজকে বললাম, ডাক্তারি পড়া ছাড়লি কেন ?

কি হবে পড়ে ? দেখলি তো চারদিক–

তাই বলে তুই পড়বি না ? একটা ক্যারিয়ার–

মেলা ফ্যাচ ফ্যাচ করিস নে।

এরপর আমি প্রায়ই মনোজের বাড়ি যেতে লাগলাম। শহরের প্রান্তে–একটি বিষাদগ্রস্ত বাড়ি–যেখানে টাকার অভাব নেই। যাই আরও এক কারণে–

আশা। আশাকে দেখতে আমার ভাল লাগে। আশা এই নিরানন্দ বাড়ির বারন্দায় বসে আমি গেলে গান গায়–

আমার পানে চেয়ে চেয়ে সুখে থাকো।

কিংবা–

আমার বুকের মাঝে

কী সুখ আছে

তা চাও কি ?

রবীন্দ্রনাথের গান কিশোরী আশার গলায়। বাড়িটা থমথমে। পানাপুকুরের বুকে পুকুর পাড়ের বড় ডুমুর গাছটার কোন ছায়া পড়েনি। আমি মন্ত্রমুগ্ধ হয়ে আশাকে দেখি আর ভাবি–এই সংসারটাকে কি কিছুতেই ভরাডুবি থেকে তীরে তোলা যায় না ? কিন্তু আমার বা কি ক্ষমতা। আমি তখন নিজেই একজন ডুবন্ত মানুষ।

তখনো জানি না–ওদের ভরাডুবিটা কতখানি।

মনোজ একদিন বলল, জানিস পানু–মাসীর অলৌকিক ক্ষমতা আছে। হাতের মুঠোয় সবসময় একখানা কালির ছবি রাখে মাসী।

মাসীকে বললাম–দেখাও তো মাসী।

মাসী বলল, কেন দেখাবো ? ওসব গোপ্ত জিনিস।

গুপ্তকে জানতাম গোপ্ত বলে অশিক্ষিত মানুষরাই। তবু ওরই ভেতর দেখি মাসীই সংসারে সব দিকে নজর রাখে। বিয়ে হয়নি। ভারি বয়স। জামাইবাবুকে সামনের ঘরে চা পাঠাচ্ছে মাসী। মনোজ আর আমাকে চা দিচ্ছে মাসী। আবার আশার চুলে তেল দিয়ে জট ছাড়িয়ে বেণী বেঁধে দিচ্ছে মাসী। স্বাস্থ্য শ্রীতে মাসী সব সময় জ্বল জ্বল করছে।

মনোজের একটা দশ টাকা দামের কোডাক ক্যামেরা ছিল। একদিন তাতে ফিল্ম ভরে বলল, পানু, আমাদের এই ভাঙা সাইকেলটায় উঠে তুই স্পীডে চালিয়ে এসে এই খেজুর গাছটার গায়ে লেগে অ্যাক্সিডেন্ট কর। আমি একটা অ্যাক্সি-ডেন্টের ছবি তুলবো।

আশা আপত্তি করল। কক্ষনো করো না পানুদা। তোমার ভীষণ ব্যথা লাগবে।

আশা বারণ করায় আমার জেদ বেড়ে গেল। তবু তো আশার সামনে একটা অ্যাক্সিডেন্টে প্লে করতে পারব।

নিখুঁতভাবে অ্যাক্সিডেন্ট করে আমার হাত পা ছড়ে গেল। আশা ছুটে এসে গ্যাঁধালি পাতার রস লাগিয়ে দিল কাটা জায়গায়। আমি আশার হাতের টাচ পেলাম আমার গায়ে।

মনোজ বলল, ঠিক হয়নি পানু। আরেকবার কর। একটুর জন্য শাটার ভুল টিপেছি।

আবার করলাম। আবার আশা ফার্স্ট এইড দিল। আবার মনোজ বলল, ঠিক হয়নি।

আশা বলল, দাদা–তুমি একটা ক্রুয়েল।

আশার টাচ পেতে আমি আবার স্পীড়ে সাই-কেল চালিয়ে এসে খেজুর গাছের গায়ে অ্যাক্সি-ডেন্ট করলাম।

মনোজ বলল, পারফেকট।

এবার আমার চিবুক, হাঁটু–দুইই ছড়ে গেছে। আশা আর ফার্স্ট এইড দিল না। রাগে পা দাপিয়ে বাড়ির ভেতর যেতে যেতে বলল, দাদাটা একটা অ্যানিমাল।

আমি বুঝলাম আশার আমাকে ভাল লেগেছে। আরও বুঝলাম–আশা ভারতী নয়। আমি চিনিতে পিঁপড়ের মত আশাদের বাড়িতে সেঁটে গেলাম। মাসের পর মাস। যাই আসি। ওদের বকুল গাছের নিচে ঝরাফুল সারাদিন রোদে পুড়ে সন্ধ্যের অন্ধ-কার বাতাসে গন্ধ ছড়ায়। মাঠটাও অন্ধকার। ঘরের ভেতর আলোতে মনোজের বাবা ডিকটেশন দিচ্ছে। আশা একা অন্ধকার সিঁড়িতে বসে। মাসী বোধহয় কুয়োতলার দিককার রান্নাঘরে ডালডায় কুচো নিমকি ভাজছে। তার জামাইবাবুকে দেবে। দেবে আমাদেরও। মনোজ রেসের মাঠ থেকে ফেরেনি।

আবার এমনো হোত–আমি সারা দুপুর সেই টিনের ঘরটায় সেদ্ধ হচ্ছি। ঘুমোনো যায় না। বসা যায় না। মনোজ আমায় বসিয়ে রেখে টাকার জোগাড়ে গেছে। কাল রেস। সন্ধ্যের মুখে ছায়া করে আকাশে তারা ফুটি ফুটি-পানা পুকুরের গায়ে ডুমুর গাছটায় তক্ষক ডেকে উঠল–তক্কে–তক্কে–

অমনি আশা ঘুম থেকে উঠল। ওমা। সারা দুপুর তুমি এঘরে ছিলে পানুদা ? দাদাটা কি বলতো ?

আমারও আজও সেই এক প্রশ্ন। মনোজটা আসলে কি ? আজও আমি জানি না। আমায় নিয়ে একদিন সকালে নৈহাটির কাছাকাছি হাজ-নগর চলল। জুটমিল এরিয়া। বলল, আজ তোকে নিয়ে এক বৃত্ত সাধকের কাছে যাব চল। যদি দয়া হয় তো তিনি এমন ফুলের পাপড়ি দেবেন–যা হাতে নিয়ে তুই যা চাইবি–তাই পাবি।

বৃত্তসাধক ? সে আবার কি জিনিস ?

বৃত্তসাধনা না জানলে জীবনের কি জানলি পানু !

হবেও বা। লজ্জায় মুখ ফুটে কিছু বলা হল না। এতখানি বয়স হল অথচ বৃত্তসাধনা জানি না ? নিজেকে মনে মনে প্রশ্ন করে বোবা মেরে থাকলাম।

দুপুর দুপুর হাজিপুরের কাছাকাছি এক হাফ-শ্মশানে এসে হাজির হলাম দু'জনে। হাফ শ্মশান এজন্য বলছি যে-সেখানে কোন চালা নেই শ্ম-শানযাত্রীদের জন্যে। আছে শুধু একটা ডোবা। আর কিছু ভাঙা কলসী। একধারে পোড়াবার কাঠের ডাঁই। বিনা ওজনেই নাকি কিনতে হয়। চিতার কয়েকটা পোড়া গর্ত। আর পেল্লাই এক শিরীষ গাছ।

সেই গাছতলায় মাঝবয়সী এক গাট্টা গোট্টা খালি গা বাবার সঙ্গে দেখা হল। সে প্রথমেই বলল,

তোরা এসেছিস–

মনোজ বলল, কয়েকবার ঘুরে গেছি বাবা। আপনার দেখা পাইনি।

আমি তো নদীর চড়ায়–ওই কুড়েতে থাকি। –বলে লোকটা অনেক নিচে গঙ্গার বুকে চর জায়গায় আঙুল দেখাল।

সেদিকে তাকিয়ে দেখি–দেশলাই খোলের চেহারা এক নড়বড়ে কুড়ে। তার চারদিকে সবুজ কী ফসল আছে। এত উঁচু থেকে বোঝার উপায় নেই।

বাবা বলল, বর্ষায় ডুবে গেলে ওপরে উঠে আসি। জল নামলে ফিরে যাই আবার।

নিচে তাকিয়ে দেখি–অনেক নিচুতে–অন্তত বিশতলা একটা বাড়ি উল্টে বসালে যতটা নিচু হবে ততটাই নিচুতে একটা কুকুর চর থেকে ভাসতে ভাসতে তীরের দিকে সাঁতরে আসছে।

কিঙ্কর। কিঙ্কর–

গম্ভীর গলায় ডাকল বাবা।

মুহূর্তের ভেতর দেখি–ভিজে কুকুরটা আমাদের পায়ের সামনে ঝটপটাচ্ছে। আমি তো শিউরে উঠেছি। ওদিকে মনোজের মুখে দেখি–রিয়েল গুরু প্রাপ্তির মৌজি হাসি।

বাবা বলল, ওই চিতেটা খুলে দ্যাখতো কী পাস?

কোদাল নেই। খোন্তা নেই। কাঁচা মত চিতা। দাঁড়িয়ে আছি। খুঁড়ব কি দিয়ে। মনোজ কিন্তু দু'খানা হাতকে খোন্তা বানিয়ে চিতার মুখটা খুবলে তুলে ফেলল।

তাকিয়ে দেখি আধপোড়া কয়েকমাসের শিশু মড়া। সবটা না পুড়তেই মাটি চাপা দিয়ে চলে গেছে।

বাবা উবু হয়ে বসে চিতার বুক থেকে বাচ্চাটা তুলে শূন্যে লাফ দিল। সঙ্গে সঙ্গে মুখে মুখে কিছু–

ওঁ চামুণ্ডে, কালীয়ে স্তম্ভয়, স্তম্ভয়।

ওঁ ঐং ক্লীং হ্রীং ক্লীং ক্লীং কুরু স্বাহা।

সব মনে নেই। হঠাৎ দেখি বাবার হাতে আধপোড়া বাচ্চাটা হেঁচকি তুলে কেঁদে উঠল। বেঁচে আছে ভেবে ধরতে গেছি। হাত দিতে গিয়ে দেখি–বাবার মুঠোর ভেতর বিরাট এক গেরোবাজ পায়রা কুত কুত করে আমার দিকে তাকিয়ে আছে।

আমি ধরব কি। চলে পড়ে যেতাম–যদি না তখনই মনোজ বলত, বাবা–আমার বড় বাসনা–আপনি নিজে আমায় একটা সুগন্ধী গোলাপ দেন–

একগাল হেসে বাবা বলল, কি করবি? গোলাপ কেন?

শুধু একবার প্রেসিডেন্টস কাপে খেলব। জীবনে একটিবার–

ঘোড়দৌড়? চল আমার কুটীরে চল। এই কিঙ্কর–

গঙ্গার ভাঙা গা ধরে আমরা তিনজন সাবধানে পা ফেলে চড়া নজরে রেখে নামছি। বাবা বলল, বিদিশী ঘোড়া। আমার এই সুগন্ধী গোলাপের পাপড়ি কি খেতে চাইবে?

মনোজের তখন মরীয়া দশা। প্রেসিডেন্টস গোল্ড কাপ, জ্যাকপট–সব একসঙ্গে তার চোখের সামনে নাচছে।

সে যে করেই হোক ঘোড়াকে খাইয়ে দেব আমি।

কি করে খাওয়াবি?

সে বাবা আমি আগের রাতে আস্তাবলে ঢুকে খাইয়ে দেব ঘোড়াকে–

পারবি তো। দেখিস–

খুব পারব বাবা। আপনি দিন একটা সুগন্ধী গোলাপ।

তবে র এখানে। এই তীরে বসে থাক। আমি আমার কুড়ে থেকে ঘুরে আসি। আজ বিকেল বিকেল একটা বয়স্থা মড়া ভেসে আসবে–কুমারী–

ফট করে বলে বসলাম–আপনি জানলেন কি করে?

বাঃ কাল সন্ধ্যেবেলা মুর্শিদাবাদের ভবানী গাঁয়ে বিষ খেয়ে আত্মঘাতী হল মেয়েটা। তা আমি জানতে পারব না! আমি এই ঘুরে আসছি–জলের ধারে বসে থাক দুজনায়–

গঙ্গা জুড়ে জল। সোলার মালা ভেসে আসছে। কলসী। কলা বউ। মরা গাই। জলের গা ধরে বাবার কিঙ্কর ছপছপ করে কাঁচা মাছ ধরে খপ করে খেয়ে নিচ্ছে। লেজটা পাঁক কাদায় শুকিয়ে খণ্ডেয়–ত একদম।

সন্ধ্যে সন্ধ্যে সত্যি ভেসে এল। জলে ভাসতে ভাসতে একদম তরতাজা। ডুরে শাড়ি পেচানো। বাবা আর মনোজ টানাটানি করে ডাঙায় তুলল। ভাটায় জল নামায় ওরা দু'জন দিব্যি ছপছপ করে চড়ায় গিয়ে উঠল। উঠেই বাবার হুকুম–হাজিপুর কাছারি বটতলায় যা। দুপাইট দিশি আনবি–

অচেনা জায়গা। বটতলার বাজারে গিয়ে দেখি–অনেক দোকানের সাইনবোর্ডে লেখা হাজিনগর। আবার কোথাও কোথাও লেখা–হাজিপুর। পাইট দুটো নিয়ে যখন ফিরলাম তখন গঙ্গার আকাশে চাঁদ। গঙ্গার ভাঙা গা ধরে কিঙ্কর আমায় পথ দেখিয়ে চড়ার ওপর কুড়েয় নিয়ে এল। চাদ্দিকে কলাই শাক গজিয়ে উঠে বিন বিন করে সব সময় বাড়ছে। সন্ধ্যে রাতের ঠাণ্ডায় ঘিনঘিনে পাতাগুলো ভিজে মতন।

কুড়েয় ঢুকে দেখি–বাবা আসনে বসে। কাঁঠাল কাঠের পিঁড়ে হবে। পঞ্চমুণ্ডিতে ঠিকমত বসেনি। বাবার মন্ত্রোচ্চারণের দোলানীতে পিঁড়িখানা খটাখট শব্দ করে দুলছে। পিঁড়িতে বাবা। তার সামনে সেই আত্মঘাতী কুমারীর একদম উদোম মড়া। বাবার হাতে সাদা হাড়ের কোশা মত লম্বা একটা পাত্র। চেহারায় অনেকটা তামার কুশী। যা থেকে আচমন–আহ্নিক হয়।

মড়ার ওপারে মনোজ বসে। নিঃবাত। নিষ্কম্প। তারই ডানদিকে হেরিকেনের ওসকানো শিখা চিমনির কাচ ফাটায় ফাটায়। কুড়ের বাইরে অবিরাম জল ভাঙার শব্দ। সেখানে অন্ধকারে গঙ্গা।

এনেছিস? নে–দে এখানে–

বুঝতে না পেরে তাকিয়ে আছি।

ঢেলে দে বললাম–

ছিপির প্যাক খুলে ঢেলে দিলাম। হাড়ের কোশাখানা উঁচু করে সবটাই বাবা গলায় ঢালল। দিশি গড়িয়ে তার গলায় গেল। আর সেই সঙ্গে অদ্ভুত এক শব্দ। খল খল। খল খল। যেন বান ডেকেই আস্ত একটা নদী তার সব জল নিয়ে খাত পাল্টাচ্ছে।

আবারও ঢালল বাবা। আবারও সেই শব্দ। খল খল। খল খল–

আমি তাকিয়ে আছি। বাবা আমার মুখে তাকিয়ে বলল, বুঝলি কিছু।

আমি তখনও তাকিয়ে।

বাবা হা হা করে হেসে উঠল। এ কোন দশাসই পুরুষের শিরদাঁড়ার তৈরি। কারণ পড়লেই খল খল করে ওঠে। আপনা আপনি। কোন বনচাঁড়ালের মেরুদণ্ড হবে–যার বুকের ছাতি ধর একখানা দরজা–

বাবা নিজের গলায় ঢেলে মড়ার হাঁ-মুখে ফুঁ দিল কষে। মুখ খুলে যেতেই তাতেও কারণ শোধন হল। এরপরেই বাবা অন্যমূর্তি। হাতের মুঠো থেকে খই ছুড়ে মারল। কুড়েঘরের বাইরে সেই খই গিয়ে দিল হয়ে পড়ল। সেই সঙ্গে অনেক হ্রীং ক্লীং–

মড়ার বুকের পাশেই হোমকুণ্ডে বেলকাঠের সমিধ পড়ে ধিকি ধিকি আগুন একসময় দাউ দাউ করে জ্বলে উঠল। আর সেইসঙ্গে মড়াও উঠে বসল। কী সুন্দর হাসি। দাঁতের সামান্য বেরিয়ে। তা যেন হীরে বসানো। কিন্তু চোখে চাইতেই আমি চলে পড়লাম–

পরদিন ঘুম ভাঙল। তখন গঙ্গার জলে রোদ পড়ে চিক চিক করছে। ঘরভর্তি ছাই। কোথায় মড়া। কোথায় বাবা।। কেউ নেই। বাইরে বেরিয়ে দেখি মনোজ বসে আছে জলের ধারে। আর কিঙ্কর ছপ ছপ করে মাছ ধরে খাচ্ছে। তখন জোয়ার আসে আসে।

দু'জনে আমরা সাঁতরে পাড়ে উঠলাম। উঠে মনোজ বুকপকেট থেকে সেলোফেনে মোড়া একটা গোলাপ বের করে দেখাল। দেখিয়ে বলল, অমন ঢলে পড়লি কেন?

পড়ব না! অত সুন্দর মুখে কোন চোখ নেই। চোখের জায়গায় অন্ধকার গর্ত।

বৃত্তসাধনায় তো অমন হবেই। ভোররাতে আমিও ঢলে পড়ি। চোখ চাইতে দেখি আলো ঘুটি ঘুটি। ঘরে কেউ নেই। তুই আর আমি শুধু। তখন ছাইয়ের ভেতর থেকে গোলাপটা তুলে নিলাম আলতো করে।

এই গোলাপ কিন্তু আমাদের শান্তি দিল না।

সেদিনই কলকাতা পৌঁছে বেলাবেলি মনোজ আমায় নিয়ে হেস্টিংসে এল। বর্ধমানের রাজার নিজের স্টেবল। বাইরে থেকে তেমন ঘোড়া এলে এখানেই ওঠে।

উঁচু দেওয়ালে ঘেরা বিরাট জায়গা। ভেতরে যে কী এলাহি কাণ্ড–বাইরে থেকে তা ধরার কোন উপায় নেই।

মনোজের মুখে দুর্গানামের মত ডার্ক প্রিন্স–ডার্ক প্রিন্স ঘন ঘন শুনতে পাচ্ছি। হোটেল সেসিল পাড়ায় জকিদের আড্ডা থেকে পাওয়া খবর মত–ডার্ক প্রিন্স উঠেছে বর্ধমানের রাজার স্টেবলে।

বৃত্তসাধক বাবার কথাটা মনে পড়ল। বললাম–ডার্ক প্রিন্স কি গোলাপের পাপড়ি খেতে রাজি হবে মনোজ?

কোন ঘোড়াই কি গোলাপ খায়রে বোকা।

ভগলু দিয়ে খাওয়াতে হবে।

ভগলু ?

ভগলু জানিস না ? বোকা বানিয়ে খাওয়াতে হবে।

ভোর ভোর গোলাপ হাতে তো দুজনে ঢুকে পড়লাম স্টেবলে। ভেতরটা যে এমন সুন্দর ভাবতেও পারিনি।

সারি সারি ঘোড়া দাঁড়িয়ে। তা তিরিশ চল্লিশটা হবে। ঘোড়ার বাঁয়ে আয়না। ডাইনে আয়না। পেছনে আয়না। সামনে আয়না।

মনোজ ফিস ফিস করে বলল, সব আসল বার্মিংহাম গ্লাস। বুঝলি—

এত আয়না ? ঘোড়া কি মুখ দেখে সারাদিন ?

পরে বুঝিয়ে বলব পানু। এখনকার মত শুনে রাখ—সবটাই সেকসের জন্যে—ওই তো ডার্ক প্রিন্স—

তাকিয়ে দেখি—আর পাঁচটা ঘোড়ার মতই আরেকটা ঘোড়া। স্টেবলের সব ঘোড়ার মতই এরও সারা গা চকচকে। আলো পড়ে ঠিকরে যাচ্ছে। মুখে দামি চামড়ার লাগাম।

ঘোড়ারা পা ঠুকছে মাঝে মাঝে। আয়নায় আয়নায় তাদের দাবনার ছবি। সারাটা স্টেবল যেন মাইকেল অ্যাঞ্জেলোর ড্রইং খাতা। কোনটা মাদী—কোনটা মদ্দা—তা চিনতে শিখিনি। বীরত্ব, পেশী, টান টান রুপোর জগৎ যেন।

তার ভেতর খুব সাবধানে গোলাপের দু'টো পাপড়ি ছিঁড়ে নিল মনোজ। বাকি ফুলটা সেলোফেনে মুড়ে বুক পকেটে রাখল। তারপর খুব মোলায়েম গলায় ঘোড়াটার দিকে এগোতে এগোতে বলতে লাগল-ডার্ক। ডার্ক বাচ্চু। চু চু-এটা খেয়ে নাও-ইন্ডিয়ান রোজ—

নির্জন স্টেবলে কাজটা বেশ এগিয়ে যাচ্ছিল। আমরা দু'জনে কাজের লোকের মতই সদর দিয়ে ঢুকে পড়েছি।

ডাক প্রিন্সও মাথা নামিয়ে আনল। মনোজের হাতের দু'টি পাপড়ি কি ডার্কের পক্ষে দেখতে পাওয়া সম্ভব ? সঙ্গে সঙ্গে এও মনে হল— আদপেই এ যদি ডার্ক প্রিন্স না হয়।

তক্ষুণি মনোজকে চাপা গলায় বললাম, এ অন্য কোন ঘোড়া নয়তো ?

চুপ কর। এর ঠিকুজী কুলুজী আমার মুখস্থ। আও। —আও ডার্ক—বাচ্চু—বলতে বলতে মনোজ যেই পাপড়ি দুটি ডার্ক-প্রিন্সের ঠোঁটে চেপে ধরতে যাবে—যাতে কিনা ডার্ক জিভ বের করে খেয়ে নেয়—অমনি স্টেবলের শান্তি খান খান করে এক-খানা গোঁফওয়ালা মুখ চারদিককার সব বার্মিংহাম গ্লাসেই ভেসে উঠল।

মনোজ চাপা গলায় বলল, তাহলে দূর থেকে নজর রেখেছে—দৌড়ো—

ধাক্কা দিয়ে বালতি উল্টে—কয়েক সেকেণ্ডের ভেতর আমরা দেওয়ালের বাইরে।

মনোজ বলল খাওয়াতে না পারি—এই পাপড়ি হাতে সঙ্কল্প নিলে প্রথম দুটো রেসে নির্ঘাৎ উইন। দূর থেকে কেমন পাহারা দেয় দেখলি পানু। আসলে দামী অ্যানিমাল তো। কেউ যদি খারাপ কিছু খাইয়ে দেয়। তবে তো বিলকুল বর-বাদ।

এই স্টেবলেই আমাকে পরে একা আসতে হয়েছিল। যেন নিয়তি। সেকথা অন্যসময়।

আমার আর মনোজের সঙ্গে ঘোড়দৌড়ের মাঠে যাওয়া হয়নি। কিন্তু আমি বেহালায় ওদের বাড়ি যাই। সেই হতশ্রী বাড়ি। বসার ঘরে বসে সস্তার আমলে বাড়ির কর্তা হুইস্কি খেতে খেতে মাসে বিশ হাজার টাকা আয় করছেন ঘুষখোর বরখাস্ত দারোগাদের নিগাল অ্যাডভাইস দিয়ে। নিজেও সাসপেণ্ড। তবে মাসে মাইনের পঁচাত্তর ভাগ টাকা ঘরে বসে পেয়ে যাচ্ছেন মামলার নিষ্পত্তি না হওয়া অব্দি। পাশের ঘরে তার জবুথবু স্ত্রী—চনমনে সিদ্ধাই শালী—সদ্য কলেজে ঢোকা মেয়ে। আর রেসুড়ে ছেলে।

আমি টিনের ঘরটায় গিয়ে বসে থাকি। তক্ষক তার সময় মত ডাকে। অন্ধকার নেমে আসে তার নিজের সময়ে। সারা বাড়িতে কোন কোন দিন আমার কেউ খোঁজ নেয় না। আমি মনোজের পড়ার টেবিলটায় তাকিয়ে থাকি। গাদাগুচ্ছের রেসের বই। আর একটা কঙ্কালের কিছু হাড়গোড়। এই তো মানুষের পরিণতি। এর জন্যে এত ?

এইসব ভাবতে ভাবতেই এক বিকেলে কুয়োত-লার টিনের ঘর থেকে বেরিয়ে ভেতর বাড়ি ঢুকেছি। যদি মনোজ ফিরে থাকে। যদি আশা ফিরে থাকে কলেজ থেকে। মেসোমশাই খানিক আগে নতুন গাড়িতে মাসীমাকে নিয়ে হাওয়া খেতে বেরিয়েছে।

কুয়োতলার মুখোমুখি ঘরখানা ফাঁকা। কেউ নেই নাকি বাড়িতে ? পরের ঘরের দরজা ভেজানো। সামান্য ঠেলে ফাঁক করেই পিছিয়ে এলাম।

এ কি দেখলাম ? আমার মাথার ভেতর কামারশালার আগুনের শিখা এইমাত্র ছোবল দিয়ে-ছে। নিজের ঘিলু পোড়ার গন্ধ নিজে পাচ্ছি।

ছুটে কুয়োতলার টিনের ঘরে ভাঙা চেয়ারটায় এসে বসলাম।

একটু পরেই মনোজ এসে ঘরে ঢুকল, কোন জানান না দিয়ে ভেজানো দরজা ঠেলতে গেলি কেন ? এত কৌতূহল ভালো নয় পানু।

আমার মুখে একথায় কালি মেড়ে গেল আমার কোন কৌতূহল নেই মনোজ। ভেবেছিলাম—কেউ বাড়ি নেই নাকি।

তাই বলে ভেজানো দরজা ঠেলে দেখতে হবে ?

আমি তো কিছুই জানতাম না মনোজ।

এমন কিছু জানার জিনিস নয় পানু। মাসী সিদ্ধকামিনী—

কি বললি ?

মাসীর হাতে সবসময় কালীর ছোট ফটো থাকে। কোন স্কুলকলেজে পড়েনি কোনদিন। আমার দাদামশায়ের দ্বিতীয়পক্ষের শেষ সন্তান। জানিস বোধহয়-মায়ের বাবা বড় কালীসাধক ছিলেন। নানা রকম ক্ষমতা ছিল তাঁর—

এসব জানব কি করে মনোজ ?

তবে শোন। মাসী তার বাবার কাছ থেকে অনেককিছু শিখেছে। বুড়ো মরার আগে কিছু বিদ্যে নিজের ছোটমেয়েকে দিয়ে যায়। তার কিছু শিখে নিচ্ছিলাম মাসীর কাছ থেকে—

তাই বলে—

হ্যাঁ পানু। মাসী ওই রকমই চায়। যে গুরুর যেমন দক্ষিণা। বিকেলের দিকে সন্ধের মুখে মাসীর গায়ে কম্প দিয়ে জ্বর আসে। তখন তাকে জাপটে জড়িয়ে ধরেও রাখা যায় না এক একদিন।

তাই জড়িয়ে শুয়েছিলি ?

মাসী কাজে বসেছিল ওই ভাবে। ক্রীয়া করছিল—

আমি অবাক হয়ে তাকিয়ে আছি মনোজের মুখে। আর কথা এগোলো না। বাইরে নতুন মোটর গাড়ির ঘুরে ফিরে আসার শব্দ। ভেতরবাড়ি থেকে মাসীর গলা। কাঁচা কয়লার আঁচ দিল উনুনে। পাকা পুরন্ত গলায় মাসী বলে যাচ্ছে চেঁচিয়ে চেঁ-চিয়ে—কেরাসিনের বোতলটা কোনদিন হাতের কাছে পাওয়া যাবে না—

এই সময়টায় মাসী রোজ বিকেলের চা করে। চা করে চায়ের কাপ টল টলাতে টল টলাতে নিয়ে এসে এগিয়ে দেয়। তখন আমার দিকে তাকিয়েও ঠোঁটে হাসি। চোখে সুরমার ফাইন টান।

অনেক দূরে মধ্যবয়সে শীতের নিশুতি রাতে অজয়ের মেলায় আখড়ায় আখড়ায় ঘুরেছি। শীতার্ত অজয় ক্ষীণ বুকে কুয়াশা মাখা জল নিয়ে শুয়ে আছে। এক এক আখড়ায় এক এক মোহান্ত। কোন কোন মোহান্ত শীতের নিশুতি রাতের আকাশের নিচেই পালঙ্ক পেতে মশারি খাটিয়ে শুয়ে পড়েছেন। যেন পৃথিবীখানাই তাঁর ঘর। পালঙ্কের নিচেই মোহান্তর জল সরার ডাবর—পিকদানী।

আবার কোন কোন টেম্পোরারি চালার ভেতরেও মোহান্তমশাই ডেরা ফেলেছেন। শিষ্য-প্রশিষ্যারা বড় জোর ভোগ চাপিয়েছে। দেখা করার জন্য কড়া নেড়েছি বড় দরজায়।

দরজা অল্প ফাঁক করে গলা বের করেছে বড়মোহিনী। এখন তো দেখা হবে না বাবু—

কেন ?

মোহান্ত মশায় যে ক্রীয়ায় বসেছেন।

আশপাশের সাড়ে ছ'আনার দোকানীদের কানে সেকথা যেতেই তারা তো চাপা হাসিতে উথলে ওঠার যোগাড়।

তখনো জানিনা—মাসী কতখানি সিদ্ধ—কত-খানি কামিনী। তবে এইটুকু জানি—মাসী অন্ধ-কারেও ঝলকায়। হাতে তার ছোট একখানা টিনের ফটো। তাতে জিভ বের করা কালী।

মাসীর ক্রীয়ায় বসাটা খোলসা হয়েছিল আমার কাছে আরও পরে। তখন মনোজ আরও ছন্ন-ছাড়া। আরও ছিবড়ে। তখনই জানলাম—মানুষ মানুষকে খায়। খেয়ে শাস মজ্জা শুষে নিয়ে মাড়াই আখ করে ফেলে দেয়। তখন সে স্রেফ জ্বালানী।

এইসব দেখে দেখেই কি আমি জীবনের আগ্রহ হারিয়ে ফেলছি ? আর তো তেমন স্বাদ পাই না। কোথায় যেন বিস্মিত হবার ক্যামেরাটা হারিয়ে ফেলে বসে আছি। কোন এক যাত্রা পালায় হিরোইনের গান শুনেছিলাম—

আমার কানের পাশা হারিয়ে গেল ওই ডোবায়—
সুর: কালেংড়া। অড়ঠেকা। সঙ্গে ক্ল্যারিওনেট।

বড় ইচ্ছে-জীবনের মাঝখানটায় ক্ল্যারিওনেট বাজিয়ে বুকটা চিরে ফেলি নিজের। ◐

ভারতীয় উপমহাদেশের হকি: বিষণ্ণ অধ্যায়

সম্প্রতি উইলসডেন-এ অনুষ্ঠিত ষষ্ঠ বিশ্বকাপ হকি প্রতিযোগিতায় একথা একরকম সুস্পষ্ট যে ভারতীয় উপমহাদেশের দলগুলি–অর্থাৎ ভারত এবং পাকিস্তান–হকিতে তাদের অতীতের গৌরব হারাতে বসেছে। বারোটি দেশের মধ্যে অনুষ্ঠিত এই প্রতিযোগীতায় এবার পাকিস্তান এগারতম এবং ভারত সর্বশেষ অর্থাৎ বারোতম জায়গায় নেমে এসেছে। আট বার অলিম্পিক বিজেতা ভারত এবং তিনবার স্বর্ণপদক প্রাপ্ত পাকিস্তানের পক্ষে এই পরাজয় শুধুমাত্র দুঃখজনকই নয়–রীতিমত অপমানেরও। পাকিস্তান এর আগে তিনবার এবং ভারত একবার বিশ্বকাপ জয় করে–অর্থাৎ সর্বমোট ছ'টি বিশ্বকাপের মধ্যে চারবারই ভারতীয় উপমহাদেশের দলগুলি বিজেতার আসন অধিকার করে। কিন্তু সম্প্রতি এই উপমহাদেশের লজ্জাজনক পরিণতিতে স্বভাবতই প্রশ্ন জাগে–এর পেছনে এমন কি কারণ থাকতে পারে যার জন্য এককালের হকির গৌরব ভারত ওপাকিস্তান বিশ্বকাপ থেকে প্রায় বিদায় নিতে চলেছে

একটু গভীরভাবে পর্যালোচনা করলেই এর বেশ কতকগুলি কারণ স্পষ্ট হয়ে উঠবে। বর্তমান হকিতে 'স্ট্যামিনা' 'স্পিড' এবং 'স্টিক-ওয়ার্ক' এই তিনটি জিনিস খুবই গুরুত্বপূর্ণ। ভারত কিংবা পাকিস্তানের খেলোয়াড়দের মধ্যে বর্তমানে দমের অভাব বিশেষভাবে লক্ষ্য করা যাচ্ছে। সেই সঙ্গে গতির দিক দিয়েও এই দুটি টিম অন্যান্য দেশগুলির তুলনায় অনেক পিছিয়ে। যে স্টিকওয়ার্ক-এর জাদুর সাহায্যে একসময় এই উপমহাদেশের খেলোয়াড়রা সারা বিশ্বের খেলোয়াড়দের মুগ্ধ করতেন তাও আজ বিলুপ্তির মুখে। অপরদিকে অস্ট্রেলিয়া, পশ্চিম জার্মানি, হল্যাণ্ড এবং ব্রিটেন-এর দলগুলির মধ্যে তিনটি গুণই পর্যাপ্ত পরিমানে থাকায় প্রথম থেকেই তারা প্রতিপক্ষ দলগুলিকে একরকম দাবিয়ে রেখে আশাতীত সাফল্য লাভে সক্ষম হয়েছে। ভাবতে কষ্ট হয়–যে উপমহাদেশে ধ্যানচাঁদ, দারা, রুপসিং, বাবু, ইদ্রিস, পিটার, রাজগোপাল, ইসলাউদ্দিন কিংবা সমীউল্লার মতো অদ্বিতীয় 'ড্রিবলার' রা ছিলেন সেখানে আজ এমন কোনও খেলোয়াড় নেই যিনি নিজের কৌশল এবং স্টিক-ওয়ার্কের সাহায্যে প্রতিপক্ষ দলের খেলোয়াড়দের নাস্তানাবুদ করতে পারেন।

অথচ হকি খেলা ভারতীয় উপমহাদেশে একরকম ট্রাডিশনগত। একটা সময় ছিল যখন এই খেলাটি বিদেশের খেলোয়াড়রা ঠিকমত অনুধাবন করতে পারত না। সেই সঙ্গে ভারত ও পাকিস্তানে ছিলেন অনেক দক্ষ খেলোয়াড়। যাদের স্টিক-ওয়ার্ক ছিল যেমন অনবদ্য তেমনই ছিল তাদের 'কাটিং' এবং 'পাসিং'-এর দক্ষতা। সে সময় আক্রমণ এবং রক্ষণভাগের খেলোয়াড়দের নিজেদের মধ্যে একটা অদ্ভুত বোঝা পড়াও ছিল। কিন্তু

উইলসডেনে অনুষ্ঠিত এবারের বিশ্বকাপে ভারতীয় এবং পাকিস্তানি দু'টি দলের খেলোয়াড়দের মধ্যেই এই বোঝা পড়ার অভাব বিশেষভাবে লক্ষ্য করা গেছে। অপরদিকে বিদেশি টিমগুলির খেলোয়াড়দের মধ্যে কৌশল রপ্ত করার ব্যাপার ছিল যন্ত্রের মত। প্রয়োজন মত একজন ডিফেন্সের খেলোয়াড় যেমন উঠে এসে প্রতিপক্ষ দলের গোল-সীমানায় চলে যাচ্ছিল তেমনি ফরোয়ার্ড লাইনেরও কেউ কেউ দরকার হলে সময়মত নেমে এসে গোলরক্ষা করছিল। তাই চার্লসওয়ার্থ, বলাশর, মিটেন, ফিশার, ব্যাচলার, কার্লি এবং ডব-এর মত প্রত্যেক খেলোয়াড়কেই ক্রমাগত ওঠানামা করে খেলতে দেখা যাচ্ছিল। সম্ভবত ভারতের বিরুদ্ধে তাদের জয়ের এটা একটা বড় কারণ।

এইসঙ্গে আরও কয়েকটি কারণ উল্লেখ করা যেতে পারে। যেমন, ভারতীয় উপমহাদেশের খেলোয়াড়দের পুরনো খেলার পদ্ধতি। আজ দিন পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে হকি খেলায়ও অনেক নতুন নতুন টেকনিকের ব্যবহার শুরু হয়েছে। কিন্তু এই উপ মহাদেশের খেলোয়াড়েরা এখনও সেই ৫০-৬০ বছর আগেকার টেকনিকেরই প্রয়োগ করে চলেছেন–যা অনেক ক্ষেত্রেই তাদের শোচনীয় পরাজয়ের কারণ হয়ে দাঁড়াচ্ছে। অপরদিকে বিদেশি-খেলোয়াড়েরা ভারত-পাকিস্তানের ট্রাডিশনগত হকির ভাল দিকগুলো আয়ত্ত করে সেই সঙ্গে আরও নতুন নতুন কৌশল অবলম্বন করে চলেছে। যার ফলে তারা অতি সহজেই সাফল্যের দ্বারে পৌঁছতে সক্ষম হচ্ছে।

এই উপমহাদেশের শোচনীয় বিপর্যয়ের আর একটি গুরুত্বপূর্ণ কারণ উপযুক্ত প্রশিক্ষণের অভাব। বিদেশে যেখানে প্রশিক্ষণের কাজে নিত্য নতুন বিজ্ঞানসম্মত উপায় অবলম্বন করা হচ্ছে সেখানে অনুপযুক্ত এবং অসম্পূর্ণ প্রশিক্ষণ ব্যবস্থাও আমাদের পরাজয়ের আর একটি মূল কারণ।

পরিশেষে আর একটি কথা এ প্রসঙ্গে বলা উচিত। বর্তমানে বেশিরভাগ আন্তর্জাতিক খেলাই আর সাধারণ ঘাসের মাঠে হয় না। 'এস্ট্রোটার্ফ' অর্থাৎ বিশেষ ধরণের মাঠেই আজকাল হকি খেলা অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে। হল্যাণ্ড এবং পশ্চিম জার্মানির মত দেশে যেখানে এ ধরণের মাঠের সংখ্যা প্রায় শ'খানেক সেখানে ভারতে 'টার্ফ' মাঠ মাত্র দুটি। ফলে সাধারণ মাঠে দিনের পর দিন খেলার পর এই নতুন ধরণের মাঠে ম্যাচ খেলতে গিয়ে খুব স্বাভাবিকভাবেই আমাদের খেলোয়াড়েরা অনেক অসুবিধার সম্মুখীন হয়। কারণ সাধারণ ঘাসের মাঠের চেয়ে টার্ফ মাঠ অনেক বেশী গতিশীল। এখনও সময় আছে। নিরন্তর অভ্যাস, সুস্থ এবং উপযুক্ত পরিবেশ, আরও পর্যাপ্ত প্রশিক্ষণ এবং নিজেদের ভুলভ্রান্তির সঠিক মূল্যায়নের মাধ্যমে এখনও ভারতীয় উপমহাদেশ হকিতে তার হৃত গৌরব ফিরে পেতে পারে। কিন্তু এর জন্য খেলোয়াড়দের সঙ্গে সঙ্গে প্রশিক্ষক, ব্যবস্থাপক এবং রাষ্ট্রীয় কর্মকর্তাদেরও বিশেষ ভূমিকা পালনে সক্রিয় হতে হবে।

–মনীশ দেব

মার্কসবাদী কমিউনিস্ট পার্টি ধর্মীয় রাজনীতিতে জড়িয়ে পড়ছে ?

বিতর্কের আবর্তে মুখ্যমন্ত্রী নৃপেন চক্রবর্তি

সাম্প্রতিক ধর্মীয় ভেদবুদ্ধির ঝড় জাতীয় সংহতির সামনে এনেছে এক কঠিন চ্যালেঞ্জ, তখনই ত্রিপুরার মার্কসবাদী সরকার মুসলিম ছাত্রছাত্রীদের জন্য ঘোষণা করেছেন বিশেষ সুযোগ সুবিধা। এ সহায়তা না রাজনীতি ? এই ঘোষণার পরিপ্রেক্ষিতে উপজাতি জনমানস কি ক্ষিপ্ত হয়ে উঠবে ? ধর্ম যাদের চোখে অহিফেন, তারা কেন হঠাৎ এত বিশেষ সম্প্রদায়ের প্রতি সহানুভূতিশীল হয়ে উঠলেন। সীমান্ত প্রদেশের এক গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক বিতর্কের দিকে সত্যেন্দ্র চক্রবর্তীর আলোকপাত।

'ধর্ম নিরপেক্ষ রাষ্ট্র হিসেবে ভারতে হিন্দু-মুসলিম-খ্রীষ্টান-বৌদ্ধ আমরা সবাই সমান অধিকার ভোগ করছি। আমাদের সংবিধানে এস.সি, এস.টি ও অন্যান্য কটি অনুন্নত শ্রেণীর জন্য শিক্ষা ও চাকুরি ক্ষেত্রে বিশেষ সংরক্ষণের ব্যবস্থা আছে। কিন্তু সাম্প্রতিক কালে দেশের বিভিন্নাংশে জাতপাত, ধর্মান্ধতা ও আঞ্চলিক ভেদবুদ্ধি, জাতীয় সংহতির সামনে যে চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে দিয়েছে, এ অবস্থায় সমগ্র বিষয়টিই নতুন করে পর্যালোচনা হওয়া প্রয়োজন। ধর্ম নিরপেক্ষতার লক্ষ্যে পৌঁছতেই এটা খুবই জরুরী।'

বলছিলেন আগরতলা বার-এর বিশিষ্ট মুসলিম তরুণ এ্যাডভোকেট মিঃ তোরাব আলী সাহেব, তার আগরতলার আখাউড়া রোডস্থিত বাসভবনের ড্রইংরুমে বসে। মার্কসবাদী কম্যুনিষ্ট পার্টি নেতৃত্বাধীন ত্রিপুরার বামফ্রন্ট সরকার রাজ্যের মুসলীম ছাত্রছাত্রীদের জন্য সম্প্রতি বিশেষ সুযোগ সুবিধা ঘোষণা করেছেন, এ নিয়ে উদ্ধৃত বিতর্ক প্রসঙ্গে এ্যাডভোকেট শ্রী আলী তার মতামত ব্যক্ত করছিলেন।

ওই সরকারী সিদ্ধান্ত প্রসঙ্গে শ্রী আলির অভিমত : 'সংবিধান সম্মত ভাবে কোন আইন প্রণয়ন ব্যতিরেকে কোন বিশেষ ধর্মাবলম্বীদের জন্য এ ধরনের সুযোগ সুবিধা ঘোষণা ত্রিপুরার মার্কসবাদীদের রাজনৈতিক ধান্দাবাজি ছাড়া আর কি ? এরা তো ত্রিপুরার শাসন ক্ষমতায় বসার আগেই মুসলিমদের স্বার্থ নিয়ে বড় বড় বুলি আউড়েছিলেন। কিন্তু বিগত ৯ বছরের মধ্যে তারা এ রাজ্যের মুসলিমদের স্বার্থে কি করেছেন ? কোন প্রতিশ্রুতিই তো পূরণ হয়নি। অশিক্ষা, দারিদ্র আর অজ্ঞতার অন্ধকারে হাতড়াচ্ছে সংখ্যালঘু মুসলিমরা।

ওয়াকফ বোর্ড এরা পুনর্গঠন করেছেন কিছু অযোগ্য দলীয় লোকদের দিয়ে। বোর্ডের লক্ষ লক্ষ টাকা নানা পথে গায়েব হয়ে যাচ্ছে। জবর-দখলকৃত ওয়াকফ সম্পত্তির এক বিন্দুও তো আজও উদ্ধার হয়নি। মাদ্রাসা মসজিদের সংস্কার ইত্যাদি প্রত্যাশিত ভাবে হচ্ছে কোথায় ? দুর্নীতিবাজ কিছু লোক আখের গুছিয়ে নিচ্ছে।

শিক্ষাদীক্ষার প্রসারে সরকারী বিশেষ সুযোগ সুবিধা, সে তো ভালই। কিন্তু সেটা ধর্মীয় ভিত্তিতে কোন বিশেষ সম্প্রদায়ের জন্য না হয়ে সামগ্রিক ভাবে অর্থনৈতিক অনগ্রসরতার ভিত্তিতে হওয়াই অধিক বাঞ্ছনীয় বলে মনে করি। ধর্মীয় ভিত্তিতে
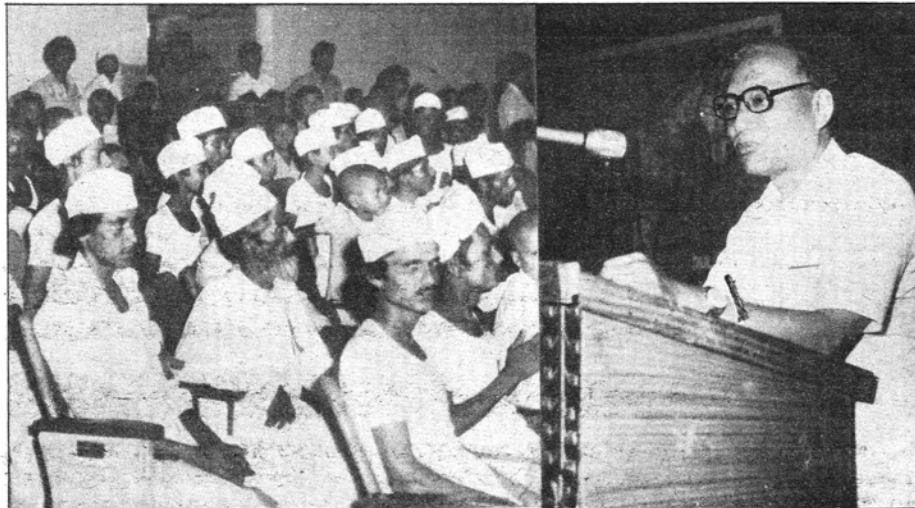
রাজ্যব্যাপী মুসলিম সমাবেশে উপ মুখ্যমন্ত্রী দশরথ দেব

এ ধরনের সুযোগ সুবিধা বিভিন্ন জাতিগোষ্ঠীর মধ্যে ভুল বোঝাবুঝি ও বিদ্বেষ সৃষ্টিতেই সহায়ক হবে বলে আমার ধারণা।'

ত্রিপুরা সরকারের যে সার্কুলারটি ঘিরে এত বিতর্ক সেটি ইস্যু করা হয়েছে সম্প্রতি। ত্রিপুরা সরকারের শিক্ষা অধিকর্তা, এফ-৯(৩) ডি এস ই ৮৬ নং সার্কুলারে রাজ্যে বসবাসকারী শুধুমাত্র মুসলিম ছাত্রছাত্রীদের কাছ থেকে শিক্ষা ক্ষেত্রে বিশেষ মেধার ভিত্তিতে স্টাইপেণ্ড প্রদানের জন্য আবেদন পত্র আহ্বান করেছেন। ওই সার্কুলারের ভাষা অনুযায়ী রাজ্যে স্থায়ীভাবে বসবাসকারী মুসলিম ছাত্রছাত্রীদের প্রথম শ্রেণী থেকে দশম শ্রেণী পর্যন্ত একশো জনকে মাসিক ৫০ টাকা, এগার-বার ক্লাসের মোট ১৫ জনকে মাসিক ২০০ টাকা, বার ক্লাস থেকে স্নাতক স্তর পর্যন্ত মোট ৩৫ জনকে মাসিক ২০০ টাকা এবং স্নাতকোত্তর শ্রেণীর ২০ জন ছাত্রছাত্রীকে মাসিক ৩০০ টাকা হারে বিশেষ স্টাইপেণ্ড প্রদান করা হবে।

এছাড়া শিক্ষা ক্ষেত্রে মুসলিম ধর্মাবলম্বীদের উৎসাহিত করার লক্ষ্যে বইপত্র ইত্যাদি কেনার জন্যও সরকারী অনুদান প্রদানের কথা ঘোষণা করা হয়েছে। ১৯৮৬ সালের ১লা এপ্রিল থেকে এই সিদ্ধান্ত কার্যকর হবে।

পত্রপত্রিকায় ওই সার্কুলারটি প্রকাশিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই বিভিন্ন মহলে এর তীব্র প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়। অভিযোগ ওঠে, ত্রিপুরার শাসক মার্কসবাদী কম্যুনিস্ট দল জাতীয় ধর্মনিরপেক্ষতার নীতি উপেক্ষা করেছেন। সমাজের অর্থনৈতিক দিক থেকে অনগ্রসর সব সম্প্রদায়ের ছাত্রছাত্রীদের পরিবর্তে শুধু একটি বিশেষ ধর্মের লোকেদের জন্য এধরনের সুযোগ দানের সিদ্ধান্ত ঘোষণা করে তাঁরা অন্যায় করেছেন। বিধানসভার আসন্ন নির্বাচনকে সামনে রেখে সংখ্যালঘু শ্রেণীর একটি বিশেষ সম্প্রদায়কে তুষ্ট করার জন্যই বিশেষ উদ্দেশ্যে এই পক্ষপাতমূলক সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।

Government of Tripura
Education Department

Dated Agartala, the 21st ... 1986.

NOTIFICATION

Subject:- Stipends to Muslim students

The following stipends and Book-grant will be granted on the basis of merit ... Indian Muslim students who are permanent resident of Tr... and who have taken admission in ... Educational Institutions in India. This will take effect from ... 1986 or from the date of admission whichever is later.

Stage	Stipend	Book-grant
1. Pre-Matric upto Class X.	Rs.50/-(fifty) per month to [illegible] students except for two months on account of summer and Puja Vacation.	Class-I to V @ Rs.20/-(Twenty) each. Class-VI to VIII Rs.30/-(thirty) each. Class-IX to X @ Rs.50/-(fifty) each.
2. Post-Matric (for Class-XI & XII)	Rs.200/-(two hundred) p.m. to 15 students and as above.	Rs.120/-(one-hundred twenty) each.
3. Post Matric (above Class XII stage)	Rs.200/-(two hundred) p.m. to 35 students and as above.	Rs.200/-(two-hundred) each.
4. Post Graduate	Rs.300/-(Three hundred) p.m. to 20 students and as above.	Rs.300/-(three-hundred) each.

25% (twenty five per cent) are reserved for girl ... Muslim students, for want of which stipends will be awarded to male muslim students.

Sd/ A.K. ...
COMMISSIONER

মুসলিম ছাত্রছাত্রীদের স্টাইপেণ্ড-এর সীমা এবং পরিমাণ

পত্রপত্রিকায় সার্কুলারটি প্রকাশিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই বিভিন্ন মহলে এর তীব্র প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়। অভিযোগ ওঠে, ত্রিপুরার শাসক মার্কসবাদী কম্যুনিস্ট দল জাতীয় ধর্মনিরপেক্ষতার নীতি উপেক্ষা করেছেন।

ত্রিপুরা প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি নরেশ ভট্টাচার্য্য বলেন শুধুমাত্র মুসলিম ধর্মাবলম্বীদের জন্য এ ধরনের বিশেষ সুযোগ ত্রিপুরার মার্কসবাদীদের বিভেদকামী ভোট-রাজনীতিরই ফলশ্রুতি। এ ধরনের কার্যকলাপ হিন্দু-মুসলিম সম্প্রীতি তথা জাতীয় ঐক্য ও সংহতির পরিপন্থী। সরকারীভাবে এ ধরনের ভেদবুদ্ধির প্রবণতা বন্ধ না হলে পরিণতি মারাত্মক হতে পারে।

ভারতীয় জনতা পার্টির ত্রিপুরা রাজ্য কমিটির সাধারণ সম্পাদক প্রদ্যোৎকুমার ধর বলেন যে কোন সরকারই কোন বিশেষ ধর্মাবলম্বীদের জন্য বিশেষ সুযোগ সুবিধা ঘোষণা করতে পারেন না। এটা সংবিধান বিরুদ্ধ।

ত্রিপুরার মার্কসবাদীরা ধর্মীয় রাজনীতিতে ঝুঁকে পড়েছে—এই প্রবণতা চলতে দেওয়া হলে রাজ্যে সাম্প্রদায়িক সেন্টিমেন্ট গ্রো করবে এবং তার পরিণতি হবে ভয়াবহ। জাতীয় সংহতির পক্ষেও এ ধরনের কার্যকলাপ প্রতিবন্ধক স্বরূপ।

ত্রিপুরার অন্যান্য বিরোধী দলগুলিও এই সরকারী সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেছে।

প্রশ্ন উঠেছে, ত্রিপুরার শাসক সি পি এম কি তাদের বহু কথিত মার্কসীয় ধ্যানধারণা বিস্মৃত হয়ে শেষ পর্যন্ত ধর্মকেই রাজনৈতিক কৌশল হিসেবে বেছে নিয়েছে?

১৯৮০'-র অক্টোবর। দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলা-সদর উদয়পুরের রমেশ স্কুলমাঠে ডাক দেওয়া হয়েছে এক মুসলিম সমাবেশের। প্রধান বক্তা, মার্কসবাদী তাত্ত্বিক নেতা মুখ্যমন্ত্রী নৃপেন চক্রবর্তী। শ'দুয়েক মুসলিম জনতার সমাবেশে ভারতবর্ষে মুসলিমদের দুর্দশার কথা ব্যাখ্যা করে প্রধান মার্কসিস্ট নেতা বললেন

'ধর্মীয় জাতি গোষ্ঠীগত বা অন্যরকম সংখ্যালঘুদের প্রতি সরকারী মনোভাব থেকে একটি সরকারের প্রমাণ হয়। কিন্তু এটা খুবই দুর্ভাগ্যজনক যে, ভারতের সংখ্যালঘুদের এবং তাদের ভাষা, ধর্ম, সাংস্কৃতিক রীতিনীতি এবং জীবন ধারণ পদ্ধতিকে সমানভাবে মর্যাদা দান, রক্ষা ও উন্নয়ন করা হয় না। মুসলিম সংখ্যালঘুদের দ্বিতীয় শ্রেণীর নাগরকিদের মত দেখা হয়। শিক্ষায় তারা এখনো পিছিয়ে, চাকরিতে তাদের নিরাপত্তা নেই। প্রায় সমস্ত সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার সময় দেখা গেছে, পুলিশ হিন্দুদের বা সংখ্যাগুরুদের পক্ষ নিয়েছে—যার ফলে পুলিশ বাহিনী সম্পূর্ণ নিষ্ক্রিয় রয়েছে।

ত্রিপুরার মুসলিমদের ব্যাপারে মার্কসবাদীদের দৃষ্টি ব্যাখ্যা করে নৃপেনবাবু বলেন বামফ্রন্ট সরকার সব সময়ই সংখ্যালঘুদের পাশে থাকেন। তাদের শিক্ষাদীক্ষা, নিরাপত্তা ও সুরক্ষার ব্যবস্থা করেন। এজন্য যদি বামফ্রন্টকে সাম্প্রদায়িক বলা হয়, বলুক, আমরা ভ্রূক্ষেপ করি না। এরাজ্যে মুসলিমরা বঞ্চিত, অবহেলিত। কংগ্রেস সরকার

সরকারি প্রচেষ্টায় আগরতলায় **মুসলিম সংস্কৃতি প্রতিযোগিতা**

তাদের জন্য কিছুই করেনি। বামফ্রন্ট সরকার এরাজ্যের মুসলিমদের জন্য কিছু করার নৈতিক তাড়না বোধ করছেন।

নৃপেনবাবুর বক্তব্য শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই সমাবেশে এক অপ্রত্যাশিত নাটকীয় ঘটনার অবতারণা হল। জনতার মধ্যে থেকে এক যুবক ডায়াসের দিকে ছুটে এলেন। লাউড স্পীকারটা মুখের সামনে ধরে ক্রুদ্ধস্বরে বলতে লাগলেন

'ভারত ধর্ম নিরপেক্ষ দেশ। এই ত্রিপুরায় আমরা হিন্দু, মুসলিম, পাহাড়ি, খ্রীষ্টান সবাই একসঙ্গে বাস করি। কিন্তু মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী কি বলবেন–এই সমাবেশটি শুধুমাত্র মুসলিমদের জন্যই ডাকা হল কেন?'

অপ্রত্যাশিত ঘটনার আকস্মিকতায় হতভম্ব নৃপেনবাবু বিষন্ন বদনে সমাবেশ থেকে উঠে পড়েন। সেদিন ওই প্রশ্ন রেখেছিল উদয়পুরের খিল পাড়ার আব্বাস মিঞা। এক শিক্ষিত বেকার তরুণ। এই প্রতিবেদককে বললেন মার্কসবাদীরা তো সাম্যবাদের বুলি আওড়ায়। সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি ও সংহতির কথা বলেন। কিন্তু এই জাতপাত ভিত্তিক সভা সমাবেশের দ্বারা কি জাতীয় সংহতি সুদৃঢ় হবে?

এর পরেও নৃপেনবাবু রাজ্যের মুসলিম অধ্যুষিত কয়েকটি মহকুমায় মুসলিম সমাবেশে বক্তব্য রাখেন এবং সেসব পত্রপত্রিকায় ফলাও করে প্রচার করা হয়। ১৩ অক্টোবর ১৯৮৪ তারিখে মুসলিমদের ২১ দফা সম্বলিত একটি স্মারকপত্র মার্কসবাদী দলের ছাত্র সংগঠন এস এফ আই'এর পক্ষ থেকে মুখ্যমন্ত্রী ও উপমুখ্যমন্ত্রীর হাতে তুলে দেওয়া হয়। এবং নৃপেনবাবু কিছু প্রতিশ্রুতি রূপায়ণের আশ্বাস দেন।

১৯৮১'র ২৮ জুন। ত্রিপুরা সরকারের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রক এক বিজ্ঞপ্তি জারি করেন ত্রিপুরা সশস্ত্র পুলিশে মুসলিম কনস্টেবল নিয়োগ করা হবে। এবং শুধুমাত্র মুসলিম ধর্মাবলম্বীরাই আবেদনের যোগ্য। ত্রিপুরা সরকারের প্রেস রিলিজে আহ্বান জানানো হয় যে সমস্ত মুসলিম প্রার্থী এখনো কর্মবিনিয়োগ কেন্দ্রে নাম নথিভুক্ত করেন নি, তারা যেন অবিলম্বে তা করে নেন।

৪ সেপ্টেম্বর ১৯৮১। ধর্মীয় ভিত্তিতে ওই নিয়োগের ঘোষণাকে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে গৌহাটি হাইকোর্টের আগরতলা ডিভিশন বেঞ্চ-এ একটি রীট পিটিশন দাখিল করা হয়। কেস নং সিভিল কোড–২০২।৮১।

বিচারপতি মিঃ আনসারি এবং বিচারপতি ইবোতম্বি সিং-এর ডিভিশন বেঞ্চ ওই দিনই সরকারী ঘোষণাকে বৈধ নয় বলে মন্তব্য করে ইনজাংশন জারি করেন। সংবাদ ছড়িয়ে পড়লে তীব্র প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়। শাসক সি পি এমের নেতৃমহল ও কর্মীদের মধ্যে রাজ্য নেতৃত্বের বিরুদ্ধে গুঞ্জন ওঠে।

৫ সেপ্টেম্বর মুখ্যমন্ত্রী নৃপেনবাবু প্রেসনোট মারফত ঘোষণা করেন রাজ্য সরকার স্পষ্টভাবে জানাতে চান যে–সরকারের কোন দপ্তরেই ধর্মীয় ভিত্তিতে নিয়োগের ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি।

১৯ নভেম্বর বামফ্রন্ট মন্ত্রীসভার বৈঠকে

নৃপেনবাবুর বক্তব্য শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই সমাবেশে এক অপ্রত্যাশিত নাটকীয় ঘটনার অবতারণা হল। জনতার মধ্যে থেকে এক যুবক ডায়াসের দিকে ছুটে এলেন। লাউড স্পীকারটা মুখের সামনে ধরে ক্রুদ্ধস্বরে বলতে লাগলেন: 'ভারত ধর্ম নিরপেক্ষ দেশ। এই ত্রিপুরায় আমরা হিন্দু, মুসলিম, পাহাড়ি, খ্রীষ্টান সবাই একসঙ্গে বাস করি। কিন্তু মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী কি বলবেন–এই সমাবেশটি শুধুমাত্র মুসলিমদের জন্যই ডাকা হল কেন?'

কিছু বাদানুবাদের পরে ওই সিদ্ধান্ত প্রত্যাহার করে নেওয়া হয়। মামলাটি এখনো বিচারাধীন। এ প্রসঙ্গে অনুসন্ধানে জানা যায় মাত্র কিছুদিন আগে মুখ্যমন্ত্রী নৃপেনবাবু উত্তর ত্রিপুরায় এক মুসলিম সমাবেশে কিছু আশ্বাস দিয়েছিলেন।

তারপরেই স্বরাষ্ট্র দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মুখ্যমন্ত্রী নৃপেনবাবু হেসে সেক্রেটারিকে ডেকে পাঠিয়ে কিছু কনস্টেবল নিয়োগের ব্যবস্থা করতে নির্দেশ দিয়েছিলেন।

ত্রিপুরায় মুসলিম জনসংখ্যা মোট ১,০৩,৯৬২ জন। মোট জনসংখ্যার ৬.৬৮ শতাংশ। এটা ১৯৭১ সালের পরিসংখ্যান। ১৯৮১ সালের জনগণনা রিপোর্টে মুসলিম জনসংখ্যার উল্লেখ নেই। তিন দিকে ৮৬০ কিলোমিটার ব্যাপী বাংলাদেশ সীমান্ত ঘেরা পার্বত্য রাজ্য ত্রিপুরায় রাজ আমল থেকেই বসতি গড়তে শুরু করে। সবাই আসে তদানীন্তন পূর্ব পাকিস্তান থেকে কাজের সন্ধানে। কর্মঠ, পরিশ্রমী হিসেবে এরা এখানে সমাদৃত হন। ষাটের দশকে তদানীন্তন পূর্ব পাকিস্তানে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার শিকার হয়ে হাজার হাজার বাঙালী হিন্দু এখানে এসে আশ্রয় নিতে থাকে। এসময় থেকে সত্তর দশক পর্যন্ত সম্পত্তির স্বত্ব বিনিময়ের মাধ্যমে বহু মুসলিম বিভিন্ন কারণে পূর্ব পাকিস্তানে চলে যায়। এক্ষণে অবশ্য সেই অস্থিরতার অবসান ঘটেছে।

১৯৭৮ সালে ত্রিপুরায় মার্কসবাদী কম্যুনিস্ট পার্টির নেতৃত্বে বামফ্রন্ট সরকার গদিতে বসে। মুখ্যমন্ত্রী নৃপেনবাবু একাধারে সরকার ও দলের কর্মসূচীর নিয়ন্তা। ওই নির্বাচনী প্রচারাভিযানে মুসলিম অধ্যুষিত অঞ্চলে নৃপেনবাবু এবং অন্যান্য নেতারা প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন–ক্ষমতায় গেলে

আগরতলার এম এল এ হোস্টেল এখন মুসলিম ছাত্রাবাস

শিক্ষা ও চাকুরি ক্ষেত্রে মুসলিমদের জন্য সংরক্ষণ ব্যবস্থা চালু করা হবে। আরো নানান প্রতিশ্রুতি। কারণ কংগ্রেস শাসনে মুসলিমদের জন্য কিছুই করা হয়নি।

সংখ্যালঘু মুসলিমদের নিয়ে মার্কসবাদী নেতা নৃপেনবাবুর কৌশলের রাজনীতির বিরুদ্ধে পার্টির অভ্যন্তরেই তীব্র আপত্তি ওঠে। নৃপেনবাবু জবাবে বলেন একটা পার্টিকে দাঁড় করাতে হলে সময় বুঝে সম্ভাব্য সব কৌশলই নিতে হয়। লেনিনও সেটা করেছেন। বাস্তবের সঙ্গে তত্ত্বকে মিলিয়ে চলতে গেলে অভীষ্ঠ লক্ষ্যে পোঁছানো অসম্ভব।

ওই নির্বাচনে ৬০ সদস্যের ত্রিপুরা বিধানসভায় বামফ্রন্ট ৫৬ টি আসন লাভ করে নজির সৃষ্টি করে। চারজন মুসলিম বিধায়ক। একজনকে মন্ত্রী করা হয়। বর্তমান দ্বিতীয় বামফ্রন্ট মন্ত্রীসভায়ও তিনি মন্ত্রী।

১৯৭৮ থেকে ৮৬। আগামী বছরের নির্বাচনে মার্কসবাদীদের সামনে বড় চ্যালেঞ্জ। মুসলিমদের জন্য চাকুরি বা শিক্ষাক্ষেত্রে সংরক্ষণ ব্যবস্থা চালু হয়নি। তবে এর মধ্যে যা হয়েছে তা হল: ১৯৭৮ সালের ১৮ জানুয়ারি ত্রিপুরা ওয়াকফ বোর্ড পুর্নগঠিত হয়েছে। ১১ জন সদস্যই সি পি এম দলের। ত্রিপুরায় ১৯৫৫ সালে প্রথম ওয়াকফ বোর্ড হয়। চলতি বছর বোর্ডের জন্য বরাদ্দ হয়েছে—৬,১৬০,-০০.০০ টাকা। বোর্ডের কর্মকর্তাদের বিরুদ্ধে ইতিমধ্যেই নানা অভিযোগ উঠেছে।

রাজধানী আগরতলায় এম এল এ হোস্টেলটিকে মুসলিম ছাত্রাবাসে রূপান্তরিত করা হয়েছে। উত্তর ও দক্ষিণ ত্রিপুরায় মুসলিম ছাত্রাবাস, রেস্টহাউস হয়েছে। মুসলিম ধর্মাবলম্বীদের নিয়ে এসব তৎপরতায় প্রতিক্রিয়া হিসেবে বিশ্ব হিন্দু পরিষদের কাজকর্মও ক্রমেই প্রসারিত হচ্ছে। এই ধর্মীয় প্রবণতার পরিণতি নিয়ে অনেকেই আশংকিত। কিন্তু বর্তমান সমাজ ব্যবস্থায় মুসলিম ছাত্রাবাসের প্রয়োজন জরুরী কিনা—এ প্রশ্নের জবাবে সোনামুড়ার মহম্মদ ফিরোজ মিঞা বলেন 'স্কুল-কলেজে সবাই তো একসঙ্গে পড়ছি, কোথাও কোন বৈষম্যমূলক আচরণের ইঙ্গিত পাইনি। পৃথক ছাত্রাবাসের প্রয়োজন আছে বলে তো মনে হয় না।' ফিরোজ আগরতলার সান্ধ্য কলেজের দ্বিতীয় বর্ষের ছাত্র। নজরুল ছাত্রাবাসের আবাসিক। বলল 'হিন্দু, মুসলিম, পাহাড়ি, খ্রীষ্টান সবাই একসঙ্গে থাকতে পারলেই তো পারস্পরিক বোঝাপড়া ও সংহতির পথ সুগম হয়।'

উদয়পুরের আবদুল হুসেন। বেকার, স্নাতক। ৮ বছর ধরে চাকুরির জন্য ঘুরছেন। বললেন সি পি এম তো কত প্রতিশ্রুতিই দিয়েছিল। নয় বছরে এরা কি করেছেন? আমাদের গ্রামেই তো ১০ জন শিক্ষিত বেকার হতাশায় ধুঁকছে। হুসেনের সঙ্গী বন্ধুটি স্থানীয় বিশিষ্ট সি পি এম ক্যাডার। মুসলিম, বেকার স্নাতক। ক্ষোভের সুরে বললেন: আমাদের মার্কসবাদী নেতারা যে ধর্মীয় সংখ্যালঘুর সেন্টিমেন্টে সুড়সুড়ি দিয়ে রাজনীতি করছেন, তা গত ন'বছরেই ঢের বুঝতে পেরেছি। পার্টি করি বলে মুখ খুলতে পারছি না। দয়া করে আমার নামটা লিখবেন না কিন্তু। তাহলে ক্ষতি হয়ে যাবে।

মুসলিম ধর্ম ও সংস্কৃতির বিকাশ নিয়ে ত্রিপুরার মার্কসবাদী সরকার গভীর তৎপর। ১৫ সেপ্টেম্বর ১৯৮৬ তারিখটি মুসলিমদের শোকের উৎসব। পবিত্র মহরম। ত্রিপুরা সরকারের তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের উদ্যোগে রাজ্যব্যাপী 'ঐশ্লামিক সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা' অনুষ্ঠিত হয়। রাজধানী আগরতলায় মুসলিম সমাবেশ ও নাচগানের পাশাপাশি লাঠি খেলা, কিরিজ খেলা প্রভৃতি প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়।

এ প্রসঙ্গে সোনামুড়ার মহম্মদ সামসুল হক বললেন 'মুসলিম ধর্ম নিয়ে রাজনীতি করার এই অধিকার ত্রিপুরার মার্কসবাদী সরকারকে কে দিয়েছে? এরা কি একবারও ভেবে দেখেছেন, এর প্রতিক্রিয়া ভয়াবহ হবে? হিন্দুদের উৎসব নিয়েও এসব করা হচ্ছে। ভোটের জন্য মার্কসবাদীরা শেষ পর্যন্ত ধর্মকেই বেছে নিল?

'কম্যুনিস্টরা তো ধর্ম মানে না। তাহলে ধর্ম নিয়ে এত হৈ চৈ কেন? ভারত ধর্ম নিরপেক্ষ দেশ। কোন ধর্মকেই রাষ্ট্রীয় ভাবে কোন অনুষ্ঠানের মাধ্যমে বিশেষ ভাবে প্রচার করা হয় না। ত্রিপুরার কম্যুনিস্টরা কি উদ্দেশ্যে ধর্মীয় সুড়সুড়ি দিচ্ছেন?'
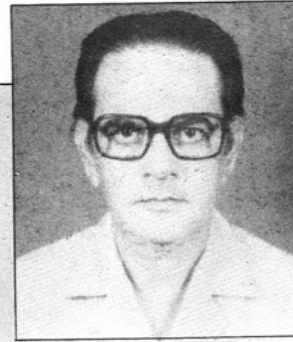
আসলে আমাদের সংবিধানই ত্রুটিপূর্ণ: জাস্টিজ এস এম আলী

সোনামুড়ার মহম্মদ সামসুল হক বললেন: 'মুসলিম ধর্ম নিয়ে রাজনীতি করার এই অধিকার ত্রিপুরার মার্কসবাদী সরকারকে কে দিয়েছে? এরা কি একবারও ভেবে দেখেছেন, এর প্রতিক্রিয়া ভয়াবহ হবে?

ত্রিপুরা বামফ্রন্ট শাসনে সম্প্রদায় ভিত্তিক বিভিন্ন সংস্থা গজিয়ে উঠছে আকছার। অল ত্রিপুরা সভাসুন্দর সমিতি, শীল সমিতি, নাথ সমিতি আরো কত কি। অধিকাংশেরই পিছনে মার্কসবাদী নেতা-মন্ত্রীরা মদতদার।

রাজ্যের প্রভাবশালী সি পি এম নেতা ও প্রাক্তন বিধায়ক অখিল দেবনাথ সম্প্রতি প্রকাশ্যেই সমাবেশে অংশ গ্রহণ করে 'অনগ্রসর' নাথ সম্প্রদায়ের সামগ্রিক বিকাশে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার আহ্বান জানান।

সি পি এম মন্ত্রী রামকুমার নাথও এক ঘরোয়া সমাবেশে অংশ নেন।

এরা সবাই মুখ্যমন্ত্রী নৃপেন চক্রবর্তীর স্নেহ ধন্য হিসেবে পরিচিত। অখিলদেব নাথের বিরুদ্ধে সরকারী অর্থের নয়-ছয় ও পার্টির শৃংখলা ভঙ্গের গুরুতর অভিযোগ ওঠে। রাজ্য কমিটির বৈঠকে বহিষ্কারের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। আজও এ সম্বন্ধে প্রকাশ্য ঘোষণা নেই। কারণ, নৃপেনবাবু এই বহিষ্কারের বিরোধী।

মুখ্যমন্ত্রীত্ব নিয়ে ত্রিপুরার শাসক সি পি এম-এর মধ্যে গোড়াতেই বিরোধ চাগিয়ে ওঠে। প্রবীন পলিটব্যুরো সদস্য নৃপেনবাবুকে ডিঙিয়ে তার একদার সহকর্মী উপজাতি নেতা দশরথ দেব মুখ্যমন্ত্রীত্বের পদ দাবি করে বসেন। অগত্যা কেন্দ্রীয় নেতারা ছুটে এসে দশরথদেবকে উপমুখ্যমন্ত্রীত্ব দিয়ে শান্ত করেন। সেই থেকে ত্রিপুরা মন্ত্রীসভা দ্বিধাবিভক্ত। সংখ্যাগুরু সমর্থন নৃপেনবাবুর অনুকূলেই। দশরথবাবুর প্রধান ভরসা রাজ্যের উপজাতি মহল।

কিন্তু বিগত ন'বছরের শাসনকালে পার্টির জনপ্রিয়তায় ভাটার সুর। ১৯৮৩'র বিধানসভা, জেলা পরিষদ, পঞ্চায়েত নির্বাচন—সব কিছুতেই ক্ষমতাসীন সি পি এমের উল্লেখযোগ্য আসন কমে গিয়েছে। এ অবস্থায় আগামী বছরের বিধানসভা নির্বাচন মার্কসবাদীদের কাছে অগ্নিপরীক্ষা, কারণ প্রশাসনিক দূর্নীতি, স্বজনপোষণ, আইন-শৃংখলার অবনতি—এসব সমস্যা মন্ত্রীসভার সামনে বড় চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দিয়েছে। আর এসবের পরিপ্রেক্ষিতেই কি অস্তিত্ব রক্ষার প্রশ্নে মার্কসবাদী কম্যুনিস্ট পার্টি ধর্মীয় রাজনীতির দিকে ঝুঁকে পড়েছে?

পার্টির অভ্যন্তরেই এ নিয়ে বিতর্ক, নানা গুঞ্জন। কর্মী, সমর্থক, ক্যাডার, ছোটবড় নেতা সব মহলেরই প্রশ্ন সাম্প্রদায়িক সেন্টিমেন্টকে ইস্যু করে রাজনীতি করা কি মার্কসীয় ধ্যানধারণার পরিপন্থী নয়? ক্ষমতায় টিকে থাকার কৌশল হিসেবে যদি ধর্মকেও শেষ পর্যন্ত আঁকড়ে ধরতে হয়—তাহলে আর কংগ্রেস ও অন্যান্য দলগুলির সঙ্গে কম্যুনিস্ট পার্টির পার্থক্য রইল কোথায়?

১৯৪৩ সালে অবিভক্ত কম্যুনিস্ট পার্টি পাকিস্তান গঠনের দাবিদার মুসলীম লীগ নেতা জিন্নাহকে সমর্থন জানিয়েছিল। এ নিয়ে পার্টির অভ্যন্তরে প্রচণ্ড মতানৈক্য দেখা দেয়।

এক্ষণে কেরালায়ও ধর্মীয় রাজনীতির সঙ্গে মার্কসবাদের সম্পর্ক নিয়ে প্রচণ্ড বিতর্ক দেখা দিয়েছে। প্রবীন মার্কসবাদী নেতা রাঘবনকে দল থেকে বহিষ্কার করা হয়েছে।

প্রশ্ন উঠেছে ত্রিপুরায়ও কি মার্কসবাদের তাত্ত্বিক নেতা ও পলিটব্যুরো সদস্য নৃপেন চক্রবর্তী সে ধরনের লাইনই অনুসরণ করে চলেছেন? আর এই প্রবণতা অব্যাহত থাকলে আখেরে মার্কসবাদী কম্যুনিষ্ট পার্টির ভাবমূর্তি কি উজ্জ্বল হয়ে উঠবে?

'আসলে আমাদের সংবিধান-টাই ত্রুটিপূর্ণ' জাস্টিস এস এম আলি

ধর্মীয় ভিত্তিতে ত্রিপুরায় মুসলিম ছাত্র ছাত্রীদের বিশেষ সুযোগ প্রদানের সরকারী সিদ্ধান্তকে ঘিরে যে বিতর্ক উঠেছে, এ সংক্রান্ত কিছু প্রশ্ন নিয়ে হাজির হয়েছিলাম গুয়াহাটি হাইকোর্টের বিচারপতি (সম্প্রতি অবসরপ্রাপ্ত) মিঃ এস এম আলীর মুখোমুখি।

ত্রিপুরা সরকারের যে সার্কুলারটি তিনি আমাকে দেখালেন তার পটভূমি না জেনে সঠিক কিছু বলা যায় না। এই সার্কুলারে সেটা নেই। যাক, সংবিধান বা সাধারণ আইন পুষ্ট না হলে কোন বিশেষ ধর্মাবলম্বীদের বিশেষ সুবিধা দান আইন-সিদ্ধ নয়–এটা বলা বাহুল্য।

আমাদের সংবিধানের প্রস্তাবনায় 'ধর্ম নিরপেক্ষ' শব্দটি ৪২ তম সংশোধনে জুড়ে দেওয়া হয়েছে। তবে দেখতে হবে সংবিধানের ঠাণ্ডা হরফ ও কার্যক্ষেত্রে কতটা সঙ্গতি আছে। আমরা চেষ্টা করছি সেই লক্ষ্যে পৌঁছতে। সংবিধানের ১৪, ১৫, ১৬ ও আরো কয়েকটি বিধিতে ধর্ম নিরপেক্ষ কথাটির পরিপূরক আছে। কিন্তু সমস্যাটা যতটা প্রশাসনিক বা রাজনৈতিক, তার চেয়ে অধিক হল সামাজিক। ভারতীয় সমাজ ব্যবস্থাটা তলিয়ে দেখুন। এখানে ধর্ম, বহু ভাষা, বহু জাতির অস্তিত্ব অনস্বীকার্য। আমাদের সাংবিধানিক কাঠামোতে এই সত্য নিহিত আছে এবং তার ভিত্তিতে সৃষ্ট মৌলিক অধিকারগুলোর সাথে আবশ্যকীয় উপ-বিধি জুড়ে দেওয়া হয়েছে। এছাড়া কটি নির্দেশ-মূলক বিধিতে বিশেষ ক্ষেত্রে বিশেষ ব্যবস্থার ইঙ্গিত আছে। তপশীল জাতি কিন্তু ধর্ম ভিত্তিক। তাই বলে কি সেকুল্যারিজম ক্ষুন্ন হয়েছে বলা যায়!

তাই যদি না হয়, তবে এরাজ্যের মুসলিম সম্প্রদায় শিক্ষায় ও সামাজিকভাবে অনগ্রসর গণ্য হয়ে কোন বিশেষ সুযোগের পাত্র হলে তা নিশ্চয় ধর্ম নিরপেক্ষতার পরিপন্থী নয়। মোট কথা এসব ক্ষেত্রে ধর্মই মূল ভিত্তি নয়। এখানে সুযোগের ভিত্তি হল ওইসব লোকের পশ্চাদপদ অবস্থা। এখানে ধর্মের উল্লেখ করা হয় শুধু পরিচিতি হিসেবে।

সমাজ ও জাতির কাঠামো পরিবর্তনশীল। সংবিধানের ৪৬ তম বিধির পরিপ্রেক্ষিতে ডিপ্রেসড ও ব্যাকওয়ার্ড ক্লাস-এবং সিডিউলড কাস্ট-এর পরিবর্তন বা পরিবর্ধন কতটা প্রয়োজন তার অনুসন্ধান যথেষ্ট হয়েছে বলে মনে হয় না। কাকা কালেলকার ও মণ্ডল কমিশনের রিপোর্ট অধিক অগ্রসর হতে পারে নি। মণ্ডল কমিশন বলছেন– ৪৬ ধারার জন্য ধর্মকেই ভিত্তি ধরতে হবে। একথা বলা দরকার যে, ৪৬ তম বিধি ভারতীয় জনসাধারণের জন্য, কোন বিশেষ ধর্মের লোকের জন্য নয়। তবে ব্যক্তিগত ভাবে আমি বর্তন সংরক্ষণ জন্য নয়। তবে ব্যক্তিগত ভাবে আমি বর্তমান সংরক্ষণ নীতির বিপক্ষে। ভারতীয় ইউনিটি ইন ডাইভারসিটিস হবে কি? আমরা সে লক্ষ্যের আশা করতে পারি কি?

সমাজের দুর্বল শ্রেণীর জন্য যেসব সুযোগ সুবিধা দেওয়া হচ্ছে–তার অতিরিক্ত আর কিছু দেওয়া প্রয়োজন কি না, তা দেখার এক্তিয়ার সরকারের আছে। এসব ব্যাপারে মতামত দেবার পূর্বে সমীক্ষা বা অনুসন্ধানের প্রয়োজন।

সামাজিক ও অন্যান্য কারণে, যেমন পরিচালনার সুবিধার্থে যদি আলাদা মুসলিম ছাত্রাবাস বা রেস্ট হাউস করা হয়, তাতে আপত্তির কারণ থাকতে পারে না। মুসলিম ছাত্রছাত্রী ও অমুসলমান ছাত্রছাত্রী একই ছাত্রাবাসে ও শাকান্নে থাকতে পারলে জাতীয় সংহতি এগিয়ে যাবে সন্দেহ নেই। কিন্তু আমাদের সমাজ সে পর্যায়ে উঠেছে কি? বিভিন্ন সমাজের ছেলেমেয়েরা সামাজিক মানসিকতার আচার ও আহারে একই পর্যায়ভুক্ত হলে ছাত্রাবাসের একত্বে আপত্তির কারণ নেই।

তোরাব আলি

আসলে বিশেষ সুযোগ সুবিধা লাভের এই যে একটা প্রবণতা প্রকট হয়ে ওঠেছে, এর বিপরীত প্রতিক্রিয়াও কিন্তু গুজরাট ও অন্যান্য স্থানে সাম্প্রতিক সহিংসতার মধ্যে দিয়ে প্রকট হয়ে ওঠেছে। কিন্তু বিশেষ সুযোগের মাপকাঠি জাতপাত ভিত্তিক হবে কেন?

আবার উভয়কে উভয়ে গ্রহণ করার প্রশ্নও আছে। ছাত্রাবাসের বিভিন্নতাই জাতীয় সংহতির পরিপন্থী–একথা বলা যায় না। আমাদের জাতীয় সংহতির সামনে তো এখন বড় চ্যালেঞ্জ জাতিভেদ, অস্পৃশ্যতা ও গণ অজ্ঞতা। এগুলির জন্য সমাজপতিরা কি করছেন?

আসলে আমাদের সংবিধানের মধ্যেই রয়েছে নানান ত্রুটি বিচ্যুতি। বিভিন্ন পরিস্থিতির সম্মুখীন হয়ে অনেক কিছুই ভাবতে হচ্ছে নতুন করে, যার ফলশ্রুতিতে স্বাধীনতার বিগত ৩৯ বছরে আনতে হয়েছে ৫২ টি সংশোধনী। জাতপাত, সংরক্ষণ নীতি প্রভৃতি বিতর্কিত প্রশ্ন নিয়ে জাতীয় ঐক্য ও সংহতি আজ কঠিন চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন।

সংরক্ষণ নীতির বিতর্কিত প্রথাগুলি উঠিয়ে দেওয়ার সাহস আমাদের রাজনৈতিক নেতাদের নেই। কেন না, তাহলে গদি হারানোর ভয় রয়েছে।

সংরক্ষণ নীতির মেয়াদ তো ছিল মাত্র দশ বছর। আজ তিন যুগ পরেও কেন সেই মেয়াদ বাড়াতেই হচ্ছে। আসলে বিশেষ সুযোগ সুবিধা লাভের এই যে একটা প্রবণতা প্রকট হয়ে ওঠেছে, এর বিপরীত প্রতিক্রিয়াও কিন্তু গুজরাট ও অন্যান্য স্থানে সাম্প্রতিক সহিংসতার মধ্যে দিয়ে প্রকট হয়ে ওঠেছে। কিন্তু বিশেষ সুযোগের মাপকাঠি জাতপাত ভিত্তিক হবে কেন অর্থ, সার্মগ্রিক অনগ্রসরতাকে এর ভিত্তি হিসেবে ধরাই উচিত বলে মনে করি। কিন্তু সেটা হচ্ছে কোথায়?

মুসলিম ছাত্রছাত্রীদের স্টাইপেণ্ড সংক্রান্ত সার্কুলারটির সঙ্গে ত্রিপুরার ক্ষমতাসীন মার্কসবাদী কমুনিষ্ট পার্টির রাজনৈতিক ধ্যানধারণার সম্পর্ক আছে কিনা এ সম্বন্ধে স্পষ্ট কিছু বলতে পারব না।

মনে পড়ে ইন্দিরাজীর অনেক ভাষণে ভারতীয় মুসলমানদের পশ্চাদপদ অবস্থা ও তাদের সুযোগ সুবিধার কথা শুনেছি। এ রাজ্যের মুসলমানদের প্রতি বিশেষ সহানুভূতির ইঙ্গিত শুনতে পেয়েছি মার্কসবাদী নেতাদের বিভিন্ন ভাষণে। এ রাজ্যে ওয়াকফ বোর্ডের কাজকর্মও সম্প্রসারিত হয়েছে বলে শুনতে পাচ্ছি।

তবে এতে মুসলিম সম্প্রদায় কতটা উপকৃত হয়েছেন সেটা বলতে পারব না। মুসলিম ওয়াকফ বোর্ড-এর প্রতিষ্ঠান পরিচালনার দায়িত্ব একভাবে বিশেষ কোন রাজনৈতিক দলেরপ্রতিনিধিদের উপর ন্যস্ত না হয়ে দলমত নির্বিশেষে নিরপেক্ষ কর্মকর্তা দ্বারাই পরিচালিত হওয়া বাঞ্ছনীয় বলে মনে করি।

"বিশ্বাস করুন, সত্যি বলছি, সার্ফ কেনার মত এমন বুদ্ধিমানের কাজ আর হয়না। এর ঐ পাওয়ার প্যাক্‌ড ফর্মূলাই আপনার পয়সার সেরা মূল্য উসুল ক'রে দেয়!"

সেরা মূল্য উস্থল করে? প্রথমতঃ সার্ফের দামই তো দারুণ বেশী?

"আচ্ছা ভাই, আপনি কি দেখতে পান না যে এ দিয়ে লাভ পাওয়া যায় কত বেশী? একমাত্র সার্ফই আমার কাপড় ধোয় সবচেয়ে সাদা ক'রে আর কাপড় রাখেও দারুণ সুরক্ষিত তাই তা দেখতেও সবসময় লাগে নতুনের মত — যার ফলে, আপনারও নানাভাবে সাশ্রয় হতে থাকে, আর, সেরা মূল্য উসুল করা বলতে, আমি ঐটিই বোঝাতে চেয়েছি।"

ঠিক আছে, মানলাম, কিন্তু ললিতা দেবী, শুধু ঐটুকুই কি সব?

"না, না, আরও আছে! সার্ফের ১/২ কিলো পাউডার অন্যান্য সাধারণ পাউডারের ১ কিলোর সমান হয়—যার মানেই হচ্ছে সাধারণ পাউডারের ১ কিলো পাউডার যতগুলি কাপড় ধোয় এর ১/২ কিলো দিয়ে ততগুলিই ধোওয়া যায়। তাহলে সার্ফ দিয়ে আরও লাভ দেখতে পাচ্ছেন তো?"

১ কিলো সাধারণ পাউডার

১/২ কিলো সার্ফ

অর্থাৎ এর মানে হ'ল, সার্ফ নিজস্ব উপায়ে আপনার পয়সা উস্থল করে...

"...আর আপনি তার লাভ পান নানান দিক দিয়ে। সস্তার জিনিষ আর ভাল জিনিষ কেনায় তফাৎ থাকে। সেইজন্যেই তো সার্ফ কেনা সবসময়ই আরও বুদ্ধিমানের কাজ।"

POWER PACKED Surf

LINTAS SU 351 2721

হিন্দুস্থান লিভারের একটি উৎকৃষ্ট উৎপাদন

আপনার সঙ্গে আজ মা দুর্গাও
দশ হাতে এঁটে উঠবে
ভোর ৬টা
সকাল ৮টা
সন্ধ্যা ৭টা
রাত ৯টা

আনন্দপান্থ

রমাপ্রসাদ ঘোষাল

তারাপীঠের মহাশ্মশানে তখন আমাবস্যার গাঢ় রাত্রি। গাছ-গাছালিতে একটানা ঝিঁঝিঁ পোকার ডাক। সামনে থেকে ভেসে আসছে পৃথিবীর একমাত্র উত্তর বাহিনী নদী দ্বারকার কুলুকুলু রব। শাল পিয়ালের গাঢ় অন্ধকারের ফাঁকে ফাঁকে দেখা যাচ্ছে জাগরী শ্মশানের অগ্নিশিখা।

কে জাগরী? কে জানে? তারাপীঠের শ্মশান জানে, আর কে জানে? নরমুণ্ড আসলে শ্মশানভৈরব জাগে। গাছের ডালে ডালে ঠকাঠক শব্দ হয়, সকলে ভয়ে ভয়ে তাকায়। এই বুঝি কোন ভূতপ্রেত হিলহিলিয়ে নেমে আসে।

পাক্কাআড়াই ঘন্টার যজ্ঞ। যজ্ঞ শেষে বীজমন্ত্র পাঠ আধা ঘন্টা। প্রতি মুহূর্তে কুমার আশা করে, এই এল। সেই স্বপ্নে দেখা ছবি। যা দেখে তার মাথা খারাপ হবার উপক্রম।

প্রায় ৫ ফুট মাপের এক বিশাল পদ্মহাতে নীলবর্ণা মা। সমগ্র আকাশ জুড়ে তাঁর ব্যপ্তি। নীল বর্ণের জ্যোতিঃ প্রকাশ। স্মিত-সৌম্য মুখে বরাভয়। যেন বলছে....

আয় ছুটে আয়, আয়রে ত্বরা

যাগ-যজ্ঞের পাট চুকিয়ে ঘরে ফিরে চলে অঘোরিনাথ। এখনো 'পুত্রেষ্টী' যজ্ঞের কি সব কাজকর্ম বাকি। গভীর নিশীথে একাকি সাধনা করবেন অঘোরিনাথ। সঙ্গে থাকবে শুধুমাত্র পুত্রেষ্টী যজ্ঞের আধার রাধেশ্যামের যুবতী পত্নী। ধ্যান শেষে মাতৃআশীষ ধারণ করবার জন্য থাকবে সে।

তাই বাকি সকলকে শুয়ে পড়তে আদেশ দেন বাবা ত্যাগীনাথ। একটি মাত্র ঘর, তাই বারান্দায়। মিথ্যে রাত জেগে শরীরকে কষ্ট দিয়ে লাভ কি।

'শরীরকে কষ্ট দিয়ে লাভ কি। মাতৃপাদপদ্মে মন রেখে শরীর যা চায় তাই কর'–এই বাণী দিয়ে ত্যাগীনাথ রাত্রি সাধনা করতে ঢুকে যান ঘরে। সঙ্গে রাধেশ্যামের পত্নী। বাকি সকলকেই বারান্দায় শুতে হয়। এমন কি স্বয়ং রাধেশ্যামকেও।

চোখে ঘুম আসে না কুমারের। সামনে চণ্ডী-পুরের কাঁচা সড়ক। তারপর ধু ধু অন্ধকারের মাঠ অমাবস্যায় স্নান করছে। ঘরের দরজা বন্ধ। ওখানে পুত্রেষ্টী যজ্ঞের শেষ পর্যায় অনুষ্ঠিত হচ্ছে।
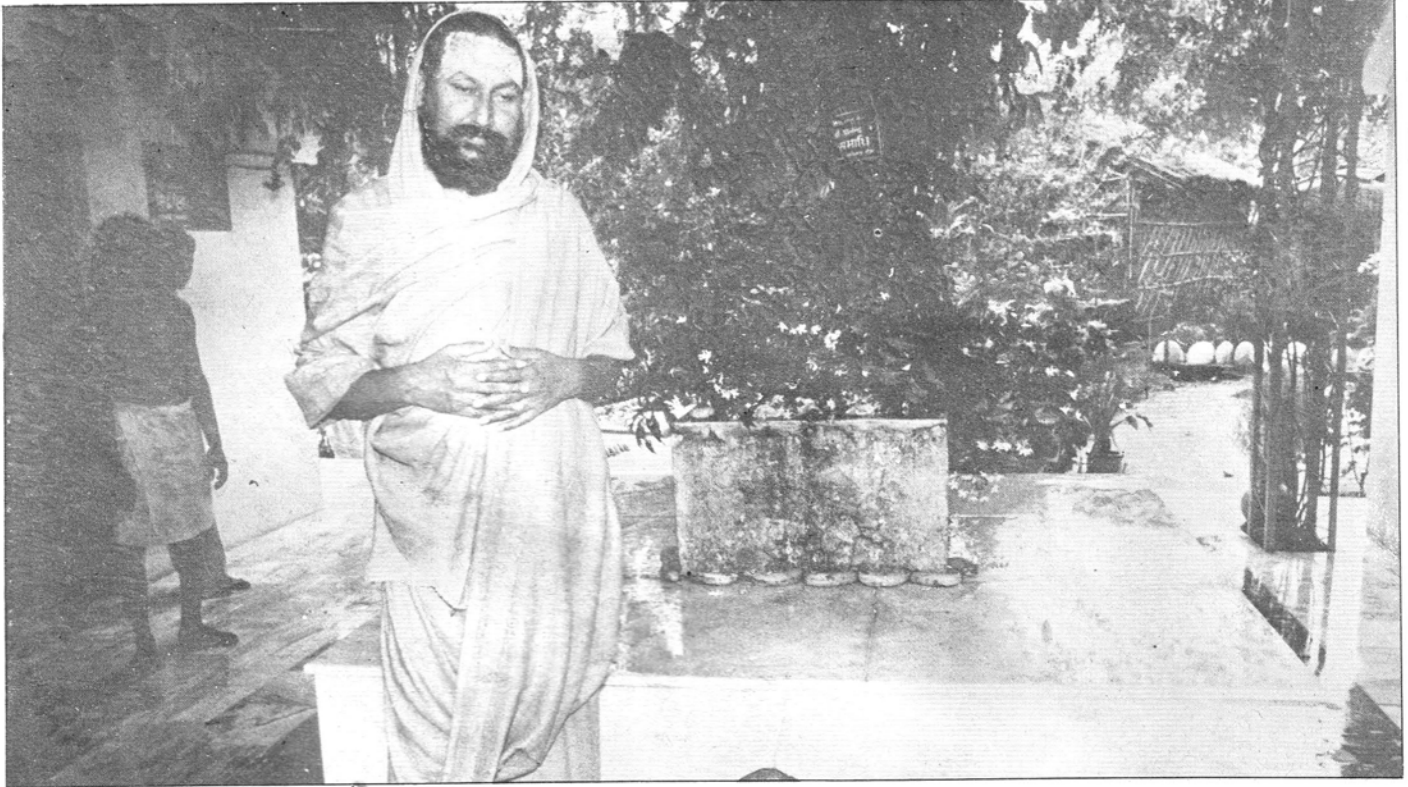
মাদুরের বিছানায় শুয়ে নিদ্রাহীন কুমার ছট-ফট করে। তবে কি অদৃশ্য সাধুবাবার কথা মিথ্যে হবে ! দশ দিনের তো আর বাকি একটি দিন। অথচ এখনও তো সে কোন ইঙ্গিত পেল না। কখন কি হয়, তাই নিদ্রাহীন কুমার জেগে থাকে।

ঘুমহীন রাত ভোর হয়। পাখি ডাকে, সূর্য ওঠে। তখনও ঘরের দরজা বন্ধ। বারান্দায় একে একে সকলেই উঠে পড়ে। আরও কিছুক্ষণ পরে দরজা খুলে বেরিয়ে আসেন অঘোরিনাথ।

চা, জলপান শেষে কুমারকে সকলের ভোজনের যোগাড় করতে হয়। কাল সাধনা হয়েছে। সেই খুশিতে ত্যাগীনাথ অঘোরিবাবা আজ নিজের হাতে ধুনীতে রান্না করে খাওয়াবেন সকলকে। কুমার কাঠ-পাতা যোগাড় করে।

ধুনীর কাঠ একটা লম্বা ছিল। হঠাৎই তার একটা খোঁচা লেগে যায় অঘোরিনাথের চোখে। ব্যাস আর যাবে কোথায়। তেলে বেগুনে জ্বলে উঠে তিনি কুমারকে বিশ্রী গালাগাল করতে থাকেন। ...হারামি কাঁহিকা।

একে সারা রাত জাগা। তায় ১০ দিন আজ শেষ হয়ে যাচ্ছে। এমনিতে মেজাজ সপ্তমে চড়ে ছিল কুমারের। তায় অশ্রাব্য গালাগালে রাজপুত্রের আত্মাভিমানে লাগে। জ্বলে ওঠে কুমার : বুজরুক কোথাকার। আমাকে কি ভস্ম করবে তুমি? মাকে দর্শন করাবে বলে এনে ফক্কিবাজি। এখন আবার ধমক দিচ্ছ। আর একটা গালাগাল করলে তোমার ঠ্যাং খোঁড়া করে দেব। চুপচাপ থাক।

ঝগড়া করে বেরিয়ে যায় কুমার। ধ্যেৎ, সব ধাপ্পা। দিনভর শ্মশানে টো টো করে ঘোরে। রাগ হয়ে যায় সেই অদৃশ্য সাধুবাবার ওপর।

পকেটে গোপনে এনেছিল ২০০ টাকা। তার থেকেই হোটেলে খাওয়া দাওয়া সারে। রাত নামতে আশ্রয় নেয় শ্মশানে।

শিবাকুণ্ডের উল্টোদিকে একটা শাল্মলী গাছের তলায় শুয়ে আছে কুমার। হঠাৎই নজর চলে যায় বশিষ্ট মুনির লক্ষমুণ্ডীর কাছে। আসন থেকে হাত দুই দূরে কে যেন প্রদীপ জ্বেলে রেখেছে।

অসীম কৌতূহলে সেখানে ছুটে যায়। সেখানে পৌঁছবার সঙ্গে সঙ্গে ঘটে যায় বড় অদ্ভুত ঘটনা। দমকা ঝড় ওঠে। নিভে যায় প্রদীপ। একটা আচমকা ধাক্কায় কুমারকে ফেলে দেওয়া হয়। সম্বিত ফিরে পেতে দেখে-সে আসনের উপর।

শিহরিত শরীরে কোন কালে সে যা শোনে নি, জানে না, ভেসে ওঠে সেই তারা-প্রণাম মন্ত্র :

প্রত্যালীঢ়পদে ঘোরে মুণ্ডমালোপোশোভিতে।
খর্বে লম্বোদরি ভীমে উগ্রতারা নমোহস্তুতেঃ।

মুহূর্তে ঝড় থেমে যায়। চতুর্দিকে হঠাৎ আসা সুগন্ধের ছড়াছড়ি। বিস্মিত ও নির্বাক কুমারের সামনে ভেসে ওঠে সেই স্বপ্নে দেখা মাতৃমূর্তি। অসামান্য রূপে নীলবর্ণা মা নীল সরস্বতী। হাতে সেই বিশাল পদ্মফুল। মুখে স্নেহমাখা হাসি।

বোবা হয়ে যায় কুমার। চোখ বেয়ে নামে আনন্দ-অশ্রু। মুগ্ধ, আবেশবিহ্বল কুমার। অনন্ত জ্যোতির্ময়ী মা ব্রহ্মময়ী সামনে। তবু কিছু চাইবার নেই তার :

ওঁ শরণাগত দীনার্ত পরিত্রাণ পরায়ণে
সর্বস্যার্তি হরে দেবী নারায়ণী নমোহস্তুতেঃ।

মা, আমি তোমার শরণ নিলাম। তুমি আমায় পরিত্রাণ কর মা।

বরাভয় হাসিতে মাতৃকণ্ঠ শোনে কুমার গুপ্ত পীঠ কামরূপ কামাখ্যাতীর্থে যাও। পরিচিত হও রমণীকান্ত দেবশর্মনের সঙ্গে। সেখানেই মিলবে তোমার আকাঙ্খিত ফল। [ক্রমশ:]

মুহূর্তে ঝড় থেমে যায়। চতুর্দিকে হঠাৎ আসা সুগন্ধের ছড়াছড়ি। বিস্মিত ও নির্বাক কুমারের সামনে ভেসে ওঠে সেই স্বপ্নে দেখা মাতৃ-মূর্তি। অসামান্য রূপে নীলবর্ণা মা, নীল সরস্বতী। হাতে সেই বিশাল পদ্মফুল। মুখে স্নেহমাখা হাসি।

আর্তনাদের নায়িকা ঈশানী ব্যানার্জি কোন আর্তনাদের মুখে ?

মুনমুন, অপরিণামদর্শিতার শিকার

চিত্রতারকা ঈশানী ব্যানার্জির বাড়িতে অগ্নিদগ্ধ হয়ে মারা যায় তার বৌদি মুনমুন। বাড়ির লোকেদের মতে এটি নিছক দুর্ঘটনা হলেও মুন-মুনের বাবা ও পাড়ার লোকেদের অভিযোগ, এটি সুপরিকল্পিত হত্যাকাণ্ড। ঘটনার সঙ্গে জড়িয়ে পড়েছেন পরিচালক ও অভিনেতা চন্দন মুখার্জি। প্রশ্ন ওঠে চন্দন-ঈশানী সম্পর্ক নিয়েও। ঈশানী উত্তেজিত জনতার হাতে নিগৃহীত হয় প্রকাশ্য রাস্তায়। থানা পুলিশ, ধরপাকড়ের পর কেসটি আপাতত গোয়েন্দা দপ্তরে। কিন্তু প্রেক্ষা-গৃহের পর্দায় যার অভিনয় দেখে দর্শকরা উল্লসিত হয় তার বিরুদ্ধে কেন এই গণবিস্ফোরণ ? 'আর্ত-নাদ' এর নায়িকা ঈশানী ব্যানার্জি কোন আর্তনাদের মুখে ? সেই নেপথ্য নাটকের ওপর আমাদের নিজস্ব প্রতিনিধির আলোকপাত।

চিত্রাভিনেত্রী ঈশানী ব্যানার্জি, দুবছর ঘর ছাড়া

২৫ ডিসেম্বর ১৯৮৪। বিকেল প্রায় পাঁচটা। দক্ষিণ কলকাতার শহরতলি যাদবপুরের গান্ধী কলোনির একটি বাড়ির সামনে সহস্রাধিক মানুষের ভিড়। অর্ধেকই মহিলা। সবাই উত্তেজনায় টগবগ করছে। তাদের মুখে নানান শ্লোগান–চিৎকার আর দাপাদাপি। বাড়িটি একজন চিত্রতারকার। বাংলা ছবির উঠতি নায়িকা ঈশানী ব্যানার্জির। জনতার বিক্ষোভ তার বিরুদ্ধেই।

বাড়ির দরজা তখন ভেতর থেকে বন্ধ। ভয়ে গুটিসুটি হয়ে বসে আছেন বাড়ির লোকজন। কিন্তু দরজায় ধাক্কা পড়ছে লাগাতার। লাথির পর লাথি। অতএব হালকা টিনের দরজা ভাঙতে সময় লাগল না। কপাট ভেঙে হাট হয়ে খুলে গেল বাড়ির মুখ। আর সেই ফাঁকে বন্যার জলের মত হুড়হুড় করে ভেতরে ঢুকে গেল এক বিশাল জনস্রোত। জনতা তখন আরও উত্তেজিত। ব্যানার্জি

বাড়ির অসামাজিক কাজকর্মের বিরুদ্ধে তারা সোচ্চার। এবং সক্রিয়ও। তারা তাদের নিজেদের হাতে আইন তুলে নিল।

বাড়িতে ঢুকেই শুরু হল দক্ষযজ্ঞ। গৃহস্বামী মনোরঞ্জন ব্যানার্জি তখন বাড়িতে নেই। তাঁকে না পেয়ে ক্রুদ্ধ জনতা ঘিরে ধরল তাঁর স্ত্রী অর্চনা দেবীকে। তিনি লাঞ্ছিতা হলেন। মাকে বাঁচাবার জন্য ভেতর থেকে বেরিয়ে এল গৌরাঙ্গ ব্যানার্জি। কিন্তু তাকে দেখেই গনগনে আগুনে যেন ঘি পড়ল। উত্তেজিত জনতা অর্চনা দেবীকে ছেড়ে ঝাঁপিয়ে পড়ল তার ওপর। বেধড়ক পিটুনি। দমাদম লাথি আর কিল চড় পড়তে লাগল। কেউই এগিয়ে এল না তাদের সাহায্য করতে। গোটা এলাকাই যেন ক্ষোভে ফেটে পড়েছে। বাড়ি তছনছ হয়ে গেল। ফ্রিজ থেকে মিষ্টি, মাংস, ফলমূল, মদের বোতল ছিটকে পড়ছে রাস্তায়। ভাঙচুর হল বেশ কিছু আসবাবপত্র। এভাবে খানাতল্লাশি করতে করতেই অভিনেত্রী ঈশানী ব্যানার্জিকে পাওয়া গেল একটি ঘরের ভেতর। জনতা এতক্ষণ তাকেই খুঁজছিল। ফলে শিকার হাতে পেয়ে নতুন করে বারুদ সঞ্চার হল বিক্ষোভে। চুল ধরে হিড়হিড় করে টানতে টানতে তাকে আনা হল বাড়ির বাইরে, প্রকাশ্য রাস্তায়। ঈশানীর দুর্দশা দেখে অর্চনা দেবী হাত জোড় করে অনুরোধ করলেন, 'ওকে মেরো না। ওর রোজগারে আমাদের সংসার চলে।'

কিন্তু তখন কে কার কথা শোনে! অর্চনা দেবীর আবেদন নিস্ফল হল। রূপালি পর্দার নায়িকা নিগৃহীত হতে লাগলেন প্রকাশ্য রাস্তায়। হাজার জনতার ভিড়ে তাঁর একজন ফ্যানও খুঁজে পাওয়া গেল না। উত্তেজিত জনতা তার চুল কেটে দিল। টানা হিঁচড়ায় ঈশানী লুটিয়ে পড়েছেন রাস্তায়। কাঁদছেন হাউহাউ করে। ক্ষমা চাইছেন। কিন্তু জনতা তাকে ক্ষমা করতে রাজি নয়। তার উদ্দেশ্যে বর্ষিত হচ্ছে অশ্লীল গালাগাল। চরিত্র সম্পর্কেও নানা কথা ঘুরে বেড়াচ্ছে তাদের মুখে মুখে। ঈশানীর মুখ বিকৃত করে দেবার চেষ্টাও হচ্ছিল। কিন্তু ভাগ্যক্রমে তখনই ঘটনাস্থলে পৌঁছে যান যাদবপুর থানার সাব-ইন্সপেক্টর কালীপদ দে। ক্রুদ্ধ জনতার কোপ থেকে পুলিশই উদ্ধার করে রূপালি পর্দার নায়িকাকে। উদ্ধার করেই গ্রেপ্তার। ঈশানীর সঙ্গে তাঁর মা অর্চনা দেবী এবং দাদা গৌরাঙ্গ ব্যানার্জিকেও। গৃহস্বামী মনোরঞ্জন ব্যানার্জিকেও পুলিশ খুঁজছিল। কিন্তু তাঁকে আর পাওয়া গেল না।

এবার একটু পিছনের দিকে তাকান যাক। ২৪ ডিসেম্বর ১৯৮৪ র মাঝরাত। রাত বারটা। রাতের রঙ গাঢ় হয়ে উঠেছে যাদবপুরের শীতের আকাশে। রাস্তায় লোক চলাচল কমতে কমতে একেবারে নিশুতি। কেবল পায়চারি করছে রাম দাস। প্রতিরাতেই সে ঘুরে বেড়ায়। পাড়ার দোকান-দারদের মাইনে করা প্রহরী রাম দাস। সে রাতেও ঘুরছিল তার বাঁশের লাঠিতে খট্‌খট্ শব্দ তুলে। এমন সময় মনোরঞ্জন ব্যানার্জি ওরফে মনুবাবুর বাড়ির সামনে আসতেই তার কান খাঁড়া হয়ে যায়। বাড়ির ভেতর কারা যেন চাপা গলায় কথা বলছে ফিসফিস করে। রামদাস উৎকর্ণ। সে থমকে দাঁড়ায়।

> **লোকে বলে, প্রায়ই রাতে রূপালি দুনিয়ার এক কুশীলব আসেন উঠতি নায়িকা ঈশানীর কাছে। কখনো কখনো তাঁর ইয়ার বন্ধুরাও। রাতের কাজল পরে গোটা এলাকা যখন ঘুমের নেশায় ঢলে পড়ে তখন মনুবাবুর বাড়ির ভেতর শুরু হয় অন্য আসর। সাকী ও শরাবের ছোটখাটো মহফিল জমে ওঠে।**

মনুবাবুর ২৪ বছরের মেয়ে ঈশানী। দেখতে সুন্দরী। অঙ্গে অঙ্গে যৌবনের পল্লবিত সুষমা। গ্ল্যামারও যথেষ্ট। ঈশানী সিনেমায় অভিনয় করে। কিন্তু তার সাথে আজকের ফিসফিসানির কি সম্পর্ক? রামদাস জানে না। তবে শুনেছে অনেক কথাই। লোকে বলে, প্রায় রাতেই রূপালী দুনিয়ার এক কুশীলব আসেন এই উঠতি নায়িকার কাছে। কখনো কখনো তাঁর ইয়ার বন্ধুরাও। রাতের কাজল পরে গোটা এলাকা যখন ঘুমের নেশায় ঢলে পড়ে তখন মনুবাবুর বাড়ির ভেতর শুরু হয় অন্য আসর। সাকী ও শরাবের ছোট-খাটো মহফিল জমে ওঠে। পাড়ার লোকদের অভিযোগ, সেই মৌজ ও মত্ততা এক সময় পৌঁছে যায় চরম সীমায়। অভিনেত্রী ঈশানী ব্যানার্জি তখন হয়ে ওঠেন রাতের অপ্সরী...

রামদাস সামান্য একজন পাহারাদার। এসব ব্যাপারে তার নাক গলানো সাজে না। সে মুহূর্তের জন্য থমকে দাঁড়িয়ে আবার পথ চলতে শুরু করে। কিন্তু কয়েক কদম এগোতেই রাতের নিস্তব্ধ-তার মধ্যে আচমকাই দরজা খোলার শব্দ তাকে উৎকর্ণ করে তোলে। পিছন ফিরেই সে দেখতে পায় মনুবাবু ও তাঁর বাড়ির লোকজন বেরিয়ে এসে রাস্তায় দাঁড়ালেন। সকলের চোখে মুখেই কেমন যেন একটি উদ্বেগের ছায়া। চোখাচোখি হতেই মনুবাবু হাতের ইশারায় রামদাসকে ডাক-লেন। রামদাস এগিয়ে গেলে তিনি বললেন, 'তাড়া-তাড়ি একটা রিক্সা ডাক। বউমা পুড়ে গেছে।'

রামদাস লক্ষ্য করল মনুবাবুর দুটি হাতও ঝলসানো। হয়তো বউমাকে বাঁচাতে গিয়েই তাঁর এই অবস্থা। পরিস্থিতির গুরুত্ব উপলব্ধি করে রামদাস সঙ্গে সঙ্গে দৌড় দিল সামনের মোড়ের দিকে। সেখানে রিক্সায় লম্বা হয়ে সুরেশ তখন ঢুলছিল। রামদাস তাকে খোঁচা দিয়ে জাগিয়ে তক্ষুনি রিক্সা নিয়ে হাজির হল মনুবাবুর বাড়ির সামনে। মনুবাবুর পুত্রবধূ মুনমুনকে ধরাধরি করে তৎক্ষণাৎ তোলা হল রিক্সায়। তার সারা শরীরই পুড়ে গেছে মারাত্মকভাবে। জ্ঞান নেই। কি করে আগুন লাগল বা কি হয়েছিল এসব কথা জানার মত ফুরসৎ তখন নেই। মনুবাবুর অনুরোধে রামদাসই মুনমুনকে পৌঁছে দিল বাঙ্গুর হাসপাতালে।

রাত তখন একটা। স্বাভাবিকভাবেই ক্যালেন-ডারের তারিখ বদলে গেছে। ২৫ ডিসেম্বরের আরলি আওয়ার। হাসপাতালের কর্তব্যরত ডাক্তার অন-তিবিলম্বেই মুনমুনের চিকিৎসায় হাত দিলেন। কিন্তু কোনভাবেই তার সংজ্ঞা ফেরানো গেল না। ভোরবেলা হেঁচকি ওঠা শুরু হল। অশুভ লক্ষণ। সেই লক্ষণই সম্ভাবনায় সত্যি হল। মনোরঞ্জন ব্যানার্জির পুত্রবধূ তথা প্রণবকুমার গুহের একমাত্র কন্যা মুনমুন ব্যানার্জিকে আর বাঁচানো গেল না। তার শেষ নিঃশ্বাস পড়ল সকাল সাতটায়। রাত একটা থেকে সকাল সাতটা। একটানা যমে-মানুষে টানাটানি। হাসপাতালের ডাক্তাররা ঝলসে যাওয়া মুনমুনকে বাঁচানোর আপ্রাণ চেষ্টা কর-লেন। অথচ মুনমনকে রিক্সায় তুলে দিয়ে মনুবাবু ও তাঁর বাড়ির লোকজন দিব্যি বসে রইলেন ঘরের ভেতরে। না কেউ হাসপাতালে গেলেন, না খবর দিলেন মুনমুনের বাবাকে। অথচ শ্বশুরবাড়ি থেকে মুনমুনের বাপের বাড়ির দূরত্ব সামান্যই। এক নিঃশ্বাসে ছুটে যাওয়া যায়। হাঁটা পথে মিনিট পাঁচেক সময় লাগে।

ব্যানার্জি বাড়ির তৎপরতা লক্ষ্য করা যায় সকাল সাড়ে ছ'টার পর। মনুবাবুর স্ত্রী অর্চনা দেবী ওই সময় আচমকা হাজির হন মুনমুনের বাপের বাড়িতে। তিনি মুনমুনের বাবা প্রণববাবুকে বলেন, 'রাত প্রায় বারটার সময় মুনমুনের গায়ে আগুন লেগেছে। সে এখন বাঙ্গুর হাসপাতালে। রক্ত দিতে হবে, তাই রেশন কার্ডটা দরকার।'

অর্চনা দেবীর কথা শুনে সোজামনের মানুষ প্রণববাবু একেবারে স্তম্ভিত হয়ে যান। নিজের কানকেই যেন বিশ্বাস করতে পারছিলেন না। বাড়িতে তখনও সবাই জেগে ওঠে নি। কিন্তু মুনমুনের পুড়ে যাওয়ার খবর মুহূর্তেই বোমাবাজির মত পৌঁছে যায় এ ঘর থেকে সে ঘরে। মুনমুনের মা ও দিদিমা কাঁদতে থাকেন। ওই অবস্থায় পাহাড় প্রমাণ বেদনা নিয়েই প্রণববাবু বেরিয়ে যান রক্তের খোঁজে। মুনমুনের জ্যেঠতুতো দিদির কাছে ও খবর পাঠানো হয়। তার শ্বশুরবাড়িও মুনমুনের শ্বশুরবাড়ির কাছাকাছি। মুনমুনের জ্যেঠিমা সুরো দেবী এবং জ্যেঠতুতো বৌদি নীরা গুহ এরই মধ্যে হাসপাতালে গিয়ে পৌঁছন হাহুতাশ করতে করতে। মুনমুনের শ্বশুরবাড়ির কোন লোককেই তাঁরা দেখতে পেলেন না। অবশ্য দেখতে পেলেন মুন-মুনকে। কিন্তু সে অবস্থায় কেউ প্রিয়জনকে দেখতে চায় না। মুনমুনের দেহ তখন নিথর। তার ঝলসানো শরীরের দিকে তাকানো যায় না।

ইতিমধ্যে খবর পেয়ে মুনমুনের জ্যেঠতুতো দিদি স্বামীকে সঙ্গে নিয়ে যখন দ্রুত এগোচ্ছেন বিজয়গড়ের দিকে, তখন পথে তাদের সঙ্গে দেখা হয় মনুবাবুর অভিনেত্রী-কন্যা ঈশানী ব্যানার্জির সঙ্গে। সে পাড়ার একটি ছেলেকে সঙ্গে নিয়ে যাদব-পুরের দিকে যাচ্ছিল। ঈশানী তাদের জানায়, মুনমুন এখন ভালই আছে। কিন্তু বিজয়গড়ে পৌঁছেই তারা বুঝতে পারেন মুনমুন আর বেঁচে নেই।

কিছুক্ষণ আগেই সুরোদেবী আর নীরা হাহাকার করতে করতে ফিরে এসেছেন হাসপাতাল থেকে। এরপর প্রণববাবুও ফিরে এলেন। তিনি কোন কথা বলতে পারছিলেন না। ঘরের লোকদের সান্ত্বনা দেবার ভাষাও বোধহয় হারিয়ে ফেলেছিলেন।

খানিকটা ধাতস্থ হয়ে প্রণববাবু শরণাপন্ন হলেন পুলিশের। তার আগেই অবশ্য হাসপাতাল থেকেই টেলিফোনে এই মৃত্যুর খবর যাদবপুর থানাকে জানান হয়। ঘটনার আনুপূর্বিক বিবরণ দিয়ে প্রণববাবু একটি এফ আই আর দায়ের করেন। তাতে অভিযোগ করা হয়, মনোরঞ্জন ব্যানার্জির ঘরে প্রায় রাতেই মদ খেয়ে নানা রকম অসামাজিক কাজকর্ম করা হয়। আশপাশের সব লোকই এসব কথা জানে। মুনমুনকেও ওইসব অসামাজিক কাজে নামানোর জন্য চাপ সৃষ্টি করা হচ্ছিল। হুমকি দেওয়া হচ্ছিল, তাদের কথামত না চললে তাকে শেষ করে দেওয়া হবে। কিছুদিন আগেও মুনমুন এ অভিযোগ করেছিল তার মায়ের কাছে।

অতি নিকটে বাড়ি হওয়া সত্ত্বেও এত বড় ঘটনার কথা ওই রাতে প্রণববাবুকে জানান হয়নি। হাসপাতালেও দেখা যায়নি শ্বশুর বাড়ির কোনও লোককেই। এ ধরনের আচরণ দেখে প্রণববাবুর বদ্ধমূল সন্দেহ হয়, মুনমুনকে সুপরিকল্পতভাবে খুন করা হয়েছে। এবং সে হত্যাকাণ্ডের সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে জড়িয়ে আছেন, গৌরাঙ্গ ব্যানার্জি (মুনমুনের স্বামী), মনোরঞ্জন ব্যানার্জি (শ্বশুর), অর্চনা ব্যানার্জি (শাশুড়ী) এবং ঈশানী ব্যানার্জি (বড় ননদ)।

ইতিমধ্যে পোস্ট মর্টেমের পর মুনমুনের লাশ এসে পৌঁছে যায় বিজয়গড়ে। ঘড়িতে তখন বিকেল পাঁচটা। প্রণববাবুর বাড়িতে যখন সৎকারের আয়োজন, তখন একে একে ভিড় জমতে শুরু করেছে বিজয়গড়ের পল্লীশ্রীর মোড়ে। তারপর প্রায় সহস্রাধিক মানুষের মিছিল এগিয়ে যায় গান্ধীনগর কলোনির দিকে। মনোরঞ্জনবাবুর বাড়ি ভাঙচুর হয়। লাঞ্ছিত হয় চিত্রাভিনেত্রী ঈশানী ব্যানার্জি।

শান্ত ও স্নিগ্ধ স্বভাবের মুনমুন হঠাৎই এক অদ্ভুত কাণ্ড করে বসেছিল। ৩০ নভেম্বর ১৯৮৩, মুনমুনের হায়ার সেকেণ্ডারি টেস্ট পরীক্ষার শেষ দিন। নিউ আলিপুরের মামা বাড়ি থেকে সেদিন নেতাজী নগর কলেজে এসেছিল পরীক্ষা দিতে। মামা বাড়িতে বলে আসে পরীক্ষার পর সে নিজের বাড়ি বিজয়গড়ে চলে যাবে। মুনমুনের মা একবার দেখা করে যান পরীক্ষা শুরুর আগে। কিন্তু মুনমুন তাঁকে বলে, সন্ধ্যার সময় সে মামাবাড়িতেই ফিরে যাবে। বিজয়গড়ে আসবে পরদিন সকালে।

কিন্তু সেদিন সন্ধ্যায় মুনমুন মামা বাড়িতে ফিরে যায়নি। ফেরেনি নিজের বাড়ি বিজয়গড়েও। দুপক্ষই নিশ্চিন্ত ছিলেন। বাবা ভাবলেন মুনমুন চলে গেছে মামার বাড়ি আর মামা ভাবলেন সে নিশ্চয়ই বিজয়গড়ে পৌঁছে গেছে।

স্বাভাবিকভাবেই প্রণববাবু সে রাতে নিশ্চিন্তে ঘুমিয়েছিলেন কিন্তু স্ত্রী তখনো জেগে। বিছানায় শুয়ে ভাবছিলেন, মুনমুন ভালভাবে পৌঁছেছে তো! সকাল হলেই সেখানে একবার খোঁজ নিতে হবে।

> **১৯৮৩ সালের জানুয়ারি মাসে গৌরাঙ্গ আরেকবার মুনমুনকে নিয়ে ভেগেছিল। প্রণববাবু সে ব্যাপারে অভিযোগও করেছিলেন যাদবপুর থানায়। শেষ পর্যন্ত পুলিশ মুনমুনকে চেতলার এক বস্তি থেকে উদ্ধার করে। ওই ঘটনার পরই তাকে সরিয়ে দেওয়া হয় মামা বাড়িতে। নিউ আলিপুর থেকে সে পড়তে আসত নেতাজী নগর কলেজে। অথচ কলেজের পাশেই তাদের নিজেদের বাড়ি।**

শ্রীমতী গুহের চোখে যেন ঘুম আসছে না কিছুতেই। রাত তখন প্রায় বারটা। এমন সময় বার—দরজায় খটখট শব্দ। কেউ যেন নাড়াছে। শ্রীমতী গুহের মাতৃ-হৃদয় মুহূর্তে উৎকণ্ঠায় ভরে যায়। স্বামীকে খোঁচা দিয়ে জাগান। আবার সেই খটখট শব্দ। প্রণববাবু ধড়ফড়িয়ে উঠে দরজা খুলে দেন। দেখেন সামনে একজন যুবক। সে প্রণববাবুর হতে একটি চিঠি ধরিয়ে দিয়ে তৎক্ষণাৎ চলে যায়। চিঠি পড়ে চমকে ওঠেন প্রণবাবু। কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে পড়েন।

সে রাতেই মুনমুনের খোঁজ পাওয়া গেছিল। না, মুনমুন অক্ষতই ছিল। পরীক্ষার পর গৌরাঙ্গের হাত ধরে সে সোজা চলে গিয়েছিল কালীঘাট মন্দিরে। সেখানে মা কালীকে সাক্ষী রেখে গৌরাঙ্গ

চন্দন মুখার্জি : ব্যস্ততা শুধুই কি চিত্রপরিচালনায়?

সিঁদুর পরিয়ে দেয় মুনমুনের সিঁথিতে। সেখান থেকে আবার গান্ধীনগর কলোনি। তারপর হিন্দু আচার মত আরেক দফা বিয়ের মহড়া। সে অনুষ্ঠান গৌরাঙ্গের জ্যেঠামশাই শিবরাম ব্যানার্জির বাড়িতে। সামান্য দূরত্বে থেকেও প্রণববাবু এতসব কাণ্ডের কিছুই টের পেলেন না। টের যখন পেলেন তখন আর কিছুই করার ছিল না। মানসিকভাব ভীষণ আহত হলেন। কারণ মুনমুন যাকে জীবনসঙ্গী হিসাবে বেছে নিয়েছে, সে ছেলেটি বেকার। বেশি লেখাপড়াও জানে না। তাছাড়া ছেলেটির পরিবার সম্পর্কেও নানা রকম অপবাদ। কারো সঙ্গে তাদের ভালমত মেলামেশাও নেই। তাই প্রণববাবু এ বিয়ে মন থেকে কোনমতেই মেনে নিতে পারেন নি।

মুনমুনের মৃত্যুর পর প্রণববাবু সাংবাদিদের কাছে অভিযোগ করেন, মুনমুনকে সে রাতে ভয় দেখিয়ে জোর জবরদস্তি করে তুলে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। গৌরাঙ্গ হুমকি দিয়েছিল, বিয়ে না করলে মুনমুনের বাবা ও ভাইকে খতম করে দেওয়া হবে। কিন্তু গোয়েন্দা বিভাগের মতে, মুনমুন ও গৌরাঙ্গের বিয়ে ছিল একান্তভাবেই প্রেমঘটিত। এর আগেও ১৯৮৩ সালের জানুয়ারি মাসে গৌরাঙ্গ আরেকবার মুনমুনকে নিয়ে ভেগেছিল। প্রণববাবু সে ব্যাপারে অভিযোগও করেছিলেন যাদবপুর থানায়। শেষ পর্যন্ত পুলিশ মুনমুনকে চেতলার এক বস্তি থেকে উদ্ধার করে। ওই ঘটনার পরই তাকে সরিয়ে দেওয়া হয় মামা বাড়িতে। নিউ আলিপুর থেকে সে পড়তে আসত নেতাজী নগর কলেজে। অথচ কলেজের পাশেই তাদের নিজেদের বাড়ি।

কিন্তু কিসের আকর্ষণে মুনমুনের এই চপল প্রেম? কেউ সে কথা বলতে পারে না। তবে মনুবাবুর বাড়িতে কিছু আকর্ষণ ছিল বৈকি! সে আকর্ষণের কেন্দ্রবিন্দু অবশ্য গৌরাঙ্গ নয়, তার বোন ঈশানী। ডক লেবার বোর্ডের একজন সাধারণ কর্মচারী মনোরঞ্জনবাবুর বাড়িও খুব আটপৌরে ধরনের। ছোট ছোট ঘুপচি ঘর। স্ত্রী, পুত্র এবং মেয়ে নিয়ে তাঁর ছোট্ট সংসার। কিন্তু ব্যানার্জি পরিবারের ভাগ্যাকাশে হঠাৎই এক তারকার উদয় হয়। বিখ্যাত চিত্র পরিচালক মৃণাল সেন ওই সময় 'একদিন প্রতিদিন' ছবিটি তৈরি করছিলেন। অধিকাংশ ছবিতেই মৃণালবাবু নতুন মুখ আমদানী করেন। সে কারণে, তাঁর চৌকস দৃষ্টি সব সময়ই ছড়িয়ে থাকে স্কুল-কলেজ থেকে যাত্রাপাড়া, এমন কি অ্যামেচার ও গ্রুপ থিয়েটারের আসর পর্যন্ত। মনুবাবুর মেয়ে ঈশানীরও ছিল অভিনয়ের নেশা। তা অবশ্য সীমাবদ্ধ ছিল স্কুল আর পাড়ার নাটকেই। তবে ঈশানীর অভিনয়ের কলাকৌশল মন্দ ছিল না। মৃণালবাবু 'একদিন প্রতিদিন' ছবিতে তাকে একটি সুযোগ দেন। ছোট্ট রোল, কিন্তু তার দৌলতেই ঈশানী বড় হয়ে গেল।

একটি ছবিতে কাজ করেই ঈশানী ডাক পায় বোম্বাই থেকে। গোবিন্দ মুনীশ তাঁর বিখ্যাত ছবি 'নদীয়া কে পার'—এ তাঁকে নায়িকা করার প্রস্তাব দেন। বোম্বাই যায় ঈশানী। কিন্তু হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়ায় গোবিন্দ মনীশের ছবিতে আর অভিনয় করা সম্ভব হল না। একটি বড় সুযোগ হাতছাড়া

হওয়ায় স্বাভাবিকভাবেই ঈশানী সেদিন মুষড়ে পড়েছিল। ঘটনাক্রমে গোবিন্দ মুনীশের বাড়িতে ওই সময় উপস্থিত ছিলেন একজন সমঝদার ব্যক্তি। তাঁর নাম চন্দন মুখার্জি। বাংলায় তিনি একটি রঙীন ছবি করতে চান। প্রযোজক, পরিচালক এবং মুখ্য অভিনেতা তিনি স্বয়ং। সুতরাং যথাসময়েই গোবিন্দ মুনীশ তাঁর সঙ্গে ঈশানীর পরিচয় করিয়ে দেন। এরপর ঈশানী ও চন্দনবাবু দুজনেই ফিরে আসেন কলকাতায়। তারপরই ঈশানীকে নায়িকার ভূমিকায় অভিনয় করতে দেখা যায় চন্দনবাবুর প্রথম ছবি 'জয় পরাজয়'এ। ১৯৮০ সালে স্টুডিও থেকে মুক্তি পেয়ে ছবিটি চলে আসে প্রেক্ষাগৃহের পর্দায়। ঈশানীর সজীব অভিনয় প্রশংসিত হয় দেশজুড়ে। কলকাতার সিনেমা পত্রিকা 'উল্টোরথ' তাকে শ্রেষ্ঠ নবাগতা শিল্পীর পুরস্কার দিয়ে সম্মানীতও করে। ব্যবসায়িক দৃষ্টিতে চন্দনবাবুর প্রথম ছবি সাফল্যের মুখ দেখে বেশ ভালভাবেই।

এরপর খুব অল্প সময়ের মধ্যেই ঈশানী অভিনয় করে অনেকগুলি বাংলা ছবিতে। 'প্রতিবিম্ব', 'অন্বেষণ', 'পদচিহ্ন', 'জয়বাবা বৈদ্যনাথ', 'রাতের কুহেলী', 'আর্তনাদ' প্রভৃতি তার উল্লেখযোগ্য ছবি। সাফল্যের সঙ্গে সঙ্গে বাড়তে থাকে গ্ল্যামার। মনুবাবুর ভাঙা ঘরে যেন চাঁদের হাট উছলে পড়ে। পাড়ায় ঈশানীর আলাদা ইমেজ। প্রতিবেশী এমন কি পুরনো বন্ধু বান্ধবীদেরও সে আর পাত্তা দেয় না আগের মত। মনুবাবুর সাদামাটা টিনের বাড়ির জৌলুস বাড়তে থাকে। রাতের আঁধারে সেখানে জ্বলতে শুরু করে ফিল্ম জগতের কিছু রসিক নক্ষত্র। চাঁদের হাটে মহফিল বসে।

ব্যানার্জি বাড়ির এসব বদনামের কথা মুনমুনেরও অজানা ছিল না নিশ্চয়ই। কিন্তু তখন কতই বা বয়স! কাঁচা বয়সের বিভ্রান্তি তাকে গ্রাস করেছিল। পাড়ার মেয়ে ঈশানীকে পর্দায় অভিনয় করতে দেখে তার মনেও জেগেছিল শিহরণ। আর ঠিক তখনই নেতাজীনগর কলেজের এই সুন্দরী তরুণীর সামনে প্রেমের জাদু নিয়ে হাজির হয়েছিল ঈশানীর দাদা গৌরাঙ্গ ব্যানার্জি। মুনমুন নিজেকে সামলাতে পারে নি। অনেকে তা পারেও না। অভিনয় এবং সঙ্গীতের প্রতি তার নিজের আকর্ষণও তো কম ছিল না। স্কুল-কলেজের নাটকে সেও অভিনয় করত।

অভিভাবকদের চমকে দিয়ে একাধারে স্বপ্ন ও শংকায় দুলতে দুলতে মুনমুন ব্যানার্জি পরিবারের বউ হয়ে আসে ৩০ নভেম্বর ১৯৮৩। জীবনের সেই বাসন্তী উৎসবের রাত সেদিন আলোকমালায় ঝলমলিয়ে ওঠেনি, কিন্তু অন্য এক যজ্ঞের শিখা বোধহয় জ্বলে উঠেছিল ঘটনার নেপথ্যে। ভাবাবেগের তাড়নায় পবিত্র আগুনকে সাক্ষী রেখে মুনমুন সেদিন যে গৃহে পদার্পণ করেছিল, সেটি কি ছিল এক জতুগৃহ? কৌরবদের জতুগৃহ থেকে পাণ্ডবরা রক্ষা পেয়েছিল বিদুরের সহায়তায়। কিন্তু ব্যানার্জি পরিবারে তেমন কোন বিদুরের অবির্ভাব সেই অভিশপ্ত রাতে ঘটেনি।

বিয়ের কিছুদিন পর থেকেই মুনমুন যাওয়া আসা শুরু করে মায়ের কাছে। মা এবং ছোট ভাইকে না দেখে সে থাকতে পারত না। যতই হোক একমাত্র মেয়ে মুনমুন। ধীরে ধীরে প্রণববাবুর মন থেকেও ক্ষোভ মুছতে শুরু করে। স্ত্রীও তাঁকে বোঝানোর চেষ্টা করেন নানাভাবে। প্রণববাবুও মুনমুনকে আর দূরে রাখতে পারেন না। মাস তিনেক পর মেয়ে ও জামাইকে কাছে টেনে নেন। সে উপলক্ষে সমারোহও করা হয় যথাসম্ভব।

অভিযুক্তদের মতে, হঠাৎই আগুন ধরে যায় মুনমুনের শরীরে আর তাতেই তার মৃত্যু হয়। মুনমুন হায়ার সেকেন্ডারি পরীক্ষার জন্য তৈরি হচ্ছিল। তাই পড়াশুনো করছিল রাত জেগে। ওই সময় লোডশেডিং চলায় মেঝেতে মাদুর বিছিয়ে সে পড়ছিল লণ্ঠন জ্বেলে। সেই লণ্ঠন উল্টে গিয়েই নাকি আগুন ধরে যায় শাড়িতে।

এরপরই সম্ভবতঃ মুনমুনকে খারাপ পথে নামাবার চেষ্টা শুরু হয়। কিন্তু ব্যানার্জি বাড়ির রাতের অতিথিদের মনোরঞ্জন করতে কিছুতেই রাজি হয় না সে। ফলে শুরু হয় নানা রকম মানসিক ও শারীরিক নির্যাতন। মুনমুন মায়ের কাছে সব বলে আর কাঁদে।

তারপরই ২৪ ডিসেম্বরের সেই অভিশপ্ত রাত। রাত বারটায় জতুগৃহ থেকে মুনমুনের আগুনে ঝলসানো দেহ সুরেশের রিক্সায় তুলে দিয়েই ব্যানার্জি পরিবারের লোকজনেরা ঘরের ভেতর ঢুকে যায়।

যাদবপুর থানার ও.সি. গোপাল ভট্টাচার্য এই কেস অনুসন্ধানের দায়িত্ব দেন সাব ইন্সপেক্টর কালীপদ দে-কে। কালীপদবাবুর নেতৃত্বে পুলিশ অভিযুক্তদের এক দীর্ঘকালীন জিজ্ঞাসাবাদ চালায়। অভিযুক্তদের মতে, হঠাৎই আগুন ধরে যায় মুনমুনের শরীরে আর তাতেই তার মৃত্যু হয়। মুনমুন হায়ার সেকেন্ডারি পরীক্ষার জন্য তৈরি হচ্ছিল। তাই পড়াশুনো করছিল রাত জেগে। ওই সময় লোডশেডিং চলায় মেঝেতে মাদুর বিছিয়ে সে পড়ছিল লণ্ঠন জ্বেলে। সেই লণ্ঠন উল্টে গিয়েই নাকি আগুন ধরে যায় শাড়িতে। তাকে বাঁচাতে গিয়ে শ্বশুর মনোরঞ্জনবাবুও পুড়ে যান মারাত্মকভাবে।

সব অভিযুক্তদেরই একই বক্তব্য। কিন্তু পুলিশের ধারণা অন্যরকম। তাছাড়া বিদ্যুৎ বিভাগের রিপোর্ট অনুসারেও ওই সময় কোন লোডশেডিং হয়নি ওই অঞ্চলে। মুনমুন যে কামরায় পড়াশুনা করছিল খুব সঙ্গতভাবে সেখানে গৌরাঙ্গেরও থাকার কথা। অথচ মুনমুনকে বাঁচাতে গিয়ে মনোরঞ্জনবাবুই পুড়ে গেলেন, গৌরাঙ্গ নয়। তাছাড়া মনোরঞ্জনবাবুর হাত পুড়লেও তিনি মুনমুনের সঙ্গে হাসপাতালে ভর্তি হলেন না বা চিকিৎসাও করলেন না কোন স্থানীয় ডাক্তারকে দিয়ে। পরের দিন সকালেই তিনি গায়েব হয়ে গেলেন। তাছাড়া মনোরঞ্জনবাবুর বাড়ির গায়ে ঠাসাঠাসি অবস্থায় আরও অনেক বাড়ি। চারদিকের বাড়িতেই অনেক লোকজন। এক বাড়ি থেকে কথাবার্তার আওয়াজ পর্যন্তও অতি সহজে পৌঁছে যায় অন্য বাড়িতে। কিন্তু মুনমুনের আর্তনাদ বা ছটফটানি সে রাতে কারো কানেই পৌঁছোয়নি। মনোরঞ্জনবাবুর বাড়ির পাশেই তাঁর দাদা শিবরাম ব্যানার্জির বাড়ি। তারাও কিছু টের পান নি। সামান্য দূরেই মুনমুনের বাপেরবাড়ি। হাঁটা পথে মিনিট পাঁচেক লাগে। অথচ সেখানেও এই সাংঘাতিক ঘটনার খবর জানান হয়নি। আশ্চর্যের ব্যাপার হল ব্যানার্জি বাড়ির কোন লোক হাসপাতালেও গেলেন না। নিয়ম অনুসারে তারা পুলিশকে কোন খবর দেন নি। এসব কারণে এ ঘটনাকে মামুলী দুর্ঘটনা বলে পুলিশ মানতে পারে না।

সব কিছু বিচার করে পুলিশ ভারতীয় দণ্ডবিধির ৩২০ ও ১২০ ধারায় অভিযুক্ত মনোরঞ্জন ব্যানার্জি, অর্চনা ব্যানার্জি, গৌরাঙ্গ ব্যানার্জি এবং চিত্রাভিনেত্রী ঈশানী ব্যানার্জির বিরুদ্ধে মামলা রুজু করে।

মনোরঞ্জনবাবুকে পাওয়া গেল না। সুতরাং বাকি তিন আসামীকেই পরদিন হাজির করা হয় আলিপুরের সাব-ডিভিশনাল ম্যাজিস্ট্রেট প্রণবকুমার দেবের আদালতে। আদালত প্রাঙ্গনে তার আগেই বিক্ষুব্ধ মহিলাদের ভিড় জমতে শুরু করেছিল। গান্ধী নগর, বিজয়গড় এবং টালিগঞ্জের বিভিন্ন এলাকা থেকে এইসব শোক-ক্ষুব্ধ মহিলারা হাজির হয়েছিলেন প্লাকার্ড ও ফেস্টুন হাতে। মুনমুন হত্যাকারীদের তারা জামিন না দেবার দাবি জানাতে থাকে। শেষ পর্যন্ত বিচারপতি অভিযুক্তদের জানুয়ারি ১৯৮৫ পর্যন্ত জেল হাজতে রাখার নির্দেশ দেন। এদিকে পুলিশ ২৫ ডিসেম্বর থেকেই মনোরঞ্জনবাবুকে খুঁজতে থাকে হন্যে হয়ে। খোঁজ পড়ে একজন নবাগত চিত্রপরিচালকেরও। ২৮ ডিসেম্বর সাউথ পোর্ট থানার পুলিশ জানতে পারে যে, মনোরঞ্জনবাবু ভর্তি হয়েছেন ডক লেবার বোর্ডের হাসপাতালে। সেখান থেকেই পুলিশ তাঁকে গ্রেপ্তার করে। কিন্তু আদালতের অনুমতিতে তাকে হাসপাতালেই রাখা হয় চিকিৎসার জন্য।

২ জানুয়ারি ১৯৮৫, উদীয়মান চিত্রপরিচালক, প্রযোজক এবং অভিনেতা চন্দন মুখার্জি আবেদন করেন আগাম জামিন চেয়ে। আদালত তা মঞ্জুরও করে। চন্দনবাবুর রঙিন বাংলা ছবি 'আর্তনাদ' তখন মুক্তি প্রতীক্ষায়।

৪ জানুয়ারি মুনমুনের মৃত্যু সংক্রান্ত কেসটি তুলে দেওয়া হয় গোয়েন্দা বিভাগের হাতে। পরদিন ৫ জানুয়ারি, অভিযুক্তদের আদালতে হাজির করার দিন। সেদিনও বহুসংখ্যক মহিলা তাদের বিরুদ্ধে শ্লোগান দেন, বিক্ষোভ প্রদর্শন করেন। হৈ হল্লার ভেতর দিয়ে সেদিন আদালতে আসেন শুধু অর্চনা

দেবী ও ঈশানী ব্যানার্জি। অসুস্থতার অজুহাতে গৌরাঙ্গ উপস্থিতি এড়িয়ে যায়। আর মনোরঞ্জনবাবু তখনো ডক লেবার বোর্ডের হাসপাতালে। বিক্ষোভের চাপে অভিযুক্তদের উকিলকে শেষ পর্যন্ত জামিনের আর্জি প্রত্যাহার করে নিতে হয়। বিচারপতি আবার তাদের হাজতে রাখার নির্দেশ দেন ১৯ জানুয়ারি পর্যন্ত। এদিকে গৌরাঙ্গের অসুস্থতার খবরে গোয়েন্দা বিভাগের সন্দেহ হয়। তারা গৌরাঙ্গকে পরীক্ষা করেন একজন অভিজ্ঞ ডাক্তার দিয়ে। দেখা যায় সে সম্পূর্ণ সুস্থ। সুতরাং ৭ জানুয়ারি পুলিশ তাকে আবার আদালতে হাজির করে। বিচারপতি তাকেও হাজতে রাখার নির্দেশ দেন ১৯ জানুয়ারি পর্যন্ত। ১৯ জানুয়ারি ফের তাদের আদালতে হাজির করা হলে বিচারপতি শুধু অর্চনা দেবী ও ঈশানীর জামিনের আবেদন মঞ্জুর করেন। গৌরাঙ্গকে যথারীতি হাজতেই পাঠান হয়। পরে অবশ্য গৌরাঙ্গ ও মনোরঞ্জনবাবু দুজনেই জামিন পেয়ে যান।

একে একে সব আসামীই জামিন পেয়ে গেল, কিন্তু কেউই আর ফিরতে পারল না নিজের এলাকায়। প্রায় দুবছর ধরে এখনো তারা ঘরছাড়া।

অভিযুক্তদের সঙ্গে যোগাযোগের উদ্দেশ্যে এই প্রতিবেদক দুদিন হাজির হয়েছিলেন মনোরঞ্জনবাবুর দাদা শিবরাম ব্যানার্জির বাড়িতে। দুই ভাইয়ের বাড়ি গায়ে গায়ে লাগা। প্রথম দিন শিবরামবাবুকে পাওয়া যায় নি। তিনি তাঁর কর্মক্ষেত্র চিৎপুরে চলে গিয়েছিলেন। ডক লেবার বোর্ডের অবসরপ্রাপ্ত কর্মচারী শিবরামবাবু সেখানে এক ডাক্তারের কাছে কমপাউনডারের কাজ করেন। নিজের পরিচয় দিতেই ঘর থেকে বেরিয়ে আসেন শিবরমবাবুর কনিষ্ঠ পুত্র নিতাই বানার্জি। তিনি প্রতিবেদককে বাড়ির ভেতরে নিয়ে গিয়ে একটি ঘরের জানলায় কিছু দাগ দেখিয়ে বলেন, 'ওটা গৌরাঙ্গের রক্তের দাগ। এলাকার লোকজন তাকে মারতে মারতে আমাদের বাড়িতে ঢুকে পড়ে। তার পা ভেঙে দেওয়া হয়েছে।'

—থানায় ডাইরি করেছেন ?

ডাইরি করে কি হবে ? নিতাইবাবুর জবাব।

—গৌরাঙ্গরা এখন কোথায় ?

নিতাইবাবু বললেন, আমরা কিছুই জানি না। শিবরামবাবুর স্ত্রীও পাশ থেকে বললেন, আমরা তাদের কোন খোঁজই জানি না।

—আপনারা ওই ঘটনার কথা কখন জানতে পারলেন ?

—পরের দিন সকালে। শিবরামবাবুর স্ত্রীর জবাব।

—ওইদিন রাতে মনোরঞ্জবাবুরা আপনাদের কিছুই বলেন নি ?

—না।

—মনোরঞ্জনবাবুর বাড়িতে কোন সোরগোল শুনেছিলেন ?

—না।

—চন্দন মুখার্জি নামে কোন ভদ্রলোককে চেনেন ?

—নাম শুনেছি।

—তিনি কি মনোরঞ্জনবাবুর বাড়িতে যাতায়াত করেন ?

গৌরাঙ্গের অসুস্থতার খবরে গোয়েন্দা বিভাগের সন্দেহ হয়। তারা গৌরাঙ্গকে পরীক্ষা করেন একজন অভিজ্ঞ ডাক্তার দিয়ে। দেখা যায় সে সম্পূর্ণ সুস্থ। সুতরাং ৭ জানুয়ারি পুলিশ তাকে আবার আদালতে হাজির করে। বিচারপতি তাকেও হাজতে রাখার নির্দেশ দেন ১৯ জানুয়ারি পর্যন্ত। ১৯ জানুয়ারি ফের তাদের আদালতে হাজির করা হলে বিচারপতি শুধু অর্চনা দেবী ও ঈশানীর জামিনের আবেদন মঞ্জুর করেন। গৌরাঙ্গকে যথারীতি হাজতেই পাঠানো হয়।

—দেখুন, ওরা আমাদের আত্মীয় হলেও বেশি মেলামেশা নেই। সেজন্য ওসব ব্যাপার কিছুই জানি না।

—চন্দনবাবু কি সে রাতে মনুবাবুদের বাড়িতে ছিলেন ?

—না, সে রাতে উনি আসেন নি।

শিবরামবাবুর স্ত্রী ও পুত্রের অন্যান্য বক্তব্য অভিযুক্তদের বয়ানের প্রায় অনুরূপ। তারা চন্দনবাবুর যাতায়াতের কথা জানেন না, অথচ সে রাতে তাঁর অনুপস্থিতির কথা বললেন। বিস্ময়কর নিশ্চয়ই।

ধর্মতলা অঞ্চলের চাঁদনী চক স্ট্রীটের পাশে 'স্ক্রীন অ্যাণ্ড পাবলিসিটি'র অফিস। ঠিকানা ৬ এ সাকলাত প্লেস, কলকাতা–৭২। এই প্রতিষ্ঠানটিই 'জয় পরাজয়' ছবির ডিসট্রিবিউটর। ছবিটির কিছু দৃশ্যের আলোকচিত্র সংগ্রহের উদ্দেশ্যে প্রতিবেদক সেখানে যান। সেখানে চন্দন মুখার্জির সঙ্গে প্রতিবেদকের আলাপ।

রিসেপশনে নিজের পরিচয় দিয়ে প্রতিবেদক ওই ফিল্মের কয়েকটি ছবি চান। এমন দৃশ্যের ছবি যাতে ঈশানী আছে। দুজন লোক বসেছিলেন পাশের সোফায়। তাঁদের মধ্যে একজন বললেন, 'মিত্রদের কাগজ, তাই না ?'

—আজ্ঞে হ্যাঁ।

—কিন্তু ওই ছবি তো পাবেন না।

—কেন ?

—ওসব পুরনো ছবি। নষ্ট হয়ে গেছে।

—চার বছরের মধ্যে সব নষ্ট হয়ে গেল ?

—হ্যাঁ ভাই, থাকলে দিয়ে দিতাম।

—কিন্তু ছবিটি তো এখনো মফস্বলে চলছে ?

—'রিল' থেকে আপনাকে দেব কিভাবে ?

—কিন্তু আপনাদের অ্যালবামেও তো ছবি থাকার কথা ?

—না, না। থাকলে তো দিয়ে দিতাম।

—আপনি কে ?

—আমি চন্দন মুখার্জি। আমিই 'জয় পরাজয়' ছবিটি পরিচালনা করেছি।

—নমস্কার।

—নমস্কার।

—চন্দনবাবু, আপনার সঙ্গে কিছু কথা বলতে চাই।

—অবশ্যই। আসুন, ভেতরে আসুন।

চন্দনবাবু প্রতিবেদককে নিয়ে নিজের চেম্বারে গেলেন।

—চন্দনবাবু, আপনি নিশ্চয়ই বুঝতে পারছেন ঈশানী ব্যানার্জির ছবি আমি কেন চাইছি।

—হ্যাঁ, তা পারছি। কিন্তু আগে কি খাবেন বলুন ?

—চা খাওয়া যেতে পারে।

—সিঙাড়া, সন্দেশ ?

না, না। শুধু এক কাপ চা।

—আপনাদের পত্রিকার প্রধান সম্পাদক আলোক মিত্র, না ?

—আজ্ঞে হ্যাঁ।

—আলোকবাবু আমার বন্ধু।

—আরে, তাহলে তো আপনি আমাদের প্রতিষ্ঠানেরও বন্ধু। কিন্তু ঘটনাটা কি বলুন তো চন্দনবাবু ? আগুন কিভাবে লাগল ?

—আমি তো কিছুই জানি না। হঠাৎ ঈশানী একদিন আমার অফিসে এসে হাজির।

—জামিনের পর নিশ্চয়ই ?

—হ্যাঁ, ঘটনার অন্তত দিন পনের পর।

—সে কি বলল ?

—বলল, মুনমুন লণ্ঠন জ্বেলে পড়ছিল। হঠাৎ তার গায়ে আগুন ধরে যায়। মহল্লার লোকজন তাদের বাড়ি তছনছ করে দিয়েছে। মারধোরও করেছে সবাইকে। তারা কেউ এলাকায় যেতে পারছে না।

—ঈশানীর সঙ্গে আপনার সম্পর্ক কি ?

—দাদা ও বোনের মত। ঈশানীর মতই মহুয়া রায়চৌধুরি এবং আলপনা গোস্বামীও আমার ছবিতে কাজ করে। তাদের সকলের সঙ্গেই আমার একই সম্পর্ক।

—কিন্তু এলাকার লোকজন তো অন্য কথা বলছে।

—এলাকার লোকেরা তো আমাকে চেনেই না মশাই। তাদের কেউ বলছে আমার বয়স তিরিশ, কেউ বলছে চল্লিশ, আবার কেউ বলছে পঞ্চাশ।

—না, আপনার বয়স সম্পর্কে তারা আমাকে কিছু বলেন নি।

—আচ্ছা বলুন তো, মারা গেল মুনমুন। সে ঈশানী ব্যানার্জির বৌদি। কিন্তু তার সঙ্গে চন্দন মুখার্জিকে জড়াচ্ছেন কেন ?

—না, চন্দনবাবু, আমি আপনাকে কিভাবে জড়ালাম ? আপনার নামে নানারকম অভিযোগ উঠেছে। সে ব্যাপারে আপনার বক্তব্য কি আমার জানা উচিত নয় ?

—কি অভিযোগ ?

—২৪ ডিসেম্বর রাতে কি আপনি ঈশানীদের বাড়িতে ছিলেন ?

—না। ওই রাতে আমি জর্জ বেকার, আলপনা

গোস্বামী এবং মহুয়া রায় চৌধুরির সঙ্গে পার্ক সার্কাসের একটি ক্লাবে আড্ডা দিচ্ছিলাম।

–কতক্ষণ সেখানে ছিলেন ?

–রাত সাড়ে দশ-এগারটা পর্যন্ত।

–কিন্তু মুনমুন তো পুড়েছে রাত বারটায়।

–আপনি কি বলতে চাইছেন ?

–আমি কিছুই বলতে চাইছি না। কিন্তু অভিযোগ উঠেছে আপনি ওই সময় ঈশানীদের বাড়িতে ছিলেন।

–না, আমি সেখানে ছিলাম না। পুলিশ কি বলছে ?

–তা আমি বলব না। আপনি নিজেও তো খোঁজ নিতে পারেন ?

–আপনি কোথায় গিয়েছিলেন ?

–যাদবপুর থানা, সি আই ডি অফিস–সব জায়গাতেই।

–প্রণববাবুরা তো এফ আই আর-এ আমার নাম দেন নি ?

–আজ্ঞে হ্যাঁ, তা দেন নি। ফার্স্ট ইনফরমেশন রিপোর্টে সব কথা থাকেও না।

–পুলিশ তো আমাকে গ্রেপ্তারও করেনি।

–জানি। কিন্তু আপনি অ্যানটিসিপেটরি বেল নিলেন কেন ?

–সে তো সুপ্রিয়া দেবীও নিয়েছিলেন। ঈশানী আমার ছবিতে কাজ করছে। আমার একটি ছবি এখন নির্মীয়মান অবস্থায়। সুতরাং ঝামেলা এড়াবার জন্য অ্যানটিসিপেটরি বেল নেওয়া তো খুবই স্বাভাবিক ব্যাপার।

–সিনেমা জগতের আরও অনেক লোকের সঙ্গেই ঈশানীর সম্পর্ক থাকার কথা। তাঁরা কেউ আপনার মত জামিন নেননি। আপনি কিভাবে অ্যানটিসিপেট করলেন যে, পুলিশ আপনাকে এ মামলায় জড়াবে ?

–ঈশানীর সঙ্গে আমার সম্পর্ক ঘনিষ্ঠ। সেজন্য আগাম জমিন নিয়ে ঝামেলা এড়াতে চেয়েছি।

–এলাকার লোকজন বলছে প্রায় রাতেই আপনি ঈশানীদের বাড়ি যান, মদ খান, ফূর্তি মস্করা করেন–এইসব। এসব কথা সংবাদপত্রে ছাপাও হয়েছে।

–কিন্তু কেউ তো আমার নাম করে নি।

–দেখুন চন্দনবাবু, আপনি একজন শিল্পী। সম্মানজনক পেশার সঙ্গে যুক্ত। আমি অকারণে আপনাকে অপদস্থ করব না। কিন্তু আপনার সম্পর্কে যে সব অভিযোগ উঠেছে, নৈতিক কারণেই আমাকে তা লিখতে হবে। অবশ্য আপনার বক্তব্যও আমরা প্রকাশ করব। সে জন্য অভিযুক্তদের বক্তব্যও শুনতে চাই। কিন্তু ঈশানী বা তার পরিবারের কারো সঙ্গে দেখা করতে পারছি না। আপনি অনুগ্রহ করে একটা ব্যবস্থা করে দিন।

–মুশকিল। আমি তো তার ঠিকানা জানি না। শুধু একটি টেলিফোন নম্বর আছে।

–আমাকে নম্বরটা দিন। আমিই যোগাযোগের চেষ্টা করব।

–তার দরকার নেই। আপনি বরং কাল এগারটায় আসুন। এই অফিসেই দেখা করিয়ে দেব।

–তাহলে তো খুব ভাল হয়। আমি তাকে বেকায়দায় ফেলব না। দয়া করে আমার সঙ্গে সহযোগিতা করুন।

–চেষ্টা করব। বুঝতে পারছি আপনি তার একটি ইন্টারভিউ চাইছেন।

পরের দিন প্রতিবেদক নির্দিষ্ট সময়েই চন্দনবাবুর অফিসে হাজির হন। কিন্তু তিনি বা ঈশানী কেউই সেখানে ছিলেন না। আরও দুবার ফিরে আসার পর বিকেল চারটের সময় চন্দনবাবুকে পাওয়া যায় টেলিফোনে।

–আমি খুবই দুঃখিত। জরুরি কাজে বেরিয়ে গেছিলাম।

–দুঃখের কিছু নেই। আপনার একটি ছবি রিলিজ হতে চলেছে। কাজ তো থাকবেই। কিন্তু ঈশানী কোথায় ?

–তার সঙ্গে যোগাযোগ করা যায় নি।

–তাহলে আমি আবার কবে আসব ?

–আমি তো চেষ্টা করছি। কিন্তু যোগাযোগ হচ্ছে না কি করি বলুন তো ?

–আমাকে টেলিফোন নম্বরটা দিন না। আমি ঠিক যোগাযোগ করে নেব।

–না, সেটা সম্ভব নয়। সে খুব ঘাবড়ে গেছে। আচ্ছা, এই ব্যাপারটা কি না লিখলেই নয় ?

–কেন, অসুবিধা কি আছে ? খবরের কাগজে তো আগেই সব বেরিয়ে গেছে।

–আপনার ব্যবহারে আমি খুব খুশি।

–আমি কারো সঙ্গেই খারাপ ব্যবহার করি না। আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন, আপনার বক্তব্য আমি চেপে দেব না।

–লেখাটা একবার দেখিয়ে নিলে ভাল হয়।

–মাফ করবেন। সেটা সম্ভব নয়।

–আচ্ছা, আপনি তো ঈশানীদের বাড়িটা দেখেছেন ?

–হ্যাঁ, কিন্তু বাইরে থেকে।

–বাড়িটা কেমন ?

–সাদামাটা। নিম্ন মধ্যবিত্ত পরিবারের বাড়ি যেমন হয়।

–আপনার কি বিশ্বাস হয়, ও রকম একটা টিনের বাড়িতে আমি মদ খেয়ে ফূর্তি করতে যাব ?

–বিশ্বাস অবিশ্বাসের কথা তো নয়, এলাকার লোকজন বলছে, ২৪ ডিসেম্বর রাতে আপনার গাড়ি ওখানে দেখা গেছে।

–দেখুন, আমার ছবিতে যাঁরা কাজ করেন তাদের সুবিধা অসুবিধার ব্যাপারটা আমি দেখি। তাছাড়া কর্মচারীরাও আমার গাড়ি ব্যবহার করে।

–তাহলে কি আপনি বলছেন, সেদিন রাতে কোন কর্মচারী আপনার গাড়ি নিয়ে ওখানে গেছিলেন ?

–বুঝতে পারছি না।

–আচ্ছা, চন্দনবাবু ঈশানী কি বিবাহিতা ?

–সে আমি কি করে বলব ?

–কিন্তু আমার কাছে খবর আছে, ঈশানী চন্দননগরের একটি ছেলেকে বিয়ে করেছিল। প্রেম করে বিয়ে। আপনার প্ররোচনাতেই নাকি ঈশানী তাকে ডির্ভোস করেছে মুনমুনের মৃত্যুর দিন পনের আগে ?

–ভুল খবর।

–'জয় পরাজয়' ছবিটি করার আগেও কি ফিল্ম জগতের সঙ্গে আপনার সম্পর্ক ছিল ?

–বন্ধুত্ব ছিল অনেকের সঙ্গেই। তাছাড়া আমি ছিলাম এক সময়ের বিখ্যাত শিশু অভিনেতা।

চন্দনবাবু অস্বীকার করলেও গোয়েন্দা বিভাগের সূত্র অনুসারে ২৪ ডিসেম্বর রাতে তিনি ঘটনাস্থলে ছিলেন। ইতিমধ্যে মুনমুনের পোস্ট মর্টেম রিপোর্ট অনুসারে, তার শরীর, ঘাড়, হাত-পা সবই পুড়ে গেছে। পুড়েছে পিছনের দিকও। কিন্তু মাথার ওপর দিক ছিল অক্ষত। চুল পোড়ে নি। প্রাথমিকভাবে শাড়িতেও কেরোসিন পাওয়া যায় নি। মুনমুন সে রাতে স্বাভাবিকভাবে আহারও করেছিল। তার পাকস্থলিতে স্বাভাবিক পরিমাণ ভাত পাওয়া গেছে।

তাছাড়া গোয়েন্দা বিভাগ তদন্ত করার সময় লক্ষ্য করেছেন, ঘরের ভেতর ধোঁয়ার কোন ছাপ পড়েনি। এমন কি মাকড়সার জালও যেমন ছিল তেমনি আছে। লণ্ঠনটিও অক্ষত। সেটিতে বা ঘরের অন্যান্য আসবাব ও জিনিসপত্রে অস্বাভাবিকতার কোন চিহ্ন নেই। এসব লক্ষণ দেখে গোয়েন্দা বিভাগ এই মৃত্যুকে নেহাতই দুর্ঘটনা বলে মেনে নিতে পারলেন না। তারা অপেক্ষা করতে লাগলেন মুনমুনের ভিসেরা রিপোর্টের জন্য। কারণ তার পাকস্থালিতে বিষ বা মাদক দ্রব্য ছিল কি না তা পরীক্ষাতেই ধরা পড়বে।

ইতিমধ্যে মনোরঞ্জনবাবুর পরিবার সম্পর্কে আরও কিছু চমকপ্রদ খবর পৌঁছে যায় গোয়েন্দা দপ্তরে। এর আগেও নাকি তাদের পরিবারের দুজন মহিলার মৃত্যু হয়েছে আগুনে পুড়ে। তারা হলেন যথাক্রমে মনোরঞ্জনবাবুর বোন এবং ভাইঝি (শিবরামের মেয়ে)। গোয়েন্দা বিভাগ এই ব্যাপারগুলিও খতিয়ে দেখে। তারা ইন্দ্রানী ব্যানার্জি নামে একজন মহিলার সঙ্গেও যোগাযোগের চেষ্টা করেন। তিনি ঈশানীর মামীমা। ছোটমামা সত্যপ্রকাশ ব্যানার্জির স্ত্রী। স্বামীর সঙ্গে তিনি ঈশানীদের বাড়িতেই থাকতেন। তাঁদের একটি মেয়েও আছে। কিন্তু বছর তিনেক আগে সত্যপ্রকাশের সঙ্গে তার বিবাহ বিচ্ছেদ হয়ে যায়। ব্যানার্জি পরিবারের কিছু ভেতরের ব্যাপার তার কাছে পাওয়া যেতে পারে বলে গোয়েন্দা বিভাগের ধারণা।

দুর্ভাগ্যবশত পুলিশ এখনও কোন চার্জশীট দিতে পারে নি। তবে ভিসেরা ও ফরেনসিক রিপোর্ট সম্প্রতি গোয়েন্দা দপ্তরে পৌঁছেছে। ভিসেরাতে অ্যালকোহল পাওয়া গেছে। এখন শুধু একটি মেডিক্যাল সার্টিফিকেটের অপেক্ষা। সেটির জন্যই চার্জশীট আটকে আছে।

সোদ্দা কথা, মুনমুন কেস এখনো গোয়েন্দা বিভাগের ফাইল-বন্দি। গান্ধীনগর এবং বিজয়গড় অঞ্চলেও ছড়িয়ে আছে এক চাপা উত্তেজনা। তাই ঈশানী সহ পরিবারের কোন সদস্যই পাড়ায় ফিরতে পারেনি। ব্যানার্জি বাড়িতে তালা ঝুলছে সেই দুবছর ধরে। দেখা যাক জতুগৃহের আগুন শেষ পর্যন্ত কোন রহস্যকে আলোকিত করে।

ছবি : শীতল দাশ

জয়া প্রদার গোপন বিবাহ।

খবর ছিল হোটেলের গোপন কক্ষে, মাত্র কয়েকজন বন্ধুর সামনে ২২ জুন রাত্রে জয়া প্রদা বিয়ে করলেন তার বিবাহিত প্রেমিক শ্রীকান্ত নাহাতাকে। শ্রীকান্তর পরিবার কিন্তু অস্বীকার করছে। জয়ার ভাই রাজাবাবুও বলছেন, তার বোন অবিবাহিতা। প্রশ্নের মুখে দাঁড়িয়ে জয়া হাসছেন তাঁর চিরপরিচিত ধোঁয়াটে কায়দায়। শোনা যায়, বছর তিনেক আগেই নাকি তাদের বিয়ে হয়েছিল, তাও গোপনে। বার বার এই অভিনব বিবাহ সংক্রান্ত গুঞ্জনের কোন সত্য আছে, নাকি শুধুই [illegible]? অভিমন্যু গঙ্গোপাধ্যায়ের লেখায় সেই রহস্যই উদ্ঘাটিত হয়েছে।

এবার শোনা গেল তিনি বিয়ে করেছেন। ফিল্ম ইণ্ডাস্ট্রির সেই শান্ত, নম্র, সংযত হিরোইন অবশেষে তাহলে সত্যিই বিয়ে করলেন? তাজ হোটেলের প্রিন্সেস রুমে খুব গোপনে তাদের বিয়ে হয়ে গেল, সাক্ষী মাত্র কয়েকজন কাছের মানুষ।

জয়া প্রদাকে নিয়ে প্রথম থেকেই গুঞ্জনের ঢেউ পড়ে গেছে। উত্তরে এতকাল জয়া শুধু মধুর হাসি হেসেছেন। কোন রকম উচ্চবাচ্য নয়, সেই হাসিকে সহজে বন্যার মত বইয়ে দিয়ে তিনি শুধু চোখ তুলে চেয়েছেন। যেন বলতে চান, তাই নাকি—আর কি রটেছে বাজারে? বলুন বলুন, মন্দ লাগছে না শুনতে...

যাকে জড়িয়ে বিবাহের খবরটি ছড়িয়ে পড়েছে তিনি হলেন শ্রীকান্ত নাহাতা। নিঃসন্দেহে সুপুরুষ। জয়ার বয়ফ্রেণ্ড শ্রীকান্ত কিন্তু বিবাহিত। দুই সন্তানের জনক। তিনি একজন নবীন চিত্র প্রযোজক-ও বটেন। এর মধ্যেই তার 'বফাদার' নামে ছবিটি মুক্তি পেয়েছে। রজনীকান্ত আর পদ্মিনী কোলাপুরে অভিনয় করেছিলেন ছবিটিতে।

স্মরণ করা যেতে পারে হিন্দি চিত্রতারকাদের অন্যতম জিতেন্দ্র একদিন হঠাৎ করেই রুপালী পর্দায় চলে এলেন। প্রযোজক সুন্দরলাল নাহাতার 'ফর্জ' ছবিটি মনে আছে নিশ্চয়ই, শ্রীকান্ত নাহাতা তাঁরই কৃতি পুত্র। এবার তিনি যে ছবিতে হাত দিয়েছেন সেই কাজটিকে সম্পূর্ণ করার ভার নিয়েছেন জিতেন্দ্র, শ্রীদেবী এবং স্বয়ং জয়া প্রদা।

আজ থেকে বেশ কয়েকবছর আগেকার কথা। তখনও জয়ার নাম এত হৈ হৈ করে বেজে ওঠেনি। তেলেগু ছবিতে কাজ করছেন নতুন মুখ, জয়া। একদিন আউটডোরে আলাপ হল শ্রীকান্তর সঙ্গে। নামে পরিচিত ছিলেন বৈকি। তবু হুট করে তিনি কি জীবনের কথাটি সেদিন ভেবে উঠতে পেরে-ছিলেন?

সেই প্রশ্নের আজ বুঝি অবসান হল। শ্রীকান্তর সেই তেলেগু ছবিটিতে কাজ করতে করতেই

রাকেশ রোশনের সঙ্গে জয়া প্রদা। ছবি : কামচোর

প্রেমে পড়েছিলেন ওরা। বিবাহিত তো কি হয়েছে, প্রেম যে অপূর্ব আকর্ষণ। তাকে বাধা দেবে সামাজিক অনুশাসন! বোধহয় মেনে নিতে পারেন নি জয়া। সমান উচ্ছ্বাস নিয়ে দুহাত বাড়িয়ে নিশ্চয় এগিয়ে এসেছিলেন শ্রীকান্তও। নইলে গত ২২ জুন, হোটেলের গুপ্ত কক্ষের আলোয় দীর্ঘ প্রতীক্ষার পর এ তাঁরা কিসের দীক্ষা নিলেন, একজন আর একজনের সঙ্গে কিসের বন্ধনে বাঁধা পড়লেন।

তাই এখন বোম্বাই চিত্র জগতে একটাই মাত্র আলোড়ন, একটাই মাত্র খবর—অবশেষে জয়া বিয়ে করলেন। এত জল্পনা কল্পনার অবসান হল। হেমামালিনী, অনিতা রাজ, বিজয়েতা কিংবা স্মিতা পাতিলের মতো দুম করেই বিয়ে করলেন জয়া। কিন্তু তার কেরিয়ারের কি হবে? পূর্ণ জোয়ারে এগিয়ে যাবে সে, নাকি এবার তাকে স্তিমিত ভাঁটার টানে এগোতে হবে ধিকি ধিকি।

বৈজয়ন্তীমালা, রেখা, হেমা বা আরো অনেকেরই মত দক্ষিণী জয়া প্রদা এখন হিন্দি ছবির উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ। কিন্তু সব মিলিয়ে প্রায় ১৫০টি ছবিতে নায়িকার ভূমিকায় অভিনয় করার পরও তাঁর আগামী দিন সম্পর্কে এখনও অনেকের সংশয় আছে। কিছুদিন আগে এক সাক্ষাৎকারে জয়া বলেছিলেন, 'শরীর প্রদর্শন, চটুলতা, যৌনতা দিয়ে সাফল্য থাকে না। আমি সেই জয়টিকা পরতে চাই না।' রুপালী পর্দায় সেই স্মার্ট, সংবেদনশীল মুখটিকে ঘিরে এবার আবার গুঞ্জনের ঝড় উঠল।

কথাটি শুনে হেসেই উড়িয়ে দিলেন শ্রীকান্তর স্ত্রী চন্দ্রা। তিনিও দেখতে এক কথায় অপরূপা। একটু থেমে বললেন, শুধু আমাকে কেন—আপনি শ্রীকান্তকেই জিজ্ঞেস করুন উনিই ভালো বলতে পারবেন। সত্যি কি উনি গোপনে বিয়ে করেছেন? আবার হেসে উঠলেন শ্রীকান্ত পত্নী চন্দ্রা নাহাতা।

ব্যাপারটা এখন পুরো রহস্যময় হয়ে উঠেছে। ব্যাপারটা তাহলে কি?

শ্রীকান্তর মা একটু ভ্রূ কুঁচকালেন। বললেন, দেখুন আমাদের পরিবার একটু ঐতিহ্যশালী পরিবার। আপনারা এমন করে কাদা ছোড়াছুড়ি করেন কেন বলুন তো! এই জন্যই আমরা কেউই প্রেসম্যানদের সঙ্গে দেখা করি না। আপনাদের কাজই কি শুধু কেচ্ছা করে বেড়ানো...

শ্রীকান্ত নাহাতা ও জয়া প্রদা

এখন বোম্বাই চিত্র জগতে একটাই মাত্র আলোড়ন, একটাই মাত্র খবর—অবশেষে জয়া বিয়ে করলেন। এত জল্পনা কল্পনার অবসান হল। হেমামালিনী, অনিতা রাজ, বিজয়েতা কিংবা স্মিতা পাতিলের মতো দুম করেই বিয়ে করলেন জয়া প্রদা।

তার মানে পাত্রপক্ষ পারিবারিকভাবে এখন কোনও উদ্যোগ নেয় নি। শুধুই চমক, কোন সত্য নেই। অথচ ফিল্ম ইণ্ডাস্ট্রির কাছ থেকে পাওয়া বিশ্বস্ত সংবাদ বলছে সেদিন ছিল ২২ জুন। প্রস্তুতি ছিল সাত বছরের। অনেকটা স্বপ্নের মতোই। এতদিন দুজনের প্রেম আলাদা রহস্য নিয়ে বেড়ে উঠছিল। মাত্র কয়েকজন ঘনিষ্ঠ বন্ধুর সামনে সেই শুভ পরিণয় সম্পন্ন হয়ে গেল। কিন্তু সেই ঘনিষ্ঠ কয়েকজনই বা কে? তার কোন উত্তর মেলে নি—

খুব সম্প্রতি জয়া একটি উল্লেখযোগ্য ছবিতে কাজ করছে। মনমোহন দেশাইয়ের বিরাট ছবি 'গঙ্গা যমুনা সরস্বতী'। ছবির কনট্রাক্ট থেকে ঋষিকাপুর বেরিয়ে গেছে। এখন মিঠুন আর অমিতাভ। কিংবদন্তী সেই নায়ক অমিতাভর পাশে কাজ করছেন জয়া। ঠিক এই সময় জয়াকে নিয়ে এমন একটা গুঞ্জন জয়ার ভাই রাজাবাবুকে রীতিমত শংকিত করে তুলেছে।

তাকে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি একটু চঞ্চল ভাব চোখে মুখে ফুটিয়ে তুললেন। শ্রীকান্ত পরিবারের সবাই তো অস্বীকার করলেন। এবার জয়ার নিকটজনরা কি বলেন। তাঁরা কি ব্যাপারটিকে স্বাগত জানিয়েছে?

রাজাবাবু বললেন, দেখুন ওই ২২ জুন জয়ার হাতে কোন সময় ছিল না। জয়াজী এত ব্যস্ত ছিলেন তার পক্ষে বিয়ের মত এত বড় একটা ব্যাপারে ঝুঁকি নেওয়া, অন্তত এ সময়ে—হতেই পারেনা। আর দেখুন কিছু মানুষ আছেন নিত্য নতুন গুজব বানানোই তাঁদের কাজ। সে ব্যাপারে সময় নষ্ট করে কি লাভ বলুন। তবে আমি জানি আমার বোন জয়া অবিবাহিতা, এখনও বিয়ে করে নি।

আর জয়াকে এভাবে বারে বারে বিয়ে দিয়ে আপনাদেরই বা লাভ কি বলুন তো? এ গুঞ্জন তো আর নতুন নয়। বছর তিনেক আগেই আপনারা লিখলেন, মাদুরাইয়ের একটি মন্দিরে গোপনে শ্রীকান্ত এবং জয়ার বিয়ে হয়ে গেছে। সেই বিয়েতে আবার নাকি জয়া নিজেই মাদ্রাজ আর বিজয়ওয়াড়া থেকে পুরোহিত নিয়ে এসেছিল। সত্যি আপনারা চেষ্টা করলে ঈশ্বরের সৃষ্টিকেও ম্লান করে দিতে পারেন।

আর জয়াপ্রদাকে তার বিবাহ সম্পর্কে প্রশ্ন করলে তিনি কিন্তু কোন জবাব দেন না। বরং ঠিক আগের মতই হেসে ওঠেন তিনি। এ হাসির হাজার অর্থ। কিন্তু এবার মাঝখানে হাসি থামিয়ে একটু নাটকীয় ভাবেই হঠাৎ চুপ করে গেলেন জয়া। কেন জানি না, মনে হল তিনিও প্রতিবাদ করলেন, যেন এড়িয়ে গেলেন। অর্থাৎ মিথ্যেই আপনারা ঘুরে বেড়াচ্ছেন, আমি যেমন আছি থাকব। আমি করি আমার কাজ, আপনারা করুন আপনাদের। গুঞ্জন শুনতে শুনতে আমি অভ্যস্ত, এখন খালি হাসিই পায়...।

ব্রহ্মকুমারীদের বিচিত্র আশ্রম !

প্রজাপিতা ব্রহ্মার আধুনিকতম সংস্করণ, এক কালের হায়দ্রাবাদের সফল জহুরী লেখরাজ কৃপালনী ওরফে 'ওমবাবা'। সারা বিশ্বে ১৪৬৫ টি ঈশ্বরীয় বিদ্যালয়ে রয়েছে তাঁর অসংখ্য অনুগামী ব্রহ্মকুমারীর দল। কে এই ওঁমবাবা ? সংসারের কামনা বাসনার মোহপাশ ছেড়ে বেরিয়ে এসে নারীকূল কেন ব্রহ্মকুমারীর জীবন বেছে নেয় ? সরজমিন তদন্ত রিপোর্টের ভিত্তিতে প্রবাল মৈত্রের প্রতিবেদন।

প্রজাপিতা লেখরাজ

সারাজীবন কেটে যায় পরশপাথরের সন্ধানে। তবু মেলে না। আবার কেউ কেউ অলৌকিক ক্ষমতার অধীশ্বর হয়ে নিজেরাই হন এক একটি পরশপাথর। যাঁর মুহূর্তের ছোঁয়া পাওয়া মাত্র সংসারের মায়াজালে দিকভ্রান্ত নরনারীর দল তাদের কামনা-বাসনার মোহ বিসর্জন দিয়ে সেই পরমগুরুর শ্রীচরণে নি:সংকোচে সঁপে দেন আপনাকে।

একালের 'প্রজাপতা ব্রহ্ম' নামে নিজেকে যিনি অভিহিত করেছেন তিনি হায়দ্রাবাদের সফল জহুরী লেখরাজ কৃপালনী। জীবনের ষাট বছর-ই যার কেটে গেছে হীরে জহরৎ-মণি-মানিক্যের বিকিকিনি করে, একদিন তিনি পেলেন এক অমর্ত্য জগতের ঈশারা।

হায়দ্রাবাদের নিজের বাড়ির বিশ্রামকক্ষে লেখরাজ একদিন বসে সুখতন্দ্রার আলস্য উপভোগ করছিলেন। হঠাৎ চারিদিক থেকে আলোর রোশনাই এসে তাকে ভাসিয়ে নিয়ে গেল। অপার্থিব জগতে হারালেন লেখরাজ কৃপালনী। সেই আলোকদ্যুতির মধ্যে লেখরাজ কি দেখছেন !

সেই আকস্মিক ঈশ্বর দর্শনের ঘটনা লেখরাজের মুখে শোনা যাক: এক উজ্জ্বল আলোক প্রভার মধ্যে দাঁড়িয়ে আছেন এক দিব্যকান্তি, সুদর্শন পুরুষ। তাঁর শিরস্থিত আলোকপুঞ্জের মধ্যে থেকে রাশি রাশি আলোক তরঙ্গ ঠিকরে বেরোতে লাগল। আমি অভিভূত হয়ে গেলাম। সেই আলোক তরঙ্গের সংস্পর্শে এসে একদল রাজকুমার ও রাজকুমারীর সৃষ্টি হল। হঠাৎ দৈববাণী হল-'তোমার অলৌকিক ক্ষমতায় তুমি এমনি সব মানব সন্তান তৈরি করবে।'

ঘটনার আকস্মিকতায় নিজেকে স্থির রাখতে পারলেন না লেখরাজ। চলে এলেন তীর্থভূমি বারাণসী ধামে। কিন্তু এখানেও তিনি দেবাদিদেব মহাদেবের সাক্ষাৎ পেলেন। লেখরাজ প্রায়শই

দেখতে লাগলেন-চারিদিকে বন্যা, প্লাবন, ঘূর্ণিঝড়ে নরনারীর দল ভেসে যাচ্ছে, পৃথিবীর ধ্বংস বুঝি আসন্ন প্রায়। মুষলধারে অগ্নিবৃষ্টির মাঝে জীবকুলে হাহাকার।

আর নিজেকে স্থির রাখতে পারলেন না লেখ-রাজ। দু'চোখ ভাসিয়ে বেরিয়ে এলো অশ্রু। কর-জোড়ে ভগবান শিবকে বললেন, 'প্রভু আর নয়। এবার আমায় মোহিনীময় শান্ত রূপে দেখা দিন।' ষাট বছরের বৃদ্ধ জহুরী হীরে জহরতের বিশুদ্ধতা যাচাই-এর মধ্যে নিজেই চিহ্নিত হলেন অমূল্য পরশপাথর রূপে।

একজন প্রাথমিক স্কুলের প্রধান শিক্ষকের ছেলে লেখরাজ কৃপালনী। চিরাচরিত পড়াশুনোয় মন না দিয়ে গমের ব্যবসা আরম্ভ করেন। নিজের ব্যবসায়িক বুদ্ধি ও অধ্যবসায়ের জন্য তার ব্যবসা ক্রমশঃ স্ফীত হতে লাগল। চলে এলেন কলকাতায়। এখানে জীবনের মোড় ঘুরল। প্রতিষ্ঠিত হলেন হীরা-জহরতের সফল ব্যবসায়ী রূপে। ব্যবসার কারণে বোম্বাই এলেন। এখানেও জাঁকিয়ে বসে, তৈরি করলেন বাড়ি। তারপর সংসারজীবন। ঐ ঘটনার পর থেকেই সাত্ত্বিক জীবন যাপনে অভ্যস্ত লেখরাজ কৃপালনী তীর্থযাত্রা, সাধু-সন্ন্যাসীদের সঙ্গে মেলামেশা ও বিভিন্ন আধ্যাত্মিক কাজে নিজেকে সঁপে দিলেন। ক্রমেই লেখরাজ কৃপালনী এক আধ্যাত্মিক সাম্রাজ্যের অধীশ্বর হয়ে বসলেন। দেশে দেশে ছড়িয়ে পড়ল তাঁর নাম-ডাক। অসংখ্য ভক্তের সমাগম হতে লাগল তাঁর কাছে।

আজ ব্রহ্মকুমারী কেন্দ্রের (প্রতিষ্ঠাতা এই লেখ-রাজ কৃপালনী) ১.৪৬৫টি শাখাকেন্দ্র সারা পৃথিবী জুড়ে ছড়িয়ে পড়েছে। লোকমুখে ও শিষ্যদের কাছে লেখরাজ প্রজাপিতা ব্রহ্মরূপে পরিচিত। সর্ব-মোট ৪৫ টি দেশের ১২০ টি কেন্দ্র এখন লেখরাজ অনুগামী ব্রহ্মকুমার ও কুমারীদের মিলনস্থল। উল্লেখযোগ্য ব্যাপার তাঁর প্রতিষ্ঠিত সংঘটি রাষ্ট্র-সংঘের প্রাথমিক বিভাগের সদস্যপদও লাভ করেছে।

ভারতের মাটিতে ব্রহ্মকুমারী কেন্দ্র স্থাপন করার আদর্শ স্থান হিসাবে বেছে নেওয়া হয় রাজস্থান ও গুজরাটের সন্নিহিত শৈলশহর মাউন্ট আবু। একসময় এখানে ছিল অনেকগুলি সুরম্য রাজপ্রাসাদ। তাদের একটিকে বেছে নিয়ে শুরু হয় নতুন ধর্মযজ্ঞ। যজ্ঞের চোদ্দ বছর অতিক্রান্ত হলে সংস্থাটির বিস্তার ঘটানো হয়। ১৯৫২ সালে ব্রহ্মকুমারীরা জ্ঞান বিতরণের জন্য বিভিন্ন রাজ্য পর্যটনে বের হন। ব্রহ্মকুমারী প্রকাশমণি অহমেদা-বাদে, মনমোহিনী এবং রুক্মিনীদেবী কাণ্ডলাতে যানধর্মোপদেশের বাণী নিয়ে। মনোহর, ইন্দ্রা আর গঙ্গা দিল্লিতে পাড়ি জমান। কমলসুন্দরী পুনায়। কলকাতায় আসেন প্রকাশমণি, সতীজি ও আনন্দ-কিশোর। সর্বত্রই ব্রহ্মকুমারীরা বিশেষ মনোযোগ আকর্ষণ করতে সক্ষম হন। দিল্লিতে ব্রহ্মকুমারীরা পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু ও তাঁর কন্যা ইন্দিরা গান্ধীর সঙ্গে পরিচিত হন। তারা প্রধানমন্ত্রী নেহরুর সঙ্গে সাক্ষাৎ করে, মাউন্ট আবুতে ব্রহ্ম কুমারীর যজ্ঞানুষ্ঠানে আসার সাদর আমন্ত্রণ জানান।

লেখরাজের এই অলৌকিক দিব্য শক্তির রহস্য আজও অজ্ঞাত। অগণিত ভক্তের কাছে পার্থিব দেহজ কামনা-বাসনা, পোশাক-আশাকের চাক চিক্য প্রভৃতি থেকে সর্বদা বিরত থাকতে উপদেশ দিতেন তিনি। তাঁর মতে সাদামাটা জীবন যাপনই একান্ত কাম্য। তাঁর আধ্যাত্মচর্চার মূলমন্ত্র-'ওম' ধ্বনি। তাই অনুগামীদের মধ্যে লেখরাজ 'ওম-বাবা' নামে খ্যাত। তাদের পরিচালিত আসরের নামও 'ওম মণ্ডলী'।

যে সব ভক্তরা লেখরাজের দর্শনার্থী, তাদের অধিকাংশই মহিলা। সংসারের যাবতীয় সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য ছেড়ে অনেকেই আচমকা এখানে চলে আসেন। কেউ কেউ সংসারে থেকেও আর সংসারী নন। শ্বেতশুভ্র শাড়ির প্রশান্ত রূপে তাদের আদর্শ-ব্রহ্মকুমারীর জীবন।

হায়দ্রাবাদের এক সম্ভ্রান্ত ধনী পরিবারের বিধবা রুক্মিনী দেবী। স্বামীর অকাল মৃত্যুর পর যাবতীয় দুঃখ-কষ্ট ভুলতে তিনি আশ্রমে যাতায়াত শুরু করেন। তাঁর সঙ্গে নিয়ে আসতেন বিবাহিত কন্যা গোপীকে। এই গোপীই পর 'মনোমোহন' নামে ব্রহ্মকুমারীদের সংযুক্তা প্রধান বলে পরিচিতা হন।

ভাবাবেগে বিহ্বল হয়ে ব্রহ্মকুমারীরা ঘন্টার পর ঘন্টা লেখরাজ কৃপালনীর সান্নিধ্যে পড়ে থাকেন। ভাবমুক্তি হলে তারা বলেছেন, যেন স্বয়ং ভগবান শ্রীকৃষ্ণের দর্শন পেলেন।

১৯৩৭ সালে সর্বপ্রথম এই ওঁম মণ্ডলীর ম্যানে-জিং কমিটি গঠিত হয়। মণ্ডলীর সদস্যদের

ব্রহ্মকুমারীদের আশ্রম

প্রত্যেকেই মহিলা। ওঁম মণ্ডলীর সমস্ত সম্পত্তি এই কমিটির হাতে অর্পণ করা হয়। কমিটির প্রধানা নির্বাচিত হন 'রাধে'। প্রজাপিতা লেখরাজ 'রাধে'-কেই সত্যযুগের শ্রী লক্ষ্মীর বর্তমান সংস্করণ বলে অভিহিত করেন

এরপর লেখরাজ কৃপালনী ওরফে ওমবাবা দুটি ঘোষণা করেন। প্রথমটিতে তাঁর বক্তব্য নরনারীর কাম বিকার নরকের দরজা এবং কামেচ্ছা জীবনে অভিশাপ। কেবলমাত্র ব্রহ্মচর্যাই মোক্ষ বা জ্ঞানলাভের একমাত্র পথ। অনুগামিনী-দের কাছে তার বক্তব্য, তারা সবাই যেন নিজ নিজ অভিভাবকদের কাছ থেকে লিখিয়ে আনেন, রাধের কাছে জ্ঞানোপদেশ নিতে তাদের স্ত্রী, কন্যাদের কোন বাধা নেই। লেখরাজ স্বয়ং নিজের স্ত্রী যশোদা, পুত্রবধূ রাধিকা ও কন্যার জন্য সর্বপ্রথম সম্মতি জ্ঞাপক চিঠি লিখে দেন। লেখরাজ কৃপালনী ও রাধের আধ্যাত্মিক সংস্পর্শে এসে অনেক মহিলাই নাকি তাদের স্বামীর কাছে শেষ বিদায়ের চিঠি লিখে আসেন। তারা লেখেন এই মণ্ডলীর সংস্পর্শে এসে এক অমৃতময় জীবনের সন্ধান পেয়েছেন। সুতরাং স্বামীরা পুনরায় অন্য রমণীর সঙ্গে ঘর করলেও তাদের আপত্তি নেই। এমন কি ওঁম-বাবার এই আশ্চর্য সম্মোহনী ক্ষমতায় বহু সম্ভ্রান্ত পরিবারের কর্তাব্যক্তিরাও তাদের সমস্ত স্থাবর-অস্থাবর সম্পত্তি ম্যানেজিং কমিটির হাতে তুলে দেন।

ওম মণ্ডলীর আশ্রমটি আবাসিক। এখানে ছোট ছোট বাচ্চারা থাকে এবং পড়াশুনা করে। প্রত্যেকের জন্য একই জামা-কাপড় ও একই ধরনের বিছানা। নির্ধারিত সময়ে প্রত্যেকে, ড্রিল, প্যারেড, যোগাভ্যাস, গান ও পড়াশুনা করে। খেলাধূলোর জন্য আলাদা জায়গা নির্দিষ্ট। সারা-দিন তাদের হেসে খেলে হৈ-চৈ করে এমন ভাবে কাটে, যাতে তাদের মা-বাবার কথা একদমই মনে পড়ে না। তাদের কাছ ওমবাবা-ই নিজের বাবা। তাদের কাছে লেখরাজ কখনো 'বাবা' বা পিতাজী। আবার কখনো 'যজ্ঞপিতা' নামেও পরিচিত।

লেখরাজ একদিন ঘোষণা করেন যে, তিনি প্রকৃতপক্ষে 'প্রজাপিতা ব্রহ্মা.' কলিযুগের পাপক্ষয়ী জগতের সমস্ত অনাচার দূর করার জন্যই তাঁর পার্থিব দেহধারণ। মানব সমাজের সমস্ত দুঃখ কষ্ট দূর করে তিনিই সত্যযুগের শান্তি প্রতিষ্ঠা করবেন। আর তার একান্ত সহযোগী রাধে হলেন সাক্ষাৎ মানবেশ্বরী সরস্বতী। তিনি ব্রহ্মার মানসপুত্রী জ্ঞান স্বরূপা।

১৯৫৭ সালের রাজধানী দিল্লীর লালকেল্লায় ব্রহ্মকুমারী সম্প্রদায়ের এক বিরাট ধর্মসম্মেলন হয়। সেখানে ওঁমবাবা ওরফে ব্রহ্মবাবা তাঁর চমৎকার স্বাগত ভাষণে উপস্থিত দর্শকবৃন্দকে মোহিত করে দেন। ভক্তদের মধ্যে বিতরণ করা হয় রঙীন ফোল্ডার ও বই। ১৯৫৯ সালে পাটনায় বিচারক ও আইনজীবীদের এক সম্মেলনেও তাঁর গুণাবলী-সমৃদ্ধ লিফলেট বিলি করা হয়।

এইসব মেলায় নানা অনুষ্ঠানের পাশাপাশি

ব্রহ্মকুমারীরা এক প্রদর্শনীরও আয়োজন করেন। প্রদর্শনীতে ব্রহ্মকুমারীদের ছবি থেকে ক্যালেন্ডার তৈরি করে বিক্রি করা হয়। তাদের ১১৫ টি আধ্যাত্মিক সংগ্রহালয় থেকে এই ক্যালেন্ডার আজও বিক্রি করা হয়।

১৯৩৯ সালে মহাত্মা গান্ধী ইংরেজদের বিরুদ্ধে সত্যাগ্রহ আন্দোলন শুরু করলে লেখরাজ কৃপালনী ওরফে ব্রহ্মবাবা গান্ধীজীকে টেলিগ্রাম মারফৎ জানান যে, 'অনশন এবং সত্যাগ্রহের পরিবর্তে পূর্ণ স্বরাজ পাবার একমাত্র পথ ঈশ্বরীয় জ্ঞান লাভ এবং দিব্যদর্শন'। ওই বছরই তিনি ইংলণ্ডের অধীশ্বরী রাণী এলিজাবেথকে এক চিঠি লিখে ভারতবাসীর স্বাধীনতা ফিরিয়ে দেবার অনুরোধ জানান। তাছাড়া ব্রিটিশ সম্রাট ষষ্ঠ জর্জকেও লেখেন তিনি। পাকিস্তান গঠিত হবার পর মহম্মদ আলি জিন্না ও মার্কিন প্রেসিডেন্ট ফেডি ট্রুম্যানকেও চিঠি লিখেছিলেন তিনি। এরপর পঞ্চাশের দশক থেকে পারমাণবিক যুদ্ধের আশঙ্কা যখন প্রবল হয় উঠল, বিশ্বের তাবড় তাবড় রাজনীতিককে তিনি চিঠিতে জানালেন, 'আপনারা চিন্তা করবেন না, এই পারমাণবিক যুদ্ধ হওয়া একান্ত জরুরী। কারণ গীতায় আছে অসুর শক্তির বিনাশ প্রয়োজন। আর ধ্বংসের মাধ্যমেই হবে আগামীদিনের সাম্য, মৈত্রীর নবীন প্রজন্মের উত্তরণ'।

মাউন্ট আবু : বিহঙ্গাবলোকন

ওমশান্তি ভবন

ব্রহ্মকুমারীদের আশ্চর্যজনক ও রহস্যময় জীবনযাপন, সেই সঙ্গে তাদের ধর্মাচরণের আচারপদ্ধতি দেশ বিদেশে ছড়িয়ে পড়তে থাকে। তারা সদ্য মুকুলিত যৌবনকে বলি দেয় ব্রহ্মচর্যের যূপকাষ্ঠে। এই বিস্ময়কর ব্রহ্মকুমারীদের সাহচর্য লাভেচ্ছুদের সংখ্যা ক্রমশই বাড়তে থাকে। হৃষিকেশে স্বামী শিবানন্দের শান্তি সম্মেলনেও ব্রহ্মকুমারীরা আমন্ত্রিত হন।

ব্রহ্মকুমারীদের দিনের অনেকটা সময়ই নাকি কাটে ধ্যানকক্ষে। এই কক্ষের মধ্যে বাস্তবে কি হয়, সে সম্বন্ধে তারা কখনো মুখ খোলেন না। তাই তাদের নিয়ে নানা গল্প-কথা প্রচলিত। এক ব্যক্তি যিনি দীক্ষা শেষ না করেই তাদের সঙ্গ ত্যাগ করেন, তিনি জানান, 'প্রথম যেদিন আমি ধ্যানকক্ষে যাই, তখন দেখি বেশ কয়েকজন ধ্যানস্থ হয়ে বসে আছেন। তাদের কে সাত, আট দিন ধরে এই অবস্থায় দেখি। পরে আমার সঙ্গে এক ব্রহ্মকুমারের আলাপ করিয়ে দেওয়া হয়। সে আমায় প্রথমে ধর্মের বই পড়ায়। আরও সাত, আট দিন পরে আমাকে একটা ঘরে নিয়ে যাওয়া হয়। ঘরের মধ্যে একটা লালবাতি আমার চোখ ধাঁধিয়ে দেয়। বাতিটি শিবলিঙ্গাকৃতি। পাশে সৃষ্টিচক্র এবং কল্পবৃক্ষের ছবি, আমরা পাশাপাশি বসলাম। হঠাৎই টেপ রেকর্ড থেকে বজ্র গম্ভীর কণ্ঠস্বর ভেসে এলো, 'ওই লাল বিন্দুটির দিকে চোখ রাখ। শান্তি পাবে। তুমি শান্তি খুঁজে বেড়াচ্ছে। দ্যাখো কি ভয়ানক জ্যোতির প্রকাশ হচ্ছে....।'

পেশায় ডাক্তার দিল্লিবাসী ওই ব্যক্তিটি বললেন- 'ওদের দীক্ষা পদ্ধতির মধ্যে অবশ্যই সম্মোহন আছে। এই সম্মোহন থেকে বেরিয়ে আসার উপায় কারো নেই।'

ব্রহ্মকুমারী কেন্দ্রের আসল ঘাঁটি তার বিশ্ববিদ্যালয়। প্রজাপিতা ব্রহ্মকুমারী ঈশ্বরীয় বিশ্ব বিদ্যালয়। এই কেন্দ্রেটি প্রায় দেড় লাখ ব্রহ্মকুমারীর মিলনস্থল। এই রহস্যময় বিশ্ববিদ্যালয় যেমন আচার আচরণে অদ্ভুত, তেমনি এর গুরুত্বও অনস্বীকার্য। সারা বিশ্বে এটি স্বীকৃতি পেয়েছে। গায়নার সংসদে কার্যকাল শুরু হবার আগে যে তিন মিনিটের রাজযোগ পদ্ধতি অবলম্বন করা হয়, তা এই বিশ্ববিদ্যালয়েরই অবদান। মরিশাস সরকারও এদের স্বীকৃতি জানিয়েছেন। সেই সঙ্গে কোস্টারিকায় রাষ্ট্রসংঘের শান্তি সংঘে বিশেষ প্রশিক্ষণ দানের জন্য এই বিশ্ববিদ্যালয় আমন্ত্রিত হয়েছিল।

ব্রহ্মকুমারী বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রধান 'দাদী প্রকাশমণি' ১৯৮১ সালে সংযুক্ত রাষ্ট্রসংঘের প্রদত্ত শান্তি পদক পেয়েছেন। এই বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রভাব ও প্রতিপত্তির স্বাক্ষর বহন করে, যখন মাউন্ট আবুতে আন্তর্জাতিক শান্তি সম্মেলন হয়। এই সম্মেলনে উপস্থিত বিশিষ্টজনদের মধ্যে ভারতের রাষ্ট্রপতি জৈল সিং, উপরাষ্ট্রপতি ভেঙ্কটরমণ, প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি ভি.ডি.জাত্তি, তিব্বতী ধর্মগুরু দলাইলামা, রাষ্ট্রসংঘের সহকারি সচিব ড. রবার্ট ম্যুলার, মিশরের প্রয়াত প্রেসিডেন্ট আনোয়ার সাদাতের পত্নী-প্রমুখ।

তবুও এই ব্রহ্মকুমারীদের আশ্চর্য জীবনযাপন সবার কাছে আলোচনার বিষয়বস্তু হয়ে ওঠে। অনেকে আবার এই ব্রহ্মকুমারীদের বিশেষ সুনজরে দেখেন না। মাউন্ট আবুর নিকটবর্তী আর্যসমাজের সদস্যারা ব্রহ্মকুমারীদের সম্পর্কে একটি পুস্তিকাপ্রকাশ করেছেন। বইটির নাম 'ব্রহ্মকুমারী মত-দর্পণা'। তাতে লেখা হয়েছে ব্রহ্মকুমারীরা আদৌ নিষ্পাপ বা নিষ্কলঙ্ক নয় সেই সঙ্গে ওঁমবাবা লেখরাজ কৃপালনীর চারিত্রিক বিশুদ্ধতা নিয়েও সংশয় প্রকাশ করা হয়েছে।

১৯৩৬ সালে ওঁমবাবার আদেশে তাঁর শিষ্যা বিবাহিত মহিলারা তাদের স্বামীদের সঙ্গে সম্ভোগ-সম্পর্ক ছিন্ন করেন, তখন বেশ কিছু মহিলার স্বামী হইচই তোলেন। পরে তা আদালতের কাঠগড়ায় গিয়ে পৌঁছায়। পরবর্তী সময়ে আর্য-সমাজিরা একটি জোর আন্দোলন শুরু করেন। এমন কি বিধানসভাতেও এ প্রসঙ্গে ওঠে।

ব্রহ্মকুমারীরা অবশ্য গভীর ভাবে আত্মবিশ্বাসী। তাদের কাছে বিরোধীরা মহাভারতের কৌরব বলে চিহ্নিত। তাদের ধারণা, ন্যায়-নিষ্ঠা ও ধর্মাচরণের মাধ্যমে এক নতুন জগতের সন্ধান তারাই দিতে পারবেন। তাদের চরম লক্ষ্যে উত্তীর্ণ হওয়ার জন্য রয়েছে ওঁমবাবা ওরফে প্রজাপিতা ওরফে লেখরাজ কৃপালনীর অকৃপণ আশীর্বাদ।

অদম্য নিষ্ঠায় যিনি জীবনের শুরুতে চরম ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠা পেয়েছিলেন সেই লেখরাজ কৃপালনী ও তাঁর অনুগামী ব্রহ্মকুমারী সম্প্রদায়ের কার্যধারার অন্তর্নিহিত তথ্য এখনও রহস্যময়ই রয়ে গেছে।

ছবি : গিরীশ শ্রীবাস্তব,

কলকাতা মহানগরীতে বীভৎস মজা !

শীতের শুরুতে কলকাতায় বিদেশী উৎসবের ছোঁয়া। অনুকরণীয় উত্তেজক নাচ আবহমান সংস্কৃতি-কে ডাকছে আয় আয়। সামনে সমুদ্র, কিন্তু কিসের ? নগ্ন নারী-শরীরের হিল্লোলে বাবু কলকাতা তুড়ি দিয়ে হাসছে হাঃ হাঃ হাঃ। শরীরী হাতছানির পাশে এসে দাঁড়িয়েছে শতাব্দীর অভিশাপ ড্রাগ। বাঙালি সংস্কৃতির বিষাক্ত ক্ষতগুলির দিকে আঙুল বাড়িয়ে দেখিয়েছেন আমাদের প্রতিনিধি গুরুপ্রসাদ মহান্তি।

সংস্কৃতি-শহর কলকাতার হাল আমলের 'সংস্কৃতি- চর্চা' !

২২ নভেম্বর। শনিবার। ঘড়িতে রাত ঠিক সাড়ে ১১টা। বাইরে কলকাতা শহর যখন আস্তে আস্তে ঘুমিয়ে পড়ছে ঠিক তখনই পাঁচতারা হোটেলের বলরুম ফেটে পড়ছে তুমুল উল্লাসে। অর্কেস্ট্রার ছন্দোময় বাজনাকে ছাপিয়ে যাচ্ছে শ' শ' দর্শকের চিৎকার।

সজ্জিত বলরুমের ভিতর বসে আছেন কয়েক শ' সুরামত্ত দর্শক। পেয়ালা উপচে যাচ্ছে রঙিন পানীয়ে। আলতো নীল আলোয় সারা বলরুম হয়ে উঠেছে একেবারে স্বপ্নপুরী। আর সেই স্বপ্নপুরীর স্বপ্নসুন্দরী হয়ে নেচে যাচ্ছে নেপালের 'রাতের জোঁনাকি'–মিস জুলিয়েট। উথলে উঠছে তার যৌবন। বাজনার তালে তালে দুলে উঠছে পেলব দেহবল্লরী। স্বল্পবাস জুলিয়েটের উদগ্র রূপ, মিষ্টি গলা মুহূর্তে কামনামদির করে তুলছে প্রত্যেকটি দর্শককে। তেতে উঠছে তারা। আর সেই দারুণ উন্মাদনায় উন্মাদ হয়ে চেয়ার থেকে উঠে দাঁড়িয়ে অসম্ভব চিৎকারে ফেটে পড়ছে সবাই। রাতের জোনাকিকে বাহুবেষ্টনীতে বন্দী করার ব্যর্থ চেষ্টায় মত্ত হয়ে উঠেছে। নাচতে শুরু করেছে উদ্দাম ভাবে।

এদিকে জুলিয়েট করছে নিজের যৌবনের বেসাতি। প্রত্যেকটি দর্শকের কাছে ধরা দেবার ছল করে নীল আলোয় পিছলে যাচ্ছে তার শরীর। চতুর পায়ে নাচছে এই উন্মত্ত নর্তকী। নিজেকে আবেদনময়ী করে দোলাচ্ছে শরীর, আমন্ত্রণের ভঙ্গিতে ছড়িয়ে যাচ্ছে মোহ। আর সেই মোহে কামার্ত পুরুষের দল জ্বলে পুড়ে যাচ্ছে কামনার আগুনে। লোলুপ চোখ গেঁথে দিচ্ছে নর্তকীদেহের প্রত্যেকটি খাঁজে। প্রতিটি স্পর্শাতুর অংশে। বিচিত্র চীৎকারে, আর আদিম হাসিতে ভরে দিচ্ছে বলরুম।

চলতে থাকে উৎসব। মানুষের উপভোগের উৎসব। মানুষের জান্তব প্রবৃত্তিকে উসকে দেবার নতুন উৎসব। পটবদল হয় না, শুধুমাত্র বদলে যায় নর্তকীদের নাম। জুলিয়েটের বদলে নাম হয় মিস শেফালী, মিস মীনাক্ষি। মিস রীনা, মিস জে, মিস তুহিনা।

আজ বিংশ শতাব্দীর শেষে সভ্য মানুষ মুখে নান্দনিক তত্ত্বের বড় বড় বুলি আওড়ায়, শিল্পবোধের ধুয়ো দিয়ে পাশবিক উল্লাসে উপভোগ করে নারী শরীর। হিংস্র হয়ে ওঠে তাদের চোখ, লালসায় উত্তপ্ত হয়ে ওঠে তাদের শরীর। কলকাতায় আজ সৃষ্টিশীল শিল্পের আসরে দর্শক নেই। সত্যজিতের ছবির সমঝদার নেই, শাঁওলি মিত্রের 'নাথবতী অনাথবৎ' একাভিনয়ে মঞ্চের টিকিট বিক্রি হয় না। রবি শংকরের সেতারের অনুষ্ঠানেও দর্শক আসন ফাঁকা পড়ে থাকে। কিন্তু ক্যাবারে ক্যাসিনোয় উপচে পড়ে ভিড়। টিকিট সংগ্রহ করা থেকেই মারামারি পড়ে যায়। আর এই সুযোগের সদ্ব্যবহার করতে ব্যবসায়ীরাও উঠে পড়ে লাগে। ৪ তারা ৫ তারা হোটেলের বলরুমে নিয়মিত অনুষ্ঠান হয়ে দাঁড়িয়েছে –ককটেল, অর্কেস্ট্রা, ডিনার আর ক্যাবারে। যৌবনের বেসাতি। বিখ্যাত 'সান' সংস্থা শহরের অংশে অংশে আয়োজন করে ক্যাবারে নাচের। দেশী বিদেশী তন্বী নর্তকীর দেহছন্দে নিশি জাগরণের সুন্দর ব্যবস্থা। এই ক্যাবারে আজ শুধু হোটেলের বলরুমেই মাত্র সীমাবদ্ধ থাকছে না, মঞ্চের ব্যবসায়ী মালিকরা আজ দারুণ লাভের স্বপ্নে ক্যাবারে-কে পেশাদারি মঞ্চে আনিয়ে নিয়েছেন। থিয়েটারের কাহিনীর সাথে অনিবার্যভাবে (কোন কোন ক্ষেত্রে অপ্রাসঙ্গিক হলেও) জড়িয়ে দিচ্ছেন ক্যাবারে-কে। কারণ ক্যাবারে নাচ আজ দারুণ পয়মন্ত। দু'হাত ভরে পয়সা লাভের ব্যবস্থা করে দিয়েছে তাঁদের।

শহরের মঞ্চগুলিতে আজ 'এ' মার্কা নাটকের রমরমা। বিজ্ঞাপনে বড় বড় অক্ষরে লেখা হয়–নৃত্য পরিকল্পনায় মিস শেফালী, নৃত্যে মিস জে, মিস মীনাক্ষি। বাসুদেব মঞ্চ, শ্যামাপ্রসাদ মঞ্চ, প্রতাপ মঞ্চ, নেতাজী মঞ্চ, সারকারিনা, মিনার্ভায় আজ দর্শকের লালসা মেটাবার নতুন নতুন উপায়। আর বয়স নির্বিশেষে পরিবারের সবাই উপভোগ করছে লাজ রাখো (এ), বারবধূ (এ), অশ্লীল (এ), প্রজাপতি (এ), সম্রাট ও সুন্দরী (এ), নিশি প্রেম (এ), কলংক (এ), মৈথুন (এ) প্রভৃতি নাটক। পরিপূর্ণ প্রেক্ষাগৃহে অনায়াসে পার করে দিচ্ছে কয়েক শ' রজনী। শিল্প আর নান্দনিক তত্ত্বের দোহাই দিয়ে বঙ্গমায়ের সুসন্তানেরা নির্লজ্জ ভাবে জান্তব উল্লাসের স্বীকৃতি জানাচ্ছেন একে।

২৫ ডিসেম্বর ১৯৮৬। আর মাত্র ক দিন বাদে বড় দিন। যেশাসের হোলি বার্থ ডে। তুমুল উল্লাসে মেতে উঠবে কলকাতা মহানগরী। আর তারই
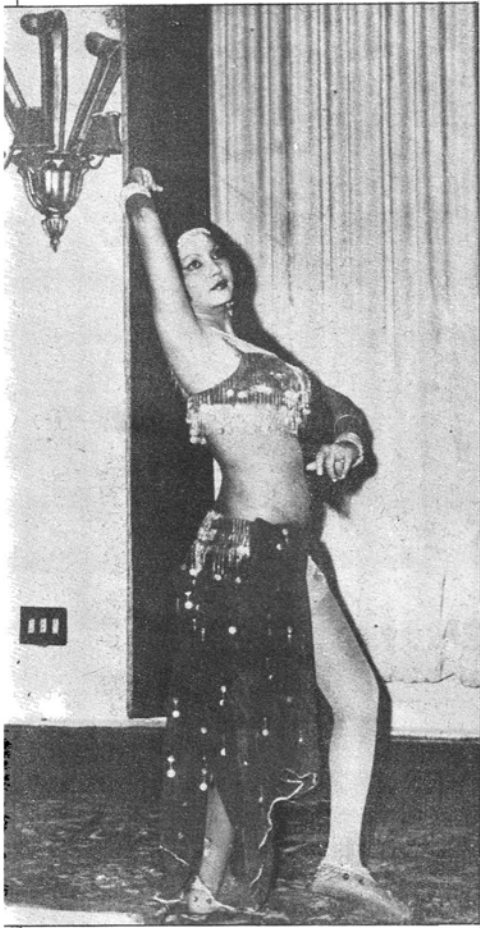
'নৃত্যের তালে তালে' কলকাতার কালচার এগোচ্ছে।

নেই তো মজা, স্বপ্নের নিশিবাসর। মাত্র ২০০ টাকার বিনিময়ে যৌবন বিকিকিনির হাট। অর্কেস্ট্রার তালে তালে বাবুদের ভেতরের জিভটা আজ আরেকবার নেচে উঠবে অস্থির উন্মাদনায়।

শুধু পাঁচতারা হোটেলের বলরুমে নয় এ উন্মাদনা সারা কলকাতার গলিতে গলিতে। অস্বাভাবিক দ্রুততায় পাড়ায় পাড়ায় গজিয়ে উঠেছে ব্লু-ফিল্মের ভিডিও সেন্টার। আর এইসব বে-আইনী ভিডিও সেন্টারের সৌজন্যে তেতে উঠছে যুব সম্প্রদায়। মাত্র ৫০ টাকার বিনিময়ে তাদের প্রিয় শ্রীমতী নায়িকারা প্যান্টি ব্রা পরে উপহার দিচ্ছে স্বপ্নের নীল ছবি। কেবল বিকিনীতে ৩ ঘন্টার মৌতাত বিকিকিনি। শিখিয়ে দিচ্ছে রাত্রিকালীন রহস্যময়তার গোপন কলা কৌশল। ক্লোজ আপ আর লং শর্টে নিখুঁত শিক্ষিত করে তুলছে রাতের বিছানার সমূহ কানুনকেতায়। ঘনিষ্ঠ অ্যাকশনটি পর্যন্ত। চরম তৃপ্তির আনন্দ শীৎকারটিরও অন্যথা নেই। যৌবনমদির দেহবল্লরীতে তুলে যাচ্ছে ঢেউ। অঙ্গভঙ্গীতে আমন্ত্রণ। রুপোলি পর্দার মিথ্যে আমন্ত্রণে তেতে যাচ্ছে যুব সমাজ। অস্থির উন্মাদনায় উন্মত্ত হয়ে যাচ্ছে যুবকরা। লোভে সপ সপ করে উঠছে তাদের জিভের নোলা। শিল্পময়তার নিকুচি করে তারা যৌনপরিতৃপ্তি খুঁজছে। বিকৃত উল্লাসে ফেটে পড়ছে সবাই। একবিংশ শতকের দিকে যাত্রা করার যখন প্রস্তুতির সময় তখন অন্ধকার প্রেক্ষাগৃহে প্রিয় নায়িকার মিথ্যে শারীরিক আবেদনের প্ররোচনায় অবদমিত কামনা চরিতার্থ করার জন্য উদ্বেল হয়ে উঠছে। ভবিষ্যতের ভারত যাদের দিকে তাকিয়ে আছে সেই যুব সম্প্রদায় বে-আইনী জেনেও ব্লু-ফিল্মের ভিডিও সেন্টারে বিকৃতভাবে কাম চরিতার্থ করছে।

এই আমন্ত্রণী মুদ্রাই কি সংস্কৃতির আধুনিক দিকদর্শন?

প্রস্তুতিপর্ব চলছে জোর কদমে। ডিসেম্বরের গোড়া থেকে। দিকে দিকে এখন ক্রিশমাস বুড়োর ছাপ্পা। সাদা চুলে সাদা দাড়ি ক্রিশমাস বুড়ো দেখতেই যা বুড়ো, যৌবনের রক্ত বুকের ভিতর টগবগিয়ে ফুটছে।

ক্রিশমাস এসে যাচ্ছে কলকাতায়। এসে যাচ্ছে যীশুর পূণ্য জন্মদিনে কলকাতায় বীভৎস মজা। যে মজার পূর্ণতা নববর্ষের সূচনায়। বড়লোকদের বিনোদনের জন্য আগেই নেমন্তন্ন করে রেখেছে পাঁচ তারা হোটেল। অন্যান্য বছরের মত এবারও রাত ৮টা থেকে তামাসা শুরু হবে। চলবে মাঝরাত অব্দি। আয়েসী স্ট্রিপটিজের আসর। বড়লোকবাবুরা রঙিন নেশায় চুর হয়ে দেখবে নৃত্যের তালে তালে নর্তকীর বস্ত্র উন্মোচন। নৃত্যরতা যুবতী একে একে খুলে ফেলবে স্বচ্ছ পোশাক। দু' পিস যতক্ষণ থাকে তবু কথা। তারপরই তো মজা! বীভৎস মজা! চোখের সামনেই উন্মত্ত নর্তকী ভেনাস হয়ে যাবে। আর বাবুরা চোখে চোখে গিলবে জীবন্ত ভেনাসকে। মাংসের অসহ্য স্বাদে জল গড়াবে জিভ দিয়ে। মসৃণ শরীরে তুমুল-তুফান তুলবে ঝাড়বাতির আলো। স্বপ্নের মৎস্যকন্যাটি হয়ে পিছলে যাবে বাবুদের লোলুপ বেষ্টনী থেকে। বাবুরা বীভৎস উল্লাসে হাসবে, অসংযত পায়ে নাচবে। নাচতে নাচতে ক্লান্ত হয়ে যতক্ষণ না ধরাশায়ী হয় ততক্ষণ পর্যন্ত। আর সেখা-

কলেজ ইউনিভার্সিটির শিক্ষার্থীদের দিকে তাকিয়ে ভয় হয়। দিনের পর দিন ড্রাগ এডিকটেড হয়ে পড়ছে সবাই। চারিত্রিক দৃঢতার প্রশ্ন অনেক পরে, নিজেদের বিবেক বোধ হারিয়ে ফেলছে দিনকে দিন। তুঘলকী নেশায় বিশ্বভুবন দেখাবে কলকাতা।

লুঠ, ধর্ষণ, শ্লীলতাহানির চেয়ে এটাই বা কি কম অপরাধ? রাস্তাঘাটে একটু কান পাতলেই এমন সংলাপ খুবই স্বাভাবিক—

—'আইডিয়াল ম্যারেজ' ছবিটা দেখেছিস?

—না। কেমন রে?

—আরে গুরু, বলে বোঝানো যাবে না। সব খুলে দেখিয়েছে। এমন কি....পর্যন্ত। কি ফোটোগ্রাফি মাইরি!

—'পরমা'র চাইতে বেশি?'

—আরে রাখ তোর 'পরমা'। 'দি বডি' দেখেছিস?

—না, 'এ্যান ইভনিং ইন প্যারিস' দেখেছিস?

—আরে ছোঃ

—কালকে 'ব্লু' দেখব। বিকলুদার কাছে টিকিট ম্যানেজ করেছি।

আজ কলেজ ইউনিভার্সিটির শিক্ষার্থীদের দিকে তাকিয়ে ভয় হয়। দিনের পর দিন ড্রাগ এডিকটেড হয়ে পড়ছে সবাই। চারিত্রিক দৃঢ়তার প্রশ্ন অনেক পরে, নিজেদের বিবেক বোধ হারিয়ে ফেলছে দিনকে দিন। তুঘলকী নেশায় বিশ্বভুবন দেখাবে কলকাতা। কি চাই? মদ? হেরোইন? চরস? গাঁজা? মরফিয়া? ট্যাবলেট? নো প্রবলেম। অল আর অ্যাভেলেব্‌ল হেয়ার। শরাব তো শরবৎ—এর মতন। বার খোলা আছে। সুন্দরী মেয়ের অঙ্গদুলুনি আর গান শোনার সাথে ঠোঁটে পেয়ালা ছোঁয়াবার ব্যবস্থা

আছে। চরসের গুলি দেড় টাকা। আধা বন্ধ ঝাপ তুলে গুলি চাইতে না চাইতেই হাতে পৌঁছে যাবে সব। দোকানীর বাঁধা খদ্দের হলে কথা নেই। জগাদা, ভগাদার নাম পাড়লেই এক ছিলিম হাজির। এখন দম ভরে টান মারা। মজা তো এ্যাইসাই হ্যায়। মৌজ এ্যাইসাই। এ মৌতাত শহর কলকাতাকা।

চালাও ক্যাবারে, যৌনতাসর্বস্ব নীল ছবি, ককটেল, ইভটিজিং, জুয়া, সাট্টার সাথে নবতর সংযোজন হল ড্রাগ। বিধ্বংসী ড্রাগ–কলকাতার যুবশক্তিকে প্ররোচিত করছে, এগিয়ে দিচ্ছে সর্বনাশের দিকে। স্বাভাবিকভাবেই কলেজ ইউনিভার্সিটির ছেলেরা মেতে উঠছে সর্বনাশা নেশায়, ঢুকছে ব্লু-ফিল্মের ভি ডি ও সেন্টারে। ড্রাগের বিরুদ্ধে একদিকে কলকাতায় মিছিল, পোস্টার, হোর্ডিং, তবু দোকানদারদের বিক্রিবাটায় একরত্তি কমতি নেই। নেশায় কারোরই অনীহা নেই। বরং অস্বাভাবিক হারে বাড়ছে দিনকে দিন।

আমহার্স্ট স্ট্রিটের রামমোহন ছাত্রাবাসের ২২ নং ঘরে উত্তরবঙ্গের ছেলেটি আজ চূড়ান্ত ড্রাগ এডিকটেড। হেরোইন, ট্যাবলেট, চরসেও এখন নেশা হয় না তার। রাতের বেলা সকলে ঘুমিয়ে পড়লে মরফিয়া ইনজেকশন নেয় নিজের হাতে। শুধু এই ছেলেটিই নয়, কলেজ ইউনিভার্সিটির হস্টেলে এ ঘটনা ঘটছে হামেশাই। করিডোরে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে চরসের গুলি পোড়ায় কলেজের ছেলেরা।

কিন্তু যে সময় তরতাজা যুবকদের প্রাণশক্তিতে উচ্ছল থাকার কথা সে সময় তারা ড্রাগের কাছে অনায়াসে মাথা নুইয়ে দিচ্ছে। এমনভাবে আসক্ত হয়ে পড়ছে যে হাতের আঙুল কাঁপছে সারাটা সময়। কলম ধরলে হাতের অক্ষর আঁকা-বাঁকা হচ্ছে। চরসের মসলা ডলতে ডলতে অরবিন্দ বলে, 'পড়াশুনা করার পরে যে চাকরি পাবো তার ঠিক আছে? নেশা অন্য জগতে নিয়ে যায়, নিজের উপর ক্ষোভ থাকে না। আর সে মৌতাতের জন্যই তো নেশা করতে ভালবাসি। নেশা আছে বলেই বেঁচে আছি। ড্রাগে জগতের সব কিছু কষ্ট দুঃখ ভোলার দারুণ মজা।

আর সেই ভালোবাসা পেতে গিয়ে, দারুণ মজা উপভোগ করতে গিয়ে সমাজ আজ এগিয়ে যাচ্ছে চরম সংকটের দিকে। এতসবের পেছনে নতুন সংযোজন হুজুগ। হুজুগ প্রিয় কলকাতাবাসীর বিচার বিবেচনার ক্ষমতা ধীরে ধীরে লোপ পাচ্ছে। কোথায় কি শুনল না শুনল তাই নিয়েই শুরু করে মাতামাতি।

২৯শে অক্টোবর ১৯৮৬। ঠনঠনে আর বাটার মাঝ রাস্তায় ট্রাম থেকে হুড়মুড়িয়ে পড়ল দুই যুবক। দুজনেরই তাগড়াই চেহারা। প্রকাশ্যে শুরু হয়ে গেল মারপিট। কিন্তু দুর্ভাগ্য যার পিক পকেট হল, পকেটমারকে ধরতে গিয়ে সাধারণের হাতে মার খেল সে-ই। পকেটমার নিজেকে সাধু সাজিয়ে চোখের সামনে দিয়ে সোজা চলে গেল। আর দর্শক মানুষেরা নিরপরাধ ছেলেটির উপর হাতের সুখ সেরে নিল। যেমনি নিল ইস্টার্ন বাইপাসের মুখে। উল্টোডাঙার দিক থেকে লরিটা সবে ঢুকছে, আচমকা একজন উঠতি ছেলের সাইকেল এসে ধাক্কা খেল লরির সাথে। আঘাত লাগল সামান্যই। কিন্তু ততক্ষণে ছেলেটির অনেক মস্তান বন্ধু জুটে গেছে সেখানে। লরি ড্রাইভার যতই বলে যে, তার দোষ ছিল না। মোটেই, ততই হম্বিতম্বি বাড়ল। লরির ড্রাইভারকে টেনে নামায় রাস্তায়। লোকটির করুণ অনুনয় বিনয়েও কেউ পাত্তা দেয় না। শুধু যে যেমনটি পারে হাতের সুখ মিটিয়ে নেয়। নিরীহ ড্রাইভারটি ব্যথায় যন্ত্রণায় চিৎকার করে, ছেলেরা হাত তালি দিয়ে পৈশাচিক উল্লাসে হাসতে থাকে। জান্তব অট্টহাসিতে কাঁপিয়ে দেয় চারদিক। এ যে দারুণ মজা!

ব্রাউন সুগার, নেশাদ্রব্যের অধীশ্বর।
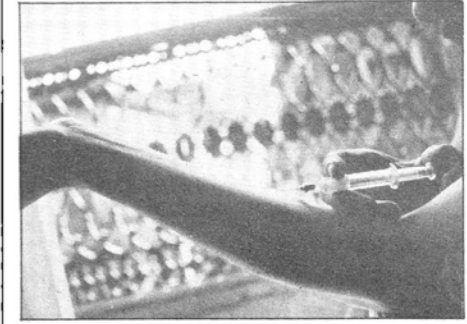
নেশার এও এক প্রচলিত পদ্ধতি।

ড্রাগের বিরুদ্ধে হোর্ডিং। তবু বাড়ছে ছাত্রদের নেশার প্রবণতা।

এ কলকাতা কি সেই কলকাতা, যে ছিল সারা ভারতের রাজধানী, ভারতীয় সংস্কৃতির প্রাণকেন্দ্র? আর আজ রগরগে 'সেমি ব্লু' ছাড়া মহানগরীর প্রেক্ষাগৃহ ফাঁকা পড়ে থাকে। লুকিয়ে লুকিয়ে ব্লু-ছবি দেখা তো আছেই। তার উপর আবার খবরের কাগজে আকর্ষণীয় বিজ্ঞাপন।

দিস
নিউইয়ার ইভ
উই ইনভাইট ইউ টু এ রাইওট

এ রাইওট অব ফান, এক্সাইটমেন্ট, ক্যাবারেট্স, ম্যাজিক ট্রিটস, সারপ্রাইজ গিফট, ম্যাগনিফিসিয়েন্ট ফুড এ্যাণ্ড এ গর্জাস নিউ ইয়ার ডিকর–অল ফর রুপিজ টু হানড্রেড্ (২০০) ওনলি, পার পারসন এট আওয়ার ব্যালে হল। গেট দোজ টিকেট্স কাস্ট, অর এল্স....

কাগজের বিরাট অংশ জুড়ে সেই বিজ্ঞাপন দেখে কলকাতার মানুষ ছুটে যায় নিশিবাসরে। ক্যাবারে স্ট্রিপটিজ দেখতে দেখতে তারা বীভৎস বিকৃত উল্লাসে ফেটে পড়ে। আর এই উন্মাদনাকে দেখে মনে পড়ে ঋত্বিক ঘটকের 'সুবর্ণরেখা'র নায়কের সেই কথা–'কইলকাতায় বড় মজা। বীভৎস মজা....।' ছবি: পার্থসারথি

আলফা আসামে বাঙালি হত্যার নয়া সংস্থা, নেপথ্যে কে ?

বিদেশী বাছাই-এর পরম্পরা এখন আর সংখ্যালঘু উৎপীড়নে সীমাবদ্ধ নেই। অসমীয়া উগ্র জাতীয়তাবাদ এখন চরমপন্থায় হাঁটতে তৈরি করেছে 'আলফা'। সংখ্যালঘু নেতা কালীপদ সেনকে হত্যা করা হল কেন ? হত্যাকারী আলফার পশ্চাদপট কি ? কেন এই আলফার আবির্ভাব ? আসামের শাসক অগপ দলের অন্তর্কোন্দলের কোন ছায়া কি আলফাতে পড়েছে ? আলফার ভবিষ্যৎ কি ? কিসের তাগিদে আলফা বাঙালি হত্যায় মেতে উঠল ? আসাম রাজনীতির এক গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়ের দিকে রমাপ্রসাদ ঘোষালের সরজমিন আলোকপাত।

দরং জেলার পানিখাইতি গ্রামের মৌলবী রিয়াজ-উদ্দিন আহমেদ, তাঁর দুই ছেলে ইয়াসিন আলি ও সৈফুল ইসলাম, নাপ্তিপাড়া গ্রামের কেরামত আলিকে গত ১৯ আগস্ট উদলগুড় থানার রোওয়া ফাঁড়িতে পুলিশ ডেকে পাঠায় সেখান থেকে তাঁদের নিয়ে যাওয়া হয় দরং জেলার সদর মঙ্গলদইয়ে। সেখানে দরংয়ের এস পি তাদের নির্দেশ দেন গোলকগঞ্জ সীমান্ত দিয়ে বাংলাদেশে চলে যেতে

রিয়াজউদ্দিন আহমেদরা সকলে তখন নাগরিক ৪৬৪/৮৬ আইন অনুযায়ী ১৯৮৬ সালের ১২ আগস্ট গুয়াহাটি হাইকোর্ট তাঁদের যে আসামে থাকার অধিকার দিয়েছেন—তার কাগজপত্র দেখান। অভিযোগ পাওয়া গেছে, এস পি সাহেব তাতে প্রচণ্ড ক্রুদ্ধ হয়ে যান; বলেন, হাইকোর্টের ওসব কাগজে কিছু যায় আসে না। এরপর কয়েকদিন হাজতে আটক রাখার পর রিয়াজউদ্দিন আহমেদ-দের সকলকে গোলকগঞ্জ সীমান্তে নিয়ে যাওয়া হয় গত ২১ আগস্ট সেখানে রিয়াজউদ্দিনরা দেখেন ভাকতপাড়ার মহম্মদ মাকুম আলি, তার স্ত্রী ও দুই কন্যাকেও সেখানে আনা হয়েছে গোসাইগাঁওয়ের প্রদীপ পাল, প্রকাশ পাল ও তাঁদের মা-ও রয়েছেন।

সীমান্তে নিয়ে যাওয়ার পর নথিপত্র দেখে বি এস এফ জওয়ানরা তাঁদের বাংলাদেশে পাঠাতে রাজি হন না অভিযোগ, এরপর সীমান্ত পুলিশের সাব-ইন্সপেক্টর অক্ষয় ভট্টাচার্য ও অন্যান্য পুলিশ কর্মীরা তাঁদের নথিপত্র কেড়ে নেন, প্রহার করতে করতে তাদের নিয়ে যাওয়া হয় গোলকগঞ্জের অদূরে সোনাহাট সীমান্তে। এখান থেকে রাতের অন্ধকারে তাঁদের বাংলাদেশে চালান করে দেওয়া হয়
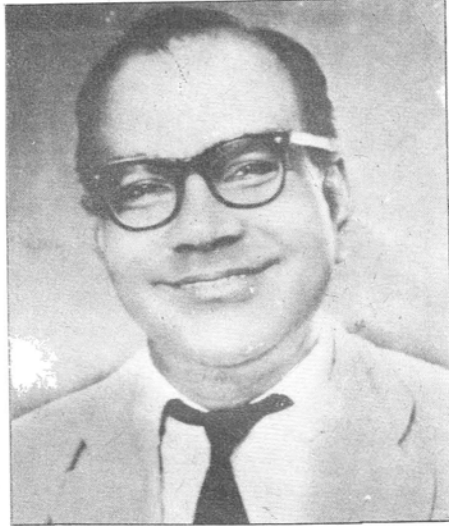
অসমীয়া উগ্রপন্থার শিকার ইউ এম এফ নেতা কালীপদ সেন

শুধুমাত্র বিদেশী বাছাই ও বিতাড়নের মধ্যেই অ-অসমীয়াদের বিরুদ্ধে আসামের উগ্র জাতিয়তাবাদের আক্রমণ এখন আর সীমাবদ্ধ নেই তা এখন হত্যাকাণ্ড পর্যন্ত গড়িয়েছে আরও আশ্চর্যের বিষয় কয়েকটি উগ্রপন্থী সংস্থা এইসব সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের শীর্ষ-মানুষদের হত্যাকাণ্ডের দায়দায়িত্ব প্রকাশ্যে কাঁধ পেতে নিয়ে গর্ববোধ করছে। আর সেইসব উগ্রপন্থী সংস্থার সদস্যদের বাঁচাচ্ছেন রাজ্য সরকার। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী ভৃগু ফুকন দায়িত্ব নেবার শুরুর দিকে এইসব দেদার ক্ষমা-প্রদর্শনের ঘটনা ঘটেছে বেশি। এই ধাঁচের চরম-পন্থী সংস্থা 'আলফা' এখন বাঙালি সমেত তাবৎ সংখ্যালঘুদের ভীতির কারণ হয়ে উঠেছে।

আসামে হিতেশ্বর শইকিয়ার নেতৃত্বাধীন কংগ্রেস সরকার থাকার সময়ই গুয়াহাটির শিলপুখুরী অঞ্চলে একটি চাঞ্চল্যকর ব্যাংক ডাকাতি হয়। এবং ব্যাংকের ম্যানেজার ডাকাতদের হাতে নিহত হন। কিন্তু পুলিশের তৎপরতার ফলে চারজন ডাকাত প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই ধরা পড়ে। এর জন্য রাজ্য পুলিশের হীরালাল দে-কে পুরস্কার পর্যন্ত দেওয়া হয়। ধরা পড়া সব উগ্রপন্থীই ছিল আসাম লিবারেশন ফ্রন্ট বা 'আলফা'র সদস্য কিন্তু অসম গণ পরিষদ ক্ষমতায় আসার পরই স্বরাষ্ট্র-মন্ত্রী ভৃগু ফুকনের নির্দেশে ব্যাংক ডাকাতির অভিযোগে ধৃত আলফা সদস্যদের বিনা শর্তে মুক্তি দেওয়া হল। তখন থেকে ফুকন-বিরোধী শিবিরে রটনা প্রচার শুরু হল যে, আলফার পেছনে নাকি ভৃগু ফুকনের সমর্থকরা আছে। ঘটনা এরকম একটি নয়। আরও আছে।

আসাম সরকার উর্ধতন আই এ এস অফিসার

পরলোকগত কালীপদ সেনের স্ত্রী ও পুত্র

গুয়াহাটি বিশ্ববিদ্যালয়ের সামনে আসুর নেতারা, মাঝে আসু সাধারণ সম্পাদক বিভূতি বরগোহাঞি

ই এস পার্থসারথির খুনের মামলাটি প্রত্যাহার করার জন্য কেন্দ্রের কাছে বারবার দরবার করছেন। এই আই এ এস খুনের ব্যাপারে আসামের স্বাস্থ্যমন্ত্রী অভিজিৎ শর্মা জড়িত বলে অভিযোগ ছিল।

বিশ্বস্ত সূত্রের খবর মোতাবেক আসামের সি আই ডি ব্রাঞ্চ এই ব্যাপারে সি বি আই-কে মামলাটি প্রত্যাহারের জন্য এক গোপন চিঠি লেখে এবং তখন কেন্দ্রের স্বরাষ্ট্র দফতরের কাছে জানতে চায় যে, ১৯৮১ সালের এই মামলা আসামের চুক্তির বলে প্রত্যাহার করা যায় কিনা?

পার্থসারথি ছিলেন আপার আসাম ডিভিশনের কমিশনার। পোস্টিং ছিল হেডকোয়ার্টার জোড়হাটে। তাঁকে ৬ এপ্রিল ১৯৮১ তারিখে তার অফিসের চেয়ারের নিচে বোমা রেখে খুন করা হয়। এই খুনের ব্যাপারে সি বি আই তদন্তে নামে এবং জোড়হাট থানায় ৪টি স্বতন্ত্র চার্জশীট দাখিল করে ১৯৮২-র ৩ নভেম্বর তারিখে। বর্তমান অসম গণ পরিষদ নেতা ও রাজ্য মন্ত্রী অভিজিৎ শর্মা, বর্তমান রাজ্য বিধায়ক প্রদীপ হাজারিকা সহ ৮ জনের বিরুদ্ধে সি বি আই পার্থসারথি হত্যাকাণ্ডে জড়িত থাকার অভিযোগে রিপোর্ট পেশ করে।

অনুরোধ পাবার পর কেন্দ্রিয় স্বরাষ্ট্র দপ্তর আসামের সি আই ডি ব্রাঞ্চ কে সাফসাফ জানায় এই মামলা কোনমতেই প্রত্যাহার করা সম্ভব নয়। কারণ এটি মানবিকতার প্রতি জঘন্যতম অপরাধ। এবং এটি আসাম চুক্তির আওতায় পড়ে না।

আসাম চুক্তির ১৪ (ডি)-র ভাষ্য অনুযায়ী কেন্দ্র ও আসাম সরকার উভয়েই যৌথভাবে কোন ব্যক্তির আটক রাখার বিষয়টি বিবেচনা করবেন। যেমন আসাম আন্দোলনে ধৃত কোন ব্যক্তির অপরাধ। তবে মানবিকতার 'জঘন্যতম' অপরাধ সংক্রান্ত বিষয়টি এর আওতাভুক্ত নয়।

সি বি আই ব্যাপারটি সরাসরি কেন্দ্রিয় স্বরাষ্ট্র দপ্তরকে জানায়। এবং বলে, ওই হত্যাকাণ্ডটি যে 'জঘন্যতম অপরাধ' সে ব্যাপারে কোনও সন্দেহ নেই। নিয়মানুযায়ী, এই মামলা প্রত্যাহার-যোগ্য নয়। সি বি আই আরও জানায় ওই হত্যাকাণ্ডটি সুপরিকল্পিত এবং আসাম আন্দোলনের সঙ্গে এর কোন যোগাযোগ নেই।

স্বাস্থ্য দপ্তরের মন্ত্রী অভিজিৎ শর্মা এবং সেই সঙ্গে আরও ৫ জনের বিরুদ্ধে চার্জশীট দেওয়া হয়। চার্জশীটে বলা হয়েছে, এই খুন ও খুনের ষড়যন্ত্রে শ্রী শর্মা ও আরও ৫ জন জড়িত। বাকিরা হলেন, আসুর জোড়হাট শাখার সম্পাদক নীরেন শর্মা, গুয়াহাটির বি বি কলেজের অধ্যাপক ডি. ডি. বরকাটকি, প্রাক্তন আই এ এস অফিসার কল্যাণ বরা, আসামের প্রখ্যাত সাহিত্যিক তনয় মুকুল বরুয়া এবং সমীরণ গোস্বামী। এইসব ব্যক্তি ছাড়াও পারভীন শইকিয়া, প্রদীপ হাজারিকাকে ইতিমধ্যে অস্ত্র ও বিস্ফোরক আইনে আটক করা হয়েছে। এরা সকলেই রাজ্যের শাসকদল অসম গণপরিষদের সদস্য কিংবা আলফার সমর্থক

এরা প্রত্যেকেই গ্রেফতার হবার পর জামিনে মুক্তি পেয়ে যান। এখন মামলাটি জোড়হাটের ডিস্ট্রিক্ট সেসন জাজ কোর্টে চলছে।

আশ্চর্যের বিষয়, ২৭ মে যখন শুনানি শুরু হয়, তখন তাদের কেউই আদালতে হাজির হননি। পরবর্তী শুনানির তারিখ ছিল ২৫ জুলাই। সেদিন সেসন ও ডিস্ট্রিক্ট জাজ বদলি হওয়ায় শুনানির কাজ স্থগিত থাকে। পরবর্তী শুনানির দিন ধার্য হয় ৪ সেপ্টেম্বর।

তদন্ত চলাকালীন, সি বি আই-এর সংশ্লিষ্ট অফিসাররা লক্ষ্য করেন যে পার্থসারথির চেয়ারের রেক্সিনের নিচে ব্যাটারি চালিত বোমা রাখা হয়েছিল। তিনি যখন চেয়ারে বসেন, তখন চক্রান্ত মোতাবেক ওজনের চাপে ভয়ানক বিস্ফোরণ ঘটে। গোয়েন্দা রিপোর্টে উল্লেখ থাকে অভিযুক্তরা এই পরিকল্পনা সংঘটিত করার জন্য তিন মাস সময় নেয় এবং তারা ছ'মাস আগেই এই ধরনের দুটি বোমা তৈরি করেছিল। তার একটিকে এতদিনে কাজে লাগায়।

আই এ এস অফিসার পার্থসারথি হত্যাকাণ্ডে প্রত্যক্ষভাবে অসম গণ পরিষদের নেতারা জড়িয়ে পড়লেও আসামের অনেক রাজনৈতিক হত্যাকাণ্ডের কোন নূন্যতম কিনারাও হয়নি। তায় এখন আসামের রাজনৈতিক আকাশে এসে জুটেছে গণতন্ত্রের কালরাহু 'আলফা' উগ্রপন্থী সংস্থা। নির্বিচারে মানুষ খুন যাদের একমাত্র কাজ এবং পেশা। আর আসামে এখন রটনা এই সংস্থার পিছনেও নাকি অসম গণ পরিষদের কোন ভারি মাথা জড়িত।

আলফা অর্থাৎ উগ্রপন্থী ইউনাইটেড লিবারেশন ফ্রন্টের প্রথম আবির্ভাব ঘটে আপার আসামের ডিব্রুগড় জেলার পানিখেতিতে। সময় ১৯৮০ সালের এপ্রিল মাস।

আসামের বহু রাজনৈতিক হত্যাকাণ্ডের পেছনে যে এদের হাত আছে, এ ব্যাপারে সকলেই নিঃসন্দেহ। এদের অস্ত্রের নমুনা কিংবা উদ্ধার হওয়া কার্তুজ দেখে অনুমান করা যায় যে এই দলটি খুবই সুশিক্ষিত এবং আধুনিক। সেইসঙ্গে এদের খুন খারাপি করার ধরনধারণ দেখে পুলিশকেও আঁৎকে উঠতে হয়। এই গোষ্ঠী সম্পর্কে যতদূর খবর পাওয়া যায় গোয়েন্দা রিপোর্ট মাফিক তা হলো এটি একটি বিচ্ছিন্ন গোষ্ঠী, এরা শান্তিপূর্ণ আন্দোলনে বিশ্বাসী নয়। বরং সশস্ত্র লড়াই তাদের মনপসন্দ এবং এ ধরনের খুন খারাপি তারা বেশ কিছুদিন ধরেই করে আসছে। আসামের সর্বাধিক জনপ্রিয় সংখ্যালঘু সংগঠনের শীর্ষ নেতা কালীপদ সেনকে এরাই হত্যা করে।

এখন আসামের রাজনৈতিক আকাশে এসে জুটেছে গণতন্ত্রের কালরাহু 'আলফা' উগ্রপন্থী সংস্থা। নির্বিচারে মানুষ খুন যাদের একমাত্র কাজ এবং পেশা। আর আসামে এখন রটনা এই সংস্থার পিছনেও নাকি অসম গণ পরিষদের কোন ভারি মাথা জড়িত।

মুখ্যমন্ত্রী প্রফুল্ল মহন্ত, সঙ্গে সংগ্রামের সাথী ও সহযোগী স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী ভৃগু ফুকন

১৯৮০ সালের সেপ্টেম্বরে ইউনাইটেড লিবারেশন ফ্রন্টের স্বঘোষিত কমাণ্ডার-ইন-চিফ পরেশ চন্দ্র বরুয়ার নেতৃত্বে ১৫ জন কর্মী বে-আইনি ন্যাশনাল সোসালিস্ট কাউন্সিল অফ নাগাল্যাণ্ড-এর হেডকোয়ার্টার উত্তর বার্মাতে উগ্রপন্থী কার্যকলাপের শিক্ষা নিয়ে আসে গোয়েন্দা দপ্তরের খবর মোতাবেক এই ১৫ জন উগ্রপন্থী সোনারি অঞ্চল দিয়ে গোপনে বার্মা যায় এবং ৯ মাস বাদে অরুণাচলের তিরাপ জেলার মনমাও হয়ে ফিরে আসে। সে সময় নাগাল্যাণ্ডের মন জেলার পাহাড়ি এলাকার টিজিটে তাদের হেডকোয়ার্টার তৈরি করে এই এলাকাটি আবার আসাম সীমান্তের সংলগ্ন

এই সময়ই পরেশ বরুয়া তার দলকে ২ ভাগে ভাগ করেন। তিনি নিজেই আপার আসামের চার্জ নেন, লোয়ার আসামের ভার দেন তাঁর একান্ত অনুগত ও বিশ্বস্ত মোহিকান্ত হাতি বরুয়াকে এদিকে কিন্তু এই আলফা নতুন কর্মী নিয়োগ করতে একরকম ব্যর্থই হয় এসময় মাত্র ১০ জন উগ্রপন্থী ট্রেনিং নেয় তাদের সীমান্তবর্তী হেডকোয়ার্টারে

আলফা রাজনৈতিক খুন শুরু করে ১৯৮২ সালে। ৭.৫৬ মি মি স্টেনগান, ৫টি চাইনিজ রিভলবার ছিল তাদের পুঁজি। ধৃত আলফা সদস্যের স্বীকারোক্তি থেকেই এটা জানা গেছে। উগ্র জাতীয়তাবাদী আলফা বিশ্বাস করে, আসামে অসমীয়ারাই থাকবে। অন্য কেউ নয়

১৯৮৪ সালে আরেকটি উগ্রপন্থী সংস্থা আসাম পিপ্লস লিবারেশন আর্মি, যার নেতা অর্পন বেজবরুয়া, গোটা দরং জেলা এবং শোনিতপুরে ত্রাসের সঞ্চার করে। তবে এদের সঙ্গে অন্য কোনও উগ্রপন্থী দলের যোগাযোগ ছিল না। এ বছর জুলাই-এ এরা বড় রকমের ধাক্কা খায় শোনিতপুর জেলায় পুলিশ হানা দিয়ে বেজবরুয়া সহ অন্য ৬ জন শীর্ষস্থানীয় উগ্রপন্থীকে গ্রেফতার করে। ওই ঝটিকা হানায় পুলিশ ১টি লাইট মেশিনগান, ২টি স্টেনগান, ১টি স্বয়ংক্রিয় রাইফেল উদ্ধার করে।

১৯৮৫ সালের ১০ মে আলফার সশস্ত্র লোকজনেরা শিলপুখুরি শাখার ইউনাইটেড কমার্শিয়াল ব্যাংকের ম্যানেজারকে গুলি করে খুন করে। ম্যানেজারের নাম গিরীশ গোস্বামী। শ্রী গোস্বামীকে খুন করে ৪ লাখ টাকা লুঠ করে। এই নৃশংস খুন ও লুঠের পরে পুলিশ মহিকান্ত হাতি বরুয়া সমেত ৫ জনকে গ্রেফতার করে। হাতি বরুয়াকে জিজ্ঞাসাবাদ করার ফলে পুলিশের হাতে বেশ কিছু চাঞ্চল্যকর তথ্য এসে যায়। কিন্তু আসাম চুক্তি এবং পরবর্তী সময়ে আসামের নির্বাচনের পর কোন এক অজ্ঞাত কারণে এসব চাপা পড়ে যায় সংস্থাও সাময়িক ভাবে হিংসাত্মক কার্যকলাপ বন্ধ করে।

কিন্তু এই নীরবতা বেশিদিন রইল না। নির্বাচনে জেতার পর আসাম গণ পরিষদ সরকার ঘোষণা করলেন যে, আসাম আন্দোলনের সময় যে সমস্ত রাজনৈতিক বন্দী আটক হয়েছিল, তাদের নিঃশর্ত মুক্তি দেওয়া হবে। ওইসব রাজনৈতিক বন্দীদের মধ্যে ৫ জন উগ্রপন্থীও ছিল। রাজনৈতিক বন্দীদের মুক্তির সঙ্গে সঙ্গে এদেরও শর্তহীনভাবে মুক্তি দেওয়া হয়। শ্লোগান, পোস্টারে ফের ছেয়ে যায় চারদিক। বহু তরুণ এসে যোগ দেয় আলফা-তে।

আরেকটি সংস্থা অল্প কিছুদিন যাবৎ মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছে। এই সংস্থাটির নাম রেড আরমি ফর রেভেল্যুশন ইন আসাম (রারা)। এরা আলফার খুবই ঘনিষ্ঠ। এরা মুখ্যমন্ত্রী প্রফুল্ল মহন্ত এবং স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী ভৃগু ফুকনকে আলাদা আলাদা করে ২টি চিঠিতে 'অসমীয়াদের স্বার্থ বিক্রি করে নিজেদের স্বার্থ সিদ্ধির জন্য' ভৎসনা করে। চিঠি দুটিতে হুমকির ভাষা ছিল। তবে পুলিশ এবং ইন্টেলিজেন্স সূত্র জানিয়েছে তারা 'রারা' সম্পর্কে আদৌ কিছু জানে না।

অগপ সরকারের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী ভৃগু ফুকন আলফাকে ভাড়াটে বা অতি সাধারণ খুনীর দল বলে আখ্যা দিয়েছেন। কিন্তু রাজ্যরাজনীতির ওয়াকিবহাল মহল এই খুনীর দলকে উগ্রপন্থী রাজনৈতিক সংস্থা বলে বর্ণনা করে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বলেছিলেন এদের এই আগাছার মত বৃদ্ধি অচিরেই শেষ হয়ে যাবে কিন্তু এদের বিরুদ্ধে পুলিশী তৎপরতা বলতে একমাত্র রাজ্য মন্ত্রীদের রক্ষা করার জোরদার ব্যবস্থাগ্রহণ ছাড়া বিশেষ কিছুই চোখে পড়ে না বরং সেইসব বর্বর খুনীরা নাকি চাঞ্চল্যকর রাজনৈতিক হত্যাকাণ্ড করে খোদ এম এল এ হোস্টেলে আশ্রয় নেয়। সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের বিশিষ্ট নেতাদেরকে এরা যত্রতত্র হত্যার হুমকি দেয়। পুলিশের আশ্চর্য ভূমিকা খোদ গুয়াহাটিতে ঘটে যাওয়া চমকপ্রদ ঘটনাটির দিকে লক্ষ্য করলেই বোঝা যাবে।

ইউনাইটেড মাইনোরিটিস ফ্রন্টের সভাপতি কালীপদ সেন হত্যাকাণ্ডের দু'সপ্তাহ কেটে যাওয়ার পরও গুয়াহাটি পুলিশ কাউকে গ্রেফতার করতে পারে নি। শ্রী সেন ১৭ সেপ্টেম্বর তাঁর সোহাগপুরের বাড়িতে উগ্রপন্থীদের গুলিতে নিহত হন। পুলিশের এই আচরণে স্থানীয় মানুষ দাবি তুলেছেন এই হত্যাকাণ্ড তদন্তের ভার সি বি আই-এর হাতে দেওয়া হোক। নাচারে রাজী হওয়ার সুর গাইছেন এখন রাজ্য সরকারও।

শহরের কেন্দ্রস্থলে কালীপদ সেনের হত্যার পর আসামের সংখ্যালঘু সম্প্রদায় আতংকে মূক হয়ে উঠেছেন।

পুলিশের ব্যর্থতা শুধু এই ঘটনায় সীমাবদ্ধ নয়। অন্য ৭টি রাজনৈতিক হত্যাকাণ্ডের হত্যাকারীদেরও গ্রেফতার করতে পুলিশ ব্যর্থ হয়। সেইসঙ্গে দুই কংগ্রেস মন্ত্রীর হত্যাকারীকেও পুলিশ গ্রেফতার করতে সক্ষম হয়নি। তাদের নাম থানেশ্বর দিহিঙ্গা ও ভূমিধর বর্মন। আরও রাজ-

আলফা রাজনৈতিক খুন শুরু করে ১৯৮২ সালে। ৭.৫৬ মি মি স্টেনগান, ৫ টি চাইনিজ রিভলবার ছিল তাদের পুঁজি। ধৃত আলফা সদস্যের স্বীকারোক্তি থেকেই এটা জানা গেছে। উগ্র জাতীয়তাবাদী আলফা বিশ্বাস করে, আসামে অসমীয়ারাই থাকবে। অন্য কেউ নয়।

নৈতিক কর্মী হত্যাকাণ্ডের তালিকায় আছে, দেবজ্যোতি চৌধুরী ও মনোতোষ ধর। কর্মসূত্রে তারা পূর প্রশাসনে যুক্ত ছিলেন। প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী হিতেশ্বর শইকিয়ার দুই মহিলা আত্মীয়ার হত্যাকাণ্ডের অপরাধীদের ধরা আজও সম্ভবপর হয়নি। সেই সঙ্গে ডিব্রুগড় বিশ্ববিদ্যালয়ের জনপ্রিয় ছাত্রনেতা সৌরভ বরার হত্যাকারীর হদিশ আজও অন্ধকারের অতলে।

কালীপদবাবু শুধু ইউ এম এফ-এর নেতা ছিলেন না, তিনি নাগরিক অধিকার সুরক্ষা সমিতিরও সভাপতি ছিলেন। খুন হবার আগে তিনি বহুবার প্রাণনাশের হুমকি পেয়েছিলেন। ওইসব হুমকি তিনি আদৌ গায়ে মাখেন নি। তবে পুলিশের কর্ণগোচর করা হয়েছিল সবই।

শিক্ষাবিদ, আইনজীবী, সমাজকর্মী এবং রাজনৈতিক নেতা কালীপদ সেনের জন্ম ১৯১৯ সালে, গোয়ালপাড়ার সুপরিচিত আইনজীবী কামাখ্যাচরণ সেনের পরিবারে। গোয়ালপাড়ার সরকারি বিদ্যালয় থেকে ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে প্রথমে কটন কলেজ, তারপর কলকাতার স্কটিশ চার্চ কলেজে পড়াশুনো। শেষে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে স্নাতকোত্তর ডিগ্রী লাভ করেন। বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ার সময়ই তিনি আর সি পি আই দলের সঙ্গে যুক্ত হন।

ছেলেবেলা থেকেই কালীপদবাবুর মধ্যে সাংগঠনিক প্রতিভার পরিচয় পাওয়া যায়। স্কুল জীবনে ইউনিয়ন জ্যাককে স্যালুট করার বিরোধিতা করে তিনি জরিমানা দিয়েছিলেন। গোয়ালপাড়া বালক সমিতির তিনি সক্রিয় সদস্য। তাঁর উদ্যোগেই কলকাতায় প্রতিষ্ঠিত হয় গোয়ালপাড়া এ্যাসোসিয়েশন। কলেজ ইউনিয়নের সঙ্গেও তিনি যুক্ত ছিলেন সক্রিয়ভাবে। খেলাধূলাতেও ছিলেন সমান উৎসাহী। কলকাতায় আসাম সম্মিলনীর হয়ে তিনি ফুটবলও খেলেছেন।

প্রথম কর্মজীবনে কালীপদবাবু বিভিন্ন কলেজে অধ্যাপনা করেন। তারপর আইন ব্যবসা শুরু করেন ১৯৫০ সালে গুয়াহাটি হাইকোর্টে। এর কিছুদিন পরই তিনি পি এস পি দলে যোগ দেন এবং ক্রমে হেম বড়ুয়া ও হরেশ্বর গোস্বামীর ঘনিষ্ঠ বন্ধু হয়ে ওঠেন। গুয়াহাটিতে একটি অয়েল রিফাইনারি প্রতিষ্ঠার দাবিতে সত্যাগ্রহ করে ১৯৫৭ সালে তিনি কারারুদ্ধ হন।

কালীপদবাবু সুপ্রীম কোর্টে যোগদানের আমন্ত্রণ পেয়েছিলেন, কিন্তু আসামে থাকাই বেশি পছন্দ করতেন বলে তিনি তাতে যোগ দেন নি। ১৯৭৯ সাল পর্যন্ত তিনি আইন বিষয়ে অধ্যাপনাও করেছিলেন গুয়াহাটির জে বি ল কলেজে। পরে তার উদ্যোগেই প্রতিষ্ঠিত হয় নাগরিক অধিকার সংরক্ষণ কমিটি, যা পরবর্তীকালে ইউনাইটেড মাইনরিটি ফ্রন্ট নামে পরিচিত হয়।

এই নৃশংস হত্যাকাণ্ডের আগেও কালীপদবাবুকে প্রাণনাশের জন্য আক্রমণ করা হয়। সেটা ছিল ১৯৬০ সাল। প্রজা সোসালিস্ট পার্টি সবে ছেড়েছেন তিনি। সে সময়ই দুজন যুবক ছুরি হাতে 'গোহাটি হাউসে' কালীপদবাবুকে আক্রমণ করে। কিন্তু সেদিন তৎপরতার সঙ্গে কালীপদবাবু নিজেকে বাঁচান। দ্বিতীয়বার, ১৯৮১ সালের ডিসেম্বর মাসে যে সময় থেকে আসাম আন্দোলন শুরু হয় সেই সময় তার বাড়িতে বোমা ছুড়ে হত্যার চেষ্টা করে দুষ্কৃতকারীরা।

১৯৮৩ সালের ফেব্রুয়ারি মাসের উত্তাল আসাম। তখন আসু ও গণ সংগ্রাম পরিষদ নির্বাচন বয়কট করেছে। তবু নির্বাচনের ঝড় বইছে চার দিকে। সেই সময় একটি চলন্ত গাড়ির মধ্য থেকে তাকে গুলি ছোড়া হয়। বাঁ হাতে চোট পান তিনি সেবার।

কালীপদবাবুর হত্যাকারীদের টার্গেট ডেট ছিল ১৭ সেপ্টেম্বর। কারণ ওইদিন ছিল বিশ্বকর্মা পূজা। চারদিকে আতসবাজি পুড়ছে। নিজের ঘরে চেয়ারে বসে চিঠি লিখছিলেন তিনি। পাশের ঘরে ছিলেন স্ত্রী আর ছেলে। সন্ধ্যা ৬টা ১৫তে চারজন সশস্ত্র ব্যক্তি তার বাড়ির সামনে হাজির হয়েছিল। ওদের একজন মোটর সাইকেলে বসে থাকে। বাকিরা গেটের আড়ালে লুকিয়ে পড়ে। আর দুজন ৭.৫৬ মি.মি স্টেনগান আর রিভলবার চালায় জানালা দিয়ে। গুলি সরাসরি আঘাত করে কালীপদবাবুকে, তিনি পড়ে যান। তারপরই খুনীরা চম্পট দেয়। গোটা অপারেশন করতে সময় লাগে মাত্র ২ মিনিট। পাশের চায়ের দোকানের কয়েকজন গুলির শব্দ শুনে ছুটে আসে। ততক্ষণে অপরাধীরা উধাও

কালীপদবাবুর স্ত্রী ও ছেলে ব্যাপারটা প্রথমে আঁচ করতে পারেন নি। ভেবেছিলেন পটকা ফাটছে। এর পরেই তাঁরা শ্রী সেনকে রক্তাপ্লুত অবস্থায় পড়ে থাকতে দেখতে পান।

কালীপদ সেনের হত্যার পর গোটা সুহাগপুরের প্রবেশ পথগুলি সীল করে দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু হত্যাকারীদের পুলিশ কোনভাবেই ধরতে পারে নি। কেন পারেনি—এটাই প্রশ্নবোধক।

এছাড়া কালীপদ সেন হত্যাকাণ্ডের সময় ও অবস্থান দেখে ওয়াকিবহাল মহলের মনে আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন উঠেছে। যা আমাদের ভবিষ্যত রাজনৈতিক গতিপথ সম্পর্কে এবং ভারতীয়তা বোধের নসীব সম্পর্কে দুশ্চিন্তার জন্ম দেয়। বিশিষ্ট জননেতা ও সংযুক্ত সংখ্যালঘু মোর্চার সভাপতি কালীপদ সেনকে যে সন্ধ্যায় তাঁর বাড়িতে আততায়ীরা গুলি করে হত্যা করে, সে সন্ধ্যায় ওই বাড়িতেই একটি গুরুত্বপূর্ণ বৈঠক হওয়ার কথা। তাদের আক্রমণের লক্ষ্য কি শুধু কালীপদবাব-ই ছিলেন? নাকি আততায়ীরা সংযুক্ত সংখ্যালঘু মোর্চার সব শীর্ষস্থানীয় নেতাকেই একসাথে হত্যা করতে চেয়েছিল?

এই গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নটির পেছনে উপযুক্ত যুক্তিও রয়েছে। যেদিন সন্ধ্যা সাড়ে ৬ টা নাগাদ কালীপদ সেন তাঁর নিজের বাড়িতে আততায়ীর গুলিতে নিহত হন, সেদিন ঠিক ঐ সময়ই কালীপদবাবুর বাড়িতে হওয়ার কথা ছিল সংযুক্ত সংখ্যালঘু মোর্চার এক বৈঠক। ঐ বৈঠকে সারা রাজ্যে মোর্চার বিশিষ্ট সব নেতাদের উপস্থিত থাকার কথা ছিল। কিন্তু মোর্চার জনৈক বিশিষ্ট নেতা নামাজ পড়তে গিয়ে বেশি দেরি করে ফেরার জন্য শেষ পর্যন্ত বৈঠকটি বাতিল করে দেওয়া হয়। এবং অন্যান্য নেতারা ফিরে যান। এক্ষেত্রে অনুমান করা যায়, আততায়ীরা সম্ভবত ঐ বৈঠকটি হবে জেনে, সংখ্যালঘু মোর্চার সব শীর্ষস্থানীয় নেতাকে একসাথে হত্যা করার উদ্দেশ্যেই হানা দিয়েছিল।

হত্যা পরবর্তী পর্যায়ের খবরাখবর আরও চাঞ্চল্যকর। হত্যাকারীদের আশ্রয়দান সম্পর্কে এক অভূতপূর্ব রিপোর্ট রয়েছে গোয়েন্দা বিভাগের হাতে। গত ১৭ সেপ্টেম্বর সংযুক্ত সংখ্যালঘু মোর্চার সভাপতি কালীপদ সেনকে গুলি করে নৃশংসভাবে হত্যা করবার পর তিন আততায়ীর মধ্যে দুজন সেদিন দিসপুরের এম এল এ হোস্টেলে নিশি-যাপন করেছে বলে কেন্দ্রিয় গোয়েন্দা বিভাগ (এস আই বি) সূত্রে জানা গেছে। সেদিন ওখানে রাত
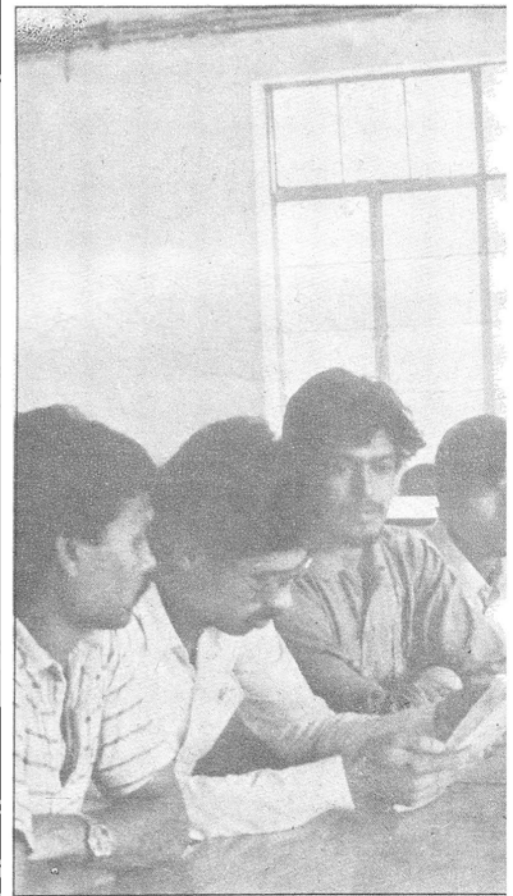
আসুর প্রতিশ্রুতি—কতটা পালিত হচ্ছে?

কাটিয়ে এই দুই আততায়ী ধীরে সুস্থে আত্মগোপন করবার পর রাজ্য গোয়েন্দা বিভাগের তৎপরতা বৃদ্ধি পেয়েছে। এই দুই জনকে আলফার (ইউনাইটেড লিবারেশন ফ্রন্ট অফ আসাম) সক্রিয় সদস্য বলে গোয়েন্দা বিভাগ চিহ্নিত করেছেন। একজন তেজপুরের এবং অপরজন ডিব্রুগড়ের আলফা সদস্য বলেও জানানো হয়েছে। তৃতীয় আততায়ীর কোন রকম হদিস এখনও মেলে নি।

এম এল এ হোস্টেলের কত নম্বর বাড়িতে আততায়ীরা সেদিন রাত কাটিয়েছিল তা অনুসন্ধানের স্বার্থেই গোয়েন্দা বিভাগ জানাতে রাজি হন নি তবে কালীপদ সেন হত্যা যে 'রাজনৈতিক হত্যা' সে বিষয়ে গোয়েন্দা বিভাগের দ্বিমত নেই।

সেন-হত্যার সঙ্গে জড়িত এই দুই আততায়ীর সন্ধান মিলতে খুব বেশি সময় লাগবে না বলেও জানা গেছে। অবশ্য যদি রাজ্য স্বরাষ্ট্র দপ্তর তৎপর হয়।

ওদিকে আলফার কমাণ্ডার-ইন-চিফ সম্প্রতি এক প্রেস বিবৃতি যোগে জানিয়েছেন যে, কালীপদ সেনকে আলফার সদস্যরাই হত্যা করেছেন। স্থানীয় একটি দৈনিক পত্রিকায় প্রকাশিত আলফার বিবৃতিতে বলা হয়েছে অসমীয়া জনগণের বিরুদ্ধে কালীপদ সেনের ষড়যন্ত্রমূলক কার্যকলাপের জন্যই তাঁকে খতম করার উদ্দেশ্যে এ্যাকশন প্রোগ্রাম নেওয়া হয়েছিল। কালীপদ সেনের মত মানুষদের আসাম ভূমিতে বেঁচে থাকবার কোনই অধিকার থাকতে পারে না।
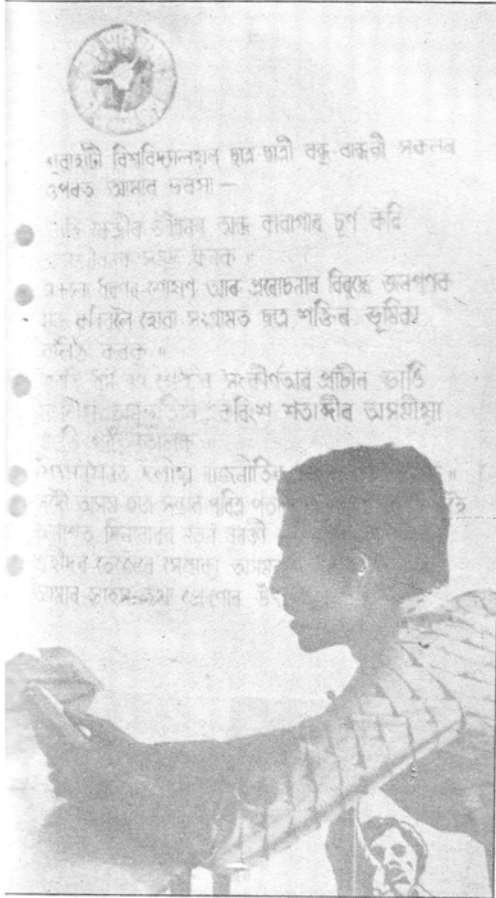
তথাকথিত অসমীয়া জাতিসত্তার বিকাশের কাজে নিয়োজিত আলফা বৃহত্তর জাতীয় স্বার্থের খাতিরে কালীপদ সেনের হৃদ-স্পন্দন চিরতরে স্তব্ধ করে দিতে সিদ্ধান্ত নিয়েছিল। কেননা কালীপদ সেন অসমীয়া জাতিকে ধ্বংসের পথে ঠেলে দিতে ষড়যন্ত্রমূলক কাজের সঙ্গে লিপ্ত ছিলেন বলেও প্রকাশিত বিবৃতিতে জানানো হয়েছে।

আলফা-র সদস্য সংখ্যা খুব বেশি নয়। দেড়শ কি তার চেয়েও কম হবে। তাদের মধ্যে অনেকেই বৈরী নাগাদের কাছ থেকে প্রশিক্ষণ নিয়েছে। উত্তর পূর্বাঞ্চলের উপজাতীয় উগ্রপন্থীদের সঙ্গে তাদের ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ রয়েছে। চোরাপথ দিয়ে একাধিকবার চীনে গিয়েছে এমন লোকের সংখ্যাও তাদের মধ্যে কম নয়। একথা সত্যি যে মাত্র একশ কি দেড়শ বিদ্রোহীর পক্ষে আসামের মত জায়গায় বড় রকমের হাঙ্গামা বাধান কখনই সম্ভব নয়। উত্তর পূর্বাঞ্চলের পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে তাদের কাজ আরও কঠিন, বলতে গেলে দুঃসাধ্যই হয়ে পড়েছে। কিন্তু তবুও তাদের কাছ থেকে অগপ সরকারের ভয় পাওয়ার অনেক কারণ আছে। আন্দোলনকারীরা ক্ষমতায় আসার পরও যে একটি ক্ষুদ্র উগ্রপন্থী সংগঠন সদর্পে নিজের অস্তিত্ব ঘোষণা করে চলেছে এবং সাধারণ মানুষের মনোযোগও কিছুটা আকর্ষণ করতে পেরেছে, তা থেকেই প্রমাণ হয় যে আসাম চুক্তি সম্পাদন করার কিংবা আন্দোলনকারীরা ক্ষমতায় আসার সঙ্গে সঙ্গেই আসামের সব সমস্যার সমাধান হয়নি। এটাই হল অগপ সরকারের ভয়ের সবচেয়ে বড় কারণ। অগপ সরকারের ব্যর্থতা যতই বাড়বে, ততই বাড়বে আলফার-র মত উগ্রপন্থী সংগঠনগুলির আকর্ষণ। ইতিমধ্যেই অ গ প সরকারের শক্তি স্তম্ভস্বরূপ আসু-র প্রভাব এতখানি কমে গিয়েছে যে গত ১৪ জুলাই শিবসাগরে অনুষ্ঠিত আসু-র বার্ষিক সাধারণ অধিবেশনে মাত্র দুশ লোকের সমাগম হয়েছিল। অথচ এই সেদিন পর্যন্ত আসু-র ডাকে সাড়া দিয়েছিল লক্ষ লক্ষ মানুষ। অ গ প সরকারের চোখে আলফা মস্ত বড় ভয়ের কারণ হয়ে ওঠার আর একটা প্রধান কারণ হল এই আলফা যেভাবে আসাম চুক্তি এবং অ গ প সরকারের অন্তঃসারশূন্যতা প্রমাণ করে দেখিয়ে সাধারণ মানুষের মোহভঙ্গ ঘটাতে পারবে, অন্য কোন রাজনৈতিক দলই তা পারবে না। ব্রহ্মপুত্র উপত্যকার আন্দোলনপন্থী অসমীয়ারা অন্য কোন দলের সমালোচনায় সেভাবে কান দেবে না—যেভাবে তারা কান দেবে আলফা-র মত উগ্র জাতীয়তাবাদী এবং বিচ্ছিন্নতাবাদী সংগঠনের সমালোচনায়।

এসব ছাড়াও অন্য কয়েকটি দিক থেকেও আলফা অ গ প সরকারের বিপদ ঘটাতে পারে—যার মধ্যে দুটি বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য। মাত্র একশ কি দেড়শ সশস্ত্র উগ্রপন্থীর পক্ষে সরকারকে উৎখাত করা হয়ত সম্ভব হবে না। কিন্তু খুন-রাহাজানি এবং সরকারি সম্পত্তির উপর আক্রমণ প্রভৃতি ঘটনার দ্বারা ব্যাপক অশান্তি সৃষ্টি করে তারা এমন একটা আইন শৃংখলার সমস্যা সৃষ্টি করতে পারে যে সেই পরিস্থিতির সুযোগ নিয়ে কেন্দ্রিয় সরকার অ গ প সরকারকে বরখাস্ত করতে পারবে। অতি কম সময়ের মধ্যেই যেভাবে আলফা-র দর্পিত আত্মপ্রকাশ ঘটেছে, তার মধ্যেই এমন একটা সম্ভাবনার সুস্পষ্ট ইঙ্গিত নিহিত আছে। তা ছাড়া আলফার মত একটি গুপ্ত সংগঠনের নামে যে কোন রাজনৈতিক দল কিংবা যে কোন সরকারি সংস্থারও এসব কাজ করাতে বাধা কোথায়? আর যদি মুখ্যমন্ত্রী পদের দাবিদার অগপর কোন উঁচুদরের নেতার সঙ্গে আলফার যোগাযোগ থাকে তাহলে ভবিষ্যৎ রাজনীতির দাবা খেলার কথা ভাবলে আশ্চর্য হবার কিছুই থাকে না।

দ্বিতীয়ত, একাংশ অসমীয়া আঞ্চলিকতাবাদের আদর্শের দ্বারা এমনভাবে আকৃষ্ট হয়েছে যে তারা সহজে আর কোন সর্বভারতীয় দলকে সমর্থন করতে প্রস্তুত নয়। কিন্তু অগপ যেভাবে জনপ্রিয়তা হারাতে শুরু করেছে তাতে এই দলের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে অনেকেই সন্দিহান হয়ে পড়েছে। যে সংগঠনটির উপর অগপ সরকার বিশেষভাবে নির্ভরশীল, সেই আসু-র ইদানীং কি হাল হয়েছে সেকথা উপরেই বলা হয়েছে। দ্রুত গতিতে জনপ্রিয়তা হারিয়ে আসু এখন এমন আতংকিত হয়ে পড়েছে যে আসু-র সামান্যতম সমালোচনা প্রকাশ হওয়া কাগজগুলির উপর তারা হামলা করা শুরু করে দিয়েছে। আসুর সম্পর্কে 'ভিত্তিহীন' সংবাদ প্রকাশ করার অভিযোগে মাত্র কয়েকদিন আগে আসুর কিছু সদস্য গুয়াহাটির একটি সাপ্তাহিক পত্রিকার অফিসে গিয়ে সম্পাদককে শাসিয়ে এসেছেন। জোড়হাট থেকে প্রকাশিত একটি দৈনিক পত্রিকার কয়েকশ কপি কিছু যুবক পুড়িয়ে ফেলেছেন, কারণ পত্রিকাটিতে নাকি আসুর পোস্টার-অভিযান ব্যর্থ হয়েছে বলে একটি খবর প্রকাশ হয়েছিল। অথচ এই দুটো পত্রিকাই আসাম আন্দোলনের ঘোরতর সমর্থক বলেই পরিচিত। অন্যদিকে যে দলগুলি নিয়ে অসম গণ পরিষদ গঠিত হয়েছিল, অর্থাৎ যে দলগুলি অ গ প-র মধ্যে নিজের অস্তিত্ব বিলীন করে দিয়েছিলেন, তারাও আবার নিজের পৃথক অস্তিত্ব ও পরিচয় পুনরুদ্ধার করার জন্য তোড়জোড় শুরু করে দিয়েছেন। অসম গণ পরিষদের শরীক পূর্বাঞ্চলীয় লোক পরিষদের মুখ্য আহ্বায়ক বিমলাপ্রসাদ তালুকদার জানিয়েছেন যে, তাঁরা 'কোন অবস্থাতেই আসাম চুক্তি মেনে নেবেন না, এবং যাঁরা পি এল পি-র নীতি আদর্শের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করে ব্যক্তিগত স্বার্থ পূরণের উদ্দেশ্যে অসম গণ, পরিষদে যোগ দিয়েছেন তাঁরা অতিশয় নিন্দনীয় কাজ করেছেন।' আসাম মন্ত্রীসভায় অসম জাতীয়তাবাদী যুব ছাত্র পরিষদের দুজন প্রতিনিধি থাকা সত্ত্বেও দলটি গোড়া থেকেই নিজের পৃথক অস্তিত্ব বজায় রেখেছেন, কিন্তু সম্প্রতি দলের সাংগঠনিক নেতারা সরকারের বিরুদ্ধে আগের চেয়ে চড়া সুরে কথা বলা শুরু করেছেন। এই সমস্ত ঘটনা থেকে ধারণা হয় যে অসম গণ পরিষদের শেষ পরিণতি সাতাত্তরের জনতা পার্টির মত হওয়া অসম্ভব নয়। কোনদিন যদি সেই রকম ঘটনা ঘটে তাহলে তা অগপ-র শূন্যস্থান পূরণের জন্য আসামের রাগী যুবকেরা হয়ত ক্ষমতার স্পর্শ লেগে কলঙ্কিত হওয়া অন্য দলগুলির চেয়ে আলফা-র মত জঙ্গী সংগঠনকেই বেছে নিতে পারে। তখন অগপ-র মধ্যেকার উচ্চাকাঙ্খী নেতা নিজের অ-অসমীয়া বিদ্বেষী ইমেজকে কাজে লাগিয়ে আলফার নেতা হয়ে উঠতে পারবেন। অসম গণ পরিষদের ভেতরকার অবস্থাটি চোখ বোলালে স্পষ্ট হয় যে মন্ত্রীসভায় বিরাজ শর্মার আগমন, ভৃগু ফুকনের হাত থেকে স্বরাষ্ট্র দপ্তরের একাংশ কেড়ে নেওয়া এবং প্রফুল্ল মহান্তর আপোষ মনোভাব অগপ রাজনীতিকে ত্রিশংকু করে তুলেছে। তায় এসে জুটেছে দলের জনপ্রিয়তা হারানোর ঝোঁক। এসময় 'আলফা' একটি প্রয়োজনীয় প্রশ্নবোধক সংস্থা বইকি।

ছবি: সজল মুখার্জি, কল্যাণ চক্রবর্তী

জব চার্ণকের নিষিদ্ধ রমণী

পালঙ্কের মতো নরম শয্যায় শুয়ে অনিন্দ্য সুন্দরী এক নারী। মুখাবয়ব ম্লান। মনে শান্তি নেই। কিছুতেই সংহত করতে পারছেন না মানসিক চাঞ্চল্য। বিস্মিত হয়ে ভাবছিলেন, কি ঘটে গেল তার জীবনে! অভাবনীয়। কিন্তু এর জন্য কি কোন পাপের ভাগী হতে হবে? কে জানে!

ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির কুঠীতেই মহিলার জন্য নির্দিষ্ট এই কক্ষ। কাউন্সিলের সদস্য জব চার্ণক। বেপরোয়া, দু:সাহসী। যদিও ওর এখন খুব সংকটকাল, তবুও এই নারীর স্বাচ্ছন্দ্যের জন্য কোন কার্পণ্য করতে চান নি। পরনের জন্য বহুমূল্য ঢাকাই মসলিন, আতরদানে তেহরানী আতর, হুকুম-তামিলের জন্য খিদমতগার, খানসামা। সেবাযত্নের জন্য দুজন দাসী। রান্নার জন্য নিজস্ব বাবুর্চি। রূপসীর মুখ থেকে কোন কথা মুক্তোর মত ঝরে পড়লেই সেটা পালন করার জন্য শশব্যস্ত হয়ে পড়ে তারা।

চার্ণক আদর করে নাম রেখেছেন মারিয়া। সম্ভ্রান্ত হিন্দু ঘরের বিধবা। স্বামীর সঙ্গে শ্মশানে এসেছিলেন সহমরণে। তখনই ঘটে গেল ঘটনাটা। ভাবছিলেন মারিয়া, ঘটনার সেখানেই শুরু। কিন্তু কবে, কোথায়, কিভাবে শেষ হবে–কেউ জানে না। কিন্তু কেন এমন ঘটল, হে ভগবান! আর জন্মে কি এমন পাপ করেছিলাম আমি!

পাপ ছিল কিনা জানেন না। তবে একটা কথা এখন এই নারী বুঝতে পারেন, সাহেব তার রূপেই মজেছে। শেষকালে গর্বের রূপই তার কাল হল।

দাসী দুজনের একজনের বয়স বেশি। সে ফরমায়েস খাটে। অন্যজন মারিয়ার প্রায় সমবয়সী। দু-এক বছরের বড় হওয়ারই সম্ভাবনা। যে বন্ধুর মত ওর সঙ্গে কথা বলে। ওর মন ফেরানোর চেষ্টা করে।

'আর বেশি ভেবে কি করবি বোন। ভাগ্যের হাতে ছেড়ে দেওয়া ছাড়া মেয়ে লোকের আর কি করার আছে। যা ঘটেছে সেটা মেনে নিলেই মনে শান্তি পাবি।'

মারিয়া সরলাদাসীর এই ধরনের কথাবার্তা বহুবার শুনেছেন। বিরক্ত হয়ে তীর্যক দৃষ্টিতে তাকালেন। সরলাদাসী আবার বলল, 'আমার কথাই দেখ না, স্বামী আমাকে নেয় না...।' তার কথা শেষ হল না। মারিয়া রুক্ষ স্বরে বললেন, 'তুই থামবি!'

তখন দরজায় শব্দ। নড়ে উঠল ভারী রেশমের পর্দা। সরলাদাসী ত্বরিতে বিছানা ছেড়ে উঠে দাঁড়াল। ধীর পদক্ষেপে ঘরে ঢুকলেন একজন বলিষ্ঠ চেহারার ইংরেজ যুবক। রূপকথার নায়কের মতো সুপুরুষ। চোখে গভীর স্বপ্ন, চোয়ালে ইচ্ছাশক্তির দৃঢ়তা। জব চার্ণক তিনি।

চার্ণকের পরনে আটোসাটো প্যান্টুলুন, খাকি সুতীর শার্ট, সুতীর মোজা, ওয়াকিং সু, পশমের ওয়েস্ট কোট। কোটের পকেটে একটা তাজা গোলাপ।

চার্ণক থামলেন। কয়েক মুহূর্ত ভাবলেন।
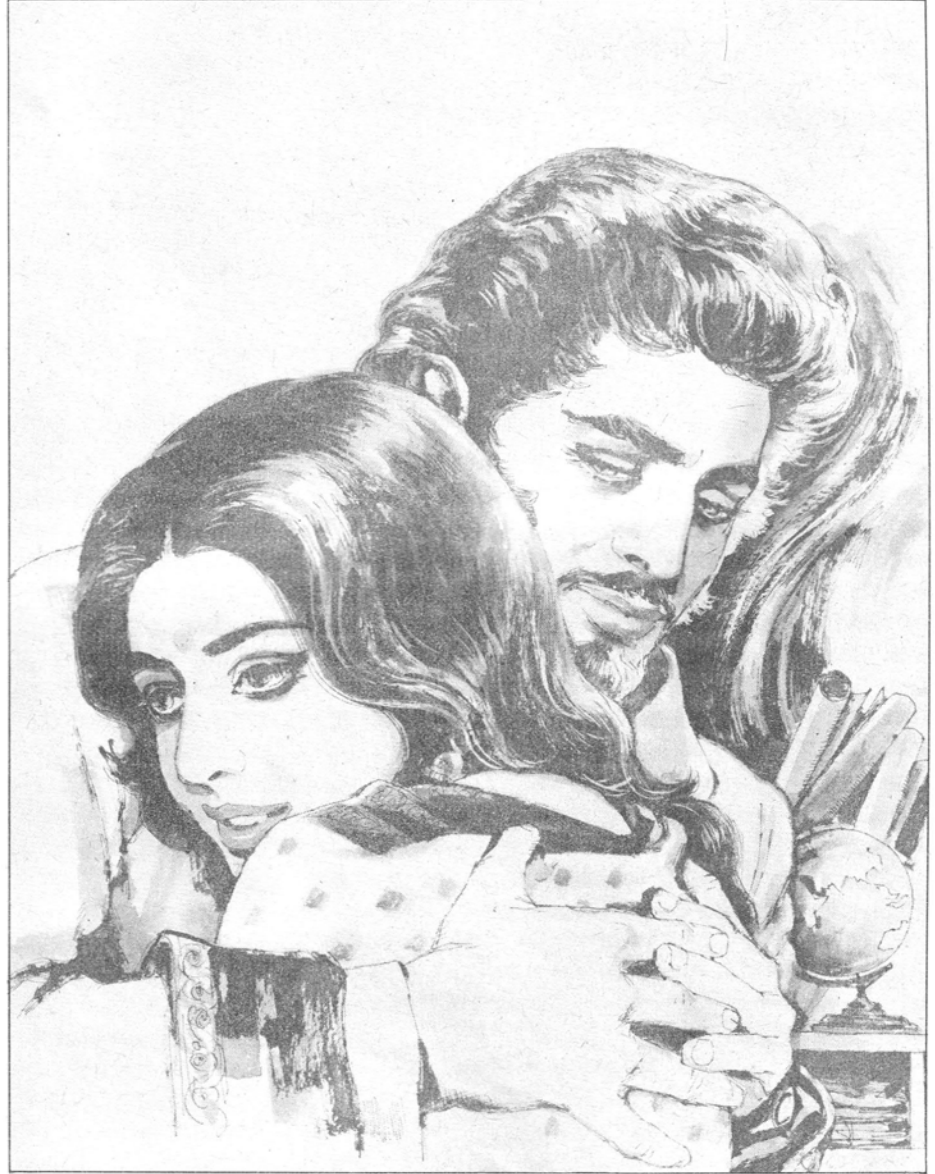
ইতিহাসের ফাঁকফোকর গলে কিছু জীবন, কিছু স্মৃতি উপেক্ষিত হয়ে থেকে যায়। তেমনি অনেক ইতিহাস খ্যাত নায়কের নেপথ্যে এমন কেউ থাকেন, নায়ক তৈরিতে যার ভূমিকা কম নয়। আলোকপাত পুরনো কলকাতার উপেক্ষিত ইতিহাস থেকে এরকমই কিছু কথা মাঝেমধ্যে শোনাবে তার প্রিয় পাঠককে। সুতীর্থ রায়ের কলমে তারই প্রথম পরিচ্ছেদ 'জব চার্ণকের নিষিদ্ধ রমণী।'

ইচ্ছা করলেই তিনি বলপ্রয়োগের আশ্রয় নিতে পারেন। কিন্তু নেবেন না। শত্রুরা তার বাহুবলে ভীত-ত্রস্ত। নবাব শায়েস্তা খাঁ তল্লাশীতে বাংলা-বিহার-উড়িষ্যা কাঁপিয়ে দিয়েও তাঁর কেশাগ্র স্পর্শ করতে পারেন নি। অথচ এই অসহায় বিধবার কাছে তিনি নিজেই খুব অসহায়।

তখন ১৬৫৫ সাল। ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী ভারতের মতো একটা লুটের বাজারকে ঠিকমতো লুণ্ঠনের জন্য ক্রমে হটিয়ে দিচ্ছে সমস্ত প্রতিযোগী বিদেশী ব্যবসায়ীদের। শক্ত করে নিচ্ছে পায়ের নিচের মাটি। কিন্তু সেজন্য নিরন্তর বিভিন্ন বিপদ, অসহযোগিতা ও যুদ্ধবিগ্রহের মুখোমুখি হয়ে পড়তে হচ্ছিল বারবার। এসবের ঠিকমতো মোকাবিলা করার জন্য প্রয়োজন একজন বিচক্ষণ, সাহসী ও বেপরোয়া নেতার। চার্ণক এদেশে পা রাখেন ১৬৫৫-৫৬ সালে। ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি ওঁর মধ্যেই পেয়ে গেল ঐ সমস্ত গুণাবলী। খুব সহজেই চার্ণকের হাতে এসে গেল বিস্তর ক্ষমতা।

বাংলায় এসে চার্ণক হলেন কাশিমবাজার কুঠির জুনিয়র মেম্বার। কাউন্সিলের সদস্য। বেতন মাত্র কুড়ি পাউণ্ড। কিছুদিন পর বদলি হলেন ব্যারাকপুর। এখানেই এই কাহিনীর পট-ভূমিকা। কিন্তু এ নিয়ে ঐতিহাসিকদের মধ্যে বিস্তর মতবিরোধ আছে। কারুর মতে ঘটনাস্থল কাশিমবাজার। আবার কারুর মতে পাটনা।

চার্ণক নিজস্ব লোকজনদের নিয়ে বেড়াতে বেরিয়েছেন। হঠাৎ দেখলেন একটা মিছিল আসছে। ঢাক ঢোল পেটানো হচ্ছে। ড্রাম, টমটম, বাদ্যযন্ত্র বাজানো হচ্ছে। হঠাৎ এত ধুমধাম করে বাজনা বাজিয়ে এরা কোথায় চলেছে! চার্ণক ঘোড়া থামিয়ে তাকিয়ে দেখলেন, সামনের চারজনের কাঁধে একটা মৃতদেহ। তাদের পেছনে একজন যুবতী নারীকে ঘিরে আছে অনেকে। কে তিনি? চমকে উঠলেন চার্ণক। মানবী নয়, স্বর্গের দেবী। কপালে চন্দনের ফোঁটা, সিঁথিতে সিঁদুর, হাতে শাখা। সামনে পিছনে হরিধ্বনি দিতে দিতে এগিয়ে চলেছে শববাহকেরা। অনুগমনকারীর দল।

খোঁজ নিলেন চার্ণক, কোথায় চলেছে এরা? খবর এল স্বামী-সহমরণে চলেছেন ওই নারী। ওই অতুল রূপ-রাশি আর কয়েক মুহূর্ত পরেই এক বৃদ্ধের মৃতদেহের সঙ্গে চিতায় উঠে ভস্মে পরিণত হবে!

চঞ্চল হলেন চার্ণক। মনে মনে ঠিক করে নিলেন, যে ভাবেই হোক থামাতে হবে এই আত্ম-হনন। বাঁচাতে হবে ওই স্বর্গের দেবীকে।

'সতী হবে—সতী হবে' বলে সোরগোল পড়ে গেল। চার্ণক সদলে গেলেন ওদের কাছে। যুক্তি দিয়ে বোঝানোর চেষ্টা করলেন, সতী হয়ে কোন লাভ নেই। যে মৃত তার জন্য প্রাণ দিয়ে কি পুণ্য সঞ্চয় হবে? এ এক ধরনের কুসংস্কার। অমানবিক কাজ। কিন্তু কে শোনে কার কথা। শত বোঝানোতেও কোন কাজ হল না। রমণী সহমরণে যাবেই। ক'জন আর এরকম ভাগ্যবতী হতে পারে? শাস্ত্র-কারেরা নাকি বলেছেন, পতীব্রতা নারীর প্রার্থনা কখনো বিফলে যায় না। সুতরাং সেই নারী যখন সতী হওয়ার ইচ্ছা প্রকাশ করেছেন, তখন কোন

চার্ণক ঘোড়া থামিয়ে তাকিয়ে দেখলেন...

ভাবেই সেটার নড়চড় হবে না। নড়চড় হওয়া নাকি পাপ

সতীদাহ দেখার জন্য ভিড় জমেছে খুব। চিতা সাজানো হল। তোলা হল মৃতদেহ। আকাশ ফাটানো হরিধ্বনিতে কানে তালা লাগার উপক্রম।

স্নান সেরে বিধবা রমণী একটি কাঠের দণ্ডে আগুন ধরিয়ে নিলেন। স্বামীর চিতার চারদিকে ঘুরতে শুরু করলেন। নিজের হাতে সেই আগুন চিতায় ধরিয়ে দিলেন। সমবেত জনতা বীভৎস চীৎকারে কোরাস করে উঠল: জয় মা সতীরাণী! এবং তখনই দেখা গেল, রমণীর মুখের রেখায় ধীরে ধীরে দৃঢ়তার বদলে আতংক ফুটে উঠতে শুরু করেছে। চার্ণক তাকিয়ে দেখলেন তার মুখ ভয়ে সাদা। প্রায় বেতসলতার মত কাঁপছেন তিনি।

হাওয়া লেগে শিখা বিস্তার করে চিতার লেলিহান আগুন যখন ভয়াবহ রূপ ধারণ করল, তখন সেই পতিপ্রাণগতা সতী হাত পা ছুড়ে চিৎকার করতে শুরু করলেন। চেষ্টা করলেন ছিটকে বেরিয়ে যেতে। পালিয়ে যেতে। পাশেই একজন হিন্দু পুলিশ দাঁড়িয়ে ছিল, সতীর ওপর যেন কোন রকম অত্যাচার না হয়, সেটা দেখার জন্য—কিন্তু শেষ পর্যন্ত সে-ই লাঠি তুলে রমণীকে মারতে উদ্যত হল। তখন চার্ণক আর নিজেকে স্থির রাখতে পারলেন না।

শ্মশানে চার্ণকের সঙ্গী সাথী বেশি ছিল না। তবুও তিনি পতঙ্গের মতো রূপমুগ্ধ হয়ে চিতার দিকে তাকিয়ে এগিয়ে গেলেন। যারা সেই রমণীকে জোর করে চিতায় তুলতে যাচ্ছিল, তাদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়লেন। অপ্রস্তুত লোকজন ভয় পেয়ে বাধা দেওয়ার চেষ্টা করল না। চার্ণক মহিলাকে তুলে নিয়ে ঘোড়া ছুটিয়ে দিলেন।

কিন্তু একটু পরেই বিস্মিত হয়ে দেখলেন, মহিলা ক্রমাগত চেষ্টা করছেন ঘোড়া থেকে নেমে যেতে। বারবার চিৎকার করে বলছেন, 'আমাকে নামিয়ে দাও। আমাকে ছেড়ে দাও। কোথায় নিয়ে যাচ্ছ আমাকে? আমি সতী হতে চাই। আমায় কলংকিতা কর না।'

দরজা ঠেলে ঘরে ঢুকে ক' মুহূর্ত নিরীক্ষণ করলেন মারিয়াকে। ব্যারাকপুরের বাড়িতে ম্রিয়মণাকে দেখে প্রশ্ন জাগল, কি এমন সংস্কার, যে কিছুতেই ভোলা যাচ্ছে না মৃত স্বামীকে? যে মারা গেছে সে তো গেছেই। তবুও তার জন্য বিলিয়ে দিতে হবে নিজের অমূল্য জীবন! অতৃপ্ত যৌবন,—সেকি শুধু আগুনে পুড়বার জন্য!

চার্ণকের বুকের মধ্যে গভীর যন্ত্রণা ঝড়ের মতো আন্দোলিত হল। কি তার অপরাধ? কেন সম্পূর্ণ নিজের করে পাচ্ছেন না তার প্রিয়তমা নারীকে! কিসের আড়াল? কিসের অনীহা?

চার্ণক পালংকের কাছে এসে দাঁড়ালেন। মারিয়ার পরনে বৈধব্যের শুভ্র পোষাক। স্বামীর মৃত্যুর পর দু'মাস কেটে গেছে। চার্ণক তার প্রণয় আকর্ষণের জন্য কার্পণ্য করেন নি। চারদিকে বিলাস ব্যসনের নিদর্শন ছড়ানো ছেটানো। কিন্তু একটাও ছুঁয়ে দেখেননি এই রূপসী নারী। সে সদাসর্বদা নতমুখী, বেদনার্ত, বিষন্ন।

চার্ণকের পায়ের শব্দে সোজা হয়ে বসলেন তিনি। গভীর কালো চোখ দুটোয় ম্লান আলো; অসহায়তা। চার্ণকের ইঙ্গিতে পরিচারিকা দু'জন কক্ষত্যাগ করলে তিনি কোমল স্বরে বললেন, কেমন আছ? মারিয়া কথা বললেন না। চার্ণক আবার বললেন, 'আমাকে দেখে ভয় পাওয়ার কোন কারণ নেই। আমি তোমার কোন ক্ষতি করব না মারিয়া।'

মারিয়া একপলক তাকিয়েই অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে নিলেন। এবারও কথা বললেন না। তার

দৃষ্টি স্ফটিকের মত ভাবলেশহীন। চার্ণক আবার বললেন, 'তুমি এখনও পুরনো দিনগুলোর কথা ভুলতে পারছ না? কিন্তু আমার এখান থেকে বেরিয়ে যাদের কাছে যেতে চাও তারা তো তোমাকে মেরে ফেলবে আগুনে পুড়িয়ে! একঘরে করে রাখবে।'

মরতে চায় না মারিয়া। মরতে চায় না বলেই একেবারে শেষ মুহূর্তে চূড়ান্ত সময়ে স্বামীর মৃত-দেহের সঙ্গে চিতায় উঠতে চায় নি। চার্ণকের কথার উত্তর না দিয়ে মৃদুস্বরে মারিয়া বলল, 'কিন্তু আমাকে এভাবে ধরে রেখে তোমার কি লাভ?'

'আমার কি লাভ বুঝতে পারছ না?' স্থির ভাবে বললেন চার্ণক। বুকের মধ্যে আবার ঝড়ের দোলন অনুভব করলেন তীব্র আবেগে। 'আমি তোমাকে ভালবাসি মারিয়া। আমি তোমাকে আমার একমাত্র স্ত্রীর সম্মান দিতে চাই। আমি বিশ্বাস করি, জীবন নষ্ট করার জন্য নয়। জীবন উপভোগ করার জন্য।'

অস্পষ্ট আওয়াজ বেরিয়ে এল মারিয়ার গলা থেকে। চার্ণকের এই প্রস্তাব তিনি আগেও পেয়েছেন। কিন্তু প্রতি বারই মনে হয়েছে, অন্যায়। বড় গর্হিত কাজ হয়ে যাবে। বললেন, 'সেটা কিভাবে সম্ভব? হিন্দু রমণীর একবারই মাত্র বিয়ে হয়। তাদের স্বামীই সব। আর আমি তো বিধবা।'

চার্ণক পায়চারি করলেন কিছুক্ষণ। তারপর বললেন, 'তুমি বুঝতে পারছ না মারিয়া, তোমার এই চিন্তা ভাবনা কতটা অর্থহীন। একটা কুসংস্কারের বশে তোমার রূপ লাবণ্য, অমূল্য মানব জীবন নষ্ট করে দেবে?'

তীক্ষ্ণ ভাবে চার্ণকের দিকে তাকালেন মারিয়া, 'তুমি তাহলে আমার এই রূপ-লাবণ্যই চাও সাহেব? আমার শরীর-ই চাও?'

বেদনা ফুটে উঠল চার্ণকের মুখাবয়বে। বললেন, 'না মারিয়া না। শুধু শরীর যদি চাইতাম—তাহলে তোমাকে এত সাধ্য সাধনা করতাম না। আমি তাহলে তো জোর করতে পারতাম। আমি অন্য কিছু চাই। কিন্তু কি চাই সেটা জানি না।

মারিয়া এ কথার কোন জবাব খুঁজে পেলেন না। তিনি এখন সম্পূর্ণভাবেই এই ফিরিঙ্গি সাহেবের আয়ত্তাধীন। ইচ্ছা করলেই ওঁকে জোর করে উপভোগ করতে পারেন সাহেব। সতীত্ব নাশ করতে পারেন। কিন্তু করছেন না তো! শুধুমাত্র শরীরের চাহিদা হলে তিনি অনায়াসে তা পূরণ করতে পারেন।

মন অস্থির হল ওঁর। এই দুঃসাহসী মানুষটার প্রতি কোথায় যেন একটু খানি দুর্বলতা অনুভব করলেন। পরমুহূর্তেই মৃত স্বামীর কথা মনে পড়ল। আজন্ম লালিত গভীর সংস্কার আক্রমণ করল ওকে। অস্থির ভাবে মাথা নাড়তে নাড়তে বললেন, 'সেটা হয় না সাহেব, সেটা হয় না। আমি অসহায়।'

বাংলার সুবেদার তখন শায়েস্তা খান। শায়েস্তা খান আরাম প্রিয় মানুষ। ভোগ-বিলাস ছাড়া দিন কাটে না। প্রতিদিনের আয় দু'লাখ টাকা। তার মধ্যে নিজেরই ব্যয় প্রায় এক লাখ। এই অবস্থায় উপায়? আরও টাকা চাই। কিন্তু কে দেবে? কেন, ইংরেজ! কিন্তু ইংরেজরা তাদের

প্রচণ্ড শব্দে একটা কামানের গোলা এসে ফাটল কুঠির আস্তাবলের পাশে। তখন সন্ধ্যে ঘনিয়ে এসেছে। ঘোড়ার হ্রেষা ধ্বনি আর্তনাদের মতো চারদিক মথিত করে তুলল।

দেয় নির্দিষ্ট অংকের টাকা ছাড়া এক পয়সাও বেশি দিতে রাজি নয়। ফলে অবস্থাটা দিন দিন খারাপের দিকেই চলল।

ইংরেজদের সঙ্গে শায়েস্তা খাঁর ফৌজদারদের ঝগড়াঝাঁটি শুরু হয়ে গেল। চার্ণক বুদ্ধিমান। বুঝলেন, বেশি অনুনয়-বিনয়ে কাজ হবে না। চাই বাহুবল। পায়ের নিচে মাটি। গেরিলা যুদ্ধের কায়দা অবলম্বন করলেন তিনি। অতর্কিতে আঘাত করেই সরে পড়তে লাগলেন। একদিন শায়েস্তা খাঁ ক্ষ্যাপা বাঘের মতো আক্রমণ করে বসলেন ব্যারাকপুর ঘাঁটি। চার্ণক যেখানকার সর্বাধিনায়ক।

প্রচণ্ড শব্দে একটা কামানের গোলা এসে ফাটল কুঠীর আস্তাবলের পাশে। তখন সন্ধ্যে ঘনিয়ে এসেছে। ঘোড়ার হ্রেষা ধ্বনি আর্তনাদের মতো চারদিক মথিত করে তুলল। কুঠীর মধ্যে তখন সকলেই খানা-পিনায় ব্যস্ত। কেউই এই আক্রমণের জন্য প্রস্তুত ছিল না। কী ব্যাপার! প্রহরী জানালো, সুবেদার শায়েস্তা খাঁ কুঠী আক্রমণ করেছে।

কালবিলম্ব না করে জব চার্ণক প্রত্যেককে আত্মরক্ষার জন্য তৈরি হতে আদেশ দিলেন। সঙ্গে লোকবল বেশি নেই, ওদিকে নবাবসৈন্য কত আছে, সেটাও ভাল বোঝা যাচ্ছে না। একটা আন্দাজ করে নিতে পারলে সিদ্ধান্ত নেওয়া যায়—যুদ্ধ চালিয়ে যাওয়া যাবে কিনা।

খবর পাওয়া গেল নবাব নিজেই এসেছেন। তিন দিক থেকেই ঘিরে ফেলেছে। পুরো বাহিনী পালিয়ে যাওয়া ছাড়া উপায় নেই। দ্রুত সিদ্ধান্ত নিলেন চার্ণক কি কি করতে হবে।

চিন্তিত মুখে বসেছিলেন মারিয়া। তিনি বুঝতে পারছিলেন গুরুতর কিছু ঘটেছে। ঘটতে চলেছে আরও। কেউ কুঠী আক্রমণ করেছে। কিন্তু কে, সেটা বুঝতে পারছিলেন না। সরলা দাসীকে পাঠিয়েছিলেন, সে এসে খবর দিয়েছে—নবাব-সৈন্য কুঠী আক্রমণ করেছে।

খবর শোনার পর বিভিন্ন চিন্তা এলোমেলো ভাবে তাঁর মাথায় ঘুরতে লাগল। এই সুযোগে কি তিনি পালিয়ে যেতে পারবেন? কিন্তু পালিয়েই বা যাবেন কোথায়? কে আশ্রয় দেবে?

দরজা ঠেলে চার্ণক ঘরে ঢুকলেন। উদভ্রান্তের মতো মারিয়ার একটা হাত নিজের হাতের মধ্যে টেনে নিলেন, 'মারিয়া শোন—আর উপায় নেই। ভীষণ বিপদ আমাদের। এখুনি কুঠী ছেড়ে পালাতে হবে।'

'কোথায়?'

'জানি না।' চার্ণক বললেন। 'জানি না ভাগ্য আমাদের কোথায় নিয়ে যাবে। তবে এখুনি এই স্থান ছেড়ে যাওয়া ছাড়া উপায় নেই। শায়েস্তা খাঁ কুঠী আক্রমণ করেছে।'

মারিয়া মাথা নিচু করে শুনছিলেন। চার্ণক আবার বললেন, 'মারিয়া, চুপ করে থাকার সময় আর নেই। দেখ, আমি এদেশে এসেছি ভাগ্যের খোঁজে। কখনো কারুর কাছে মাথা নত করিনি। তুমি শুধু আমার সঙ্গেই থাক। আমার ভবিষ্যৎ যতই অনিশ্চিত হোক, তুমি পাশে থাকলে কাউকেই ভয় পাই না আমি।'

মারিয়া চঞ্চল ভাবে তাকালেন। কাতর ভাবে নিজের কথাই পুনরাবৃত্তি করলেন, 'আমাকে ছেড়ে দাও সাহেব।'

চার্ণককে খুব অসহায় লাগল। চোখের তারায় বেদনা ফুটে উঠল। বললেন, 'তবে তাই হোক। তৈরি হয়ে নাও। কুঠী থেকে নিরাপদে বেরিয়ে যাওয়ার রাস্তা তোমাকে আমি দেখিয়ে দেব।'

চার্ণক দ্রুত চলে এলেন কুঠীর প্রধান দরজার সোজা ছাতের ওপর। যেখান থেকে বন্দুক ছুঁড়ে তার সৈন্যরা নবাবের সৈন্যদের ঠেকিয়ে রাখছে। খুব অস্থির লাগছিল তাকে। এক মুহূর্ত দাঁড়িয়ে জোরে নিঃশ্বাস ছাড়লেন, কোন দুর্বলতাকে আর প্রশ্রয় দেবেন না। সৈন্যদের বললেন, 'পালিয়ে যাওয়া ছাড়া উপায় নেই। তৈরি হয়ে নাও।'

একটু পর আবার মারিয়ার ঘরে এলেন। দেখলেন, মারিয়া আগের মতোই অলসভাবে বিছানার ওপর বসে আছেন। একটু রুক্ষ স্বরেই চার্ণক বললেন, 'কি ব্যাপার, এখনো তৈরি হওনি?'

এই প্রথমবার হাসিমুখে তাকালেন মারিয়া। চার্ণকের বুকের মধ্যে কি যেন লাফিয়ে উঠল। তীব্র সংকটের মধ্যেই মানুষের ভিতর থেকে সরে যায় জড়তা, দ্বিধা, কুসংস্কার। নিজের সত্তাকে সে তখন পুরোপুরি খুঁজে পায়। মারিয়া অনেক ভেবেছে। কোথায় যাবে সে একা একা? তার স্বামী নেই। সন্তান নেই। আপনার বলতে কেউ নেই। ফিরে গেলেই জোর করে 'অনুমরণ' করাবে গ্রামের লোকজন। কিংবা এক ঘরে করবে। এতদিন এক বিধর্মীর সঙ্গে কাটানোর পর সমাজে তার অবস্থা কি হবে! তাছাড়া, কুঠী থেকে বেরনোর সময় নবাব সৈন্যদের হাতে পড়লে তারাও কি ছেড়ে দেবে সহজে?

তার থেকে এটাই ভালো। যদি পাপ হয়, হোক। কি আর করা যাবে। এই ফিরিঙ্গি যুবক তার কাছ থেকে ভালবাসা ছাড়া আর কিছু চায় না। গত দুমাসে সম্পূর্ণ আয়ত্তের মধ্যে পেয়েও কখনো বলপ্রয়োগ করেনি। অপমান করেনি। আবার এই বিপদের মধ্যেও ওকে নিরাপদে পৌঁছে দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিচ্ছে। তাহলে? বিশ্বাস যদি করতে হয়, ওকে ছাড়া আর কাকে করবেন মারিয়া?

সুতরাং আবার হাসলেন। মুখ তুলে পূর্ণ দৃষ্টিতে তাকালেন। বললেন, 'এখুনি তৈরি হতে হবে? আমি তোমার সঙ্গে যাব।'

বেঙ্গসরকার : উপেক্ষিত নায়ক !

দিলীপ ও তার স্ত্রী মানালির স্বপ্নকে জড়িয়ে নিয়ে গেল দমকা হাওয়ার ঝড়। তবু ভাগ্যের ক্রিকেটে বোম্বাই দিল সেঞ্চুরী। টেস্ট তো বটেই, এমনকি আঞ্চলিক ক্রিকেটেও অধিনায়কত্বের শিরোপা কেন পায় না বেঙ্গসরকার ? স্ত্রী মানালি ও পুত্র নকুলের সঙ্গে কি স্বপ্ন দেখে দিলীপ ? কি তার দিনতামামি ? কপালের ফেরে আহত এক ক্রিকেটারের স্মৃতিসত্ত্বা, ভবিষ্যৎ নিয়ে লিখেছেন আমাদের ক্রীড়া প্রতিনিধি বিবেক আনন্দ।

১৯৮৩ সাল। ভারতীয় ক্রিকেটদল ওয়েস্ট ইণ্ডিজ সফরে যাচ্ছে, কিন্তু দলের অধিনায়ক কে হবে ? কিছুদিন আগেই ইমরান খানের পাকিস্তানী দলের হাতে শোচনীয় ভাবে পরাজিত হয়ে ফিরে এসেছে ভারতীয়রা। সারা দেশ জুড়ে ধিক্কার ধ্বনিত হয়েছে সুনীল গাভাসকারের নামে। 'গাভাসকার হটাও, ভারতীয় ক্রিকেট বাঁচাও।' শেষ পর্যন্ত অধিনায়কের পদ থেকে অপসারিত হতে বাধ্য হল সুনীল গাভাসকার।

বোম্বাই শহরের শহরতলি দাদারের হিন্দু কলোনির একটি বাড়িতে তখন নতুন স্বপ্নে বিভোর হয়ে আছে দুটি প্রাণ। তাদের আশা এবার নিশ্চয়ই ডাক পড়বে দিলীপ বেঙ্গসরকারের, ভারতীয় ক্রিকেট দলের নেতৃত্ব দেবার জন্য। কিন্তু মানুষ ভাবে এক আর এক হয় বাস্তবে। দিলীপ ও তার স্ত্রী মানালির স্বপ্নকে উড়িয়ে নিয়ে গেল হরিয়ানার এক দমকা হাওয়ার ঝড়। ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ড কপিল দেবকে দলনেতা নির্বাচিত করল।

দিলীপ বলবন্ত বেঙ্গসরকারের আরেক নাম কর্নেল বেঙ্গসরকার। সেনাপতি ! কিন্তু কোন সৈন্য নেই তার অধীনে। গাভাসকারের পর এই মুহূর্তে সে ভারতের সবচেয়ে বড় ব্যাটসম্যান

৯২ পৃষ্ঠায় দেখুন
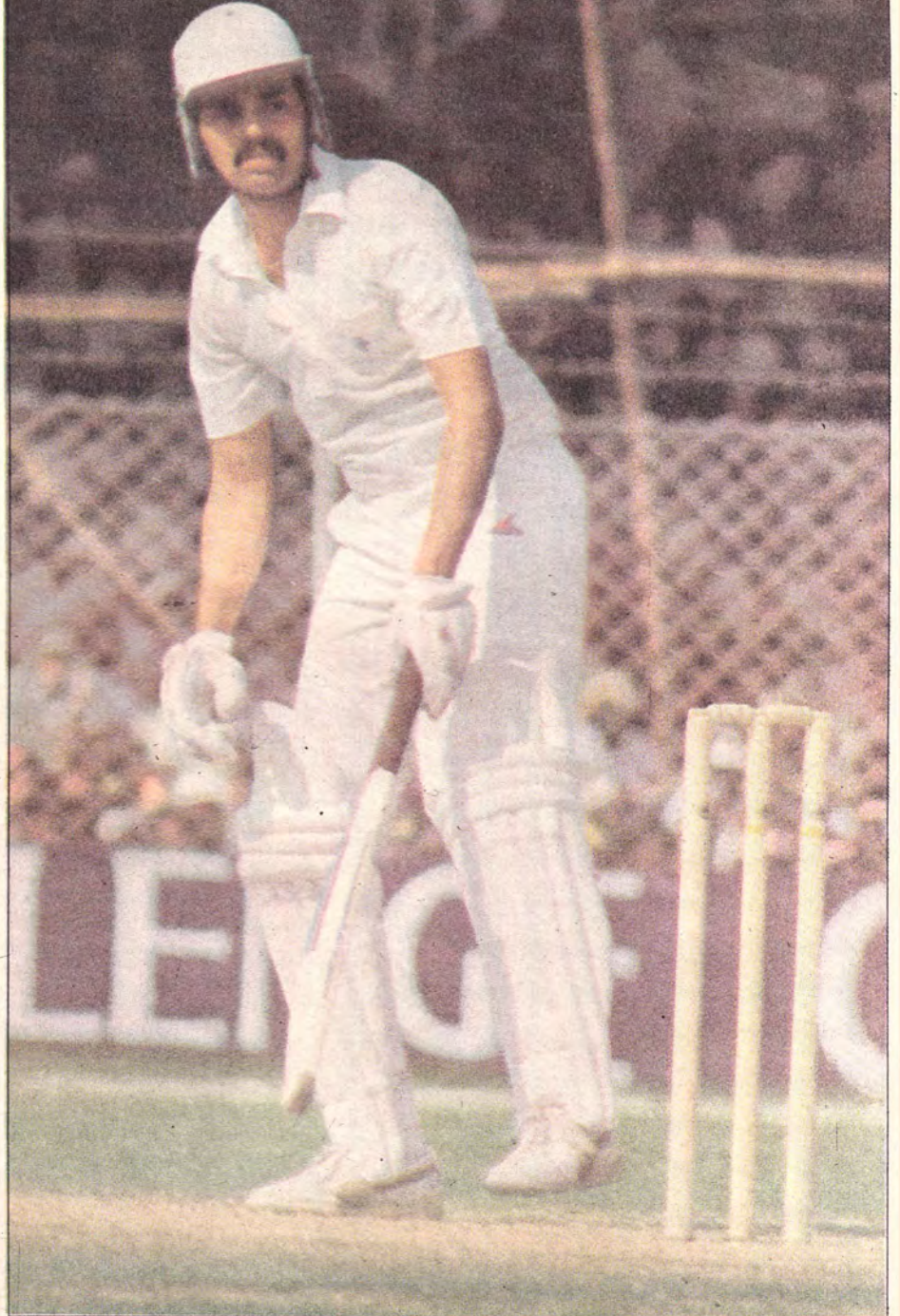
রাশিয়ান সার্কাস :

১১ নভেম্বর '৮৬, নেতাজী ইণ্ডোর স্টেডিয়ামে অপূর্ব দেহ ভঙ্গিমায় উড়ল 'শান্তির শ্বেত পায়রা.' মঞ্চে অবতীর্ণ হলেন 'প্রমিথিউস' । প্রেসিডেন্ট রেগন গরবাশেভের মহাযুদ্ধ প্রকল্প বাতিল করলেও রুশ দেশের প্রতিনিধি দল বিশ্বে ভ্রাতৃত্ববোধ ও শান্তির বাণী ছড়ালেন শিল্পমণ্ডিত করে । সঙ্গীতের মূর্ছনা আর অনন্য দেহ-নমনীয়তার অপূর্ব শিল্পোত্তরণ ঘটল মঞ্চে ।

বিশ্ববিখ্যাত 'দ্য সোবিয়েত সার্কাস অব মস্কো' দলটি এবার কলকাতার নেতাজী ইণ্ডোর স্টেডিয়াম মাৎ করেছে । বিশ্বের তাবড় তাবড় কলাসমালোচক ইতিমধ্যেই একে 'গ্রেটেস্ট শো অন আর্থ' বলে অভিহিত করেছেন। কারো কারো মতে, 'দ্য গ্রেটেস্ট এনটারটেইনমেন্ট অন আর্থ'।

ক্লাউন ও জাগলারদের রসিক আচরণ, ম্যাজিসিয়ানদের গোপন রহস্য, ট্রাপিজের খেলা, টাইট-রোপ ওয়াকিং, ব্যালে নৃত্যের অপূর্ব ভঙ্গিমা, স্প্রিং নেটের উপর কসরৎ, ব্যালান্সের খেলা, এন্টিপোডের কেতা-কৌশলে ৪৮ সদস্যের এই সার্কাস দলটি বিশ্বে অদ্বিতীয় । আর এদের সব চাইতে আকর্ষণীয় খেলা অ্যাক্রোব্যাটিকস্ ।

সারা নেতাজী ইণ্ডোর স্টেডিয়াম দর্শকের উদ্দাম উল্লাসে ফেটে পড়ছে । দুই ক্লাউন ইউরি এর মাচেনকভ ও আলেকজাণ্ডার ড্রামাণ্ডির কৌতুকে গ্যালারিতে গ্যালারিতে খুশির বন্যা ।

স্প্রিং নেটের উপর কসরৎ দেখাতে প্রপোতো-ভার জুড়ি নেই । বিশ্বের পয়লা নম্বর খেলুড়ে। প্রত্যেক বছর সোনা জিতছেন তিনি । টগবগে যুবতী নাজেদদা কাপুসটিনা । বয়েস কুড়ি । চোখমুখ সব সময়েই খুশিতে উজ্জ্বল । বিপজ্জনক জিমন্যাসটিকের খেলায় গ্যালারির প্রত্যেকটি দর্শক নীরব । সারা স্টেডি-য়ামে 'পিন ড্রপ সাইলেন্স'। সবাই রুদ্ধশ্বাস নীরবতায়

পলকহীনভাবে দেখছে কাপুসটিনাকে । দেহের অসম্ভব নমনীয়তার কষ্টকল্পিত সব খেলা দেখালেন তিনি । কিন্তু খেলার শেষেও সেই হাসিটিই মুখে লেগে আছে । প্রতি পদে বিপদের ঝুঁকি নিয়েও কাপুসটিনা সমান উচ্ছল ।

বিশ্ববিখ্যাত আক্রোব্যাট ভি. এরমাকভের খেলাতে প্রত্যেকটি দর্শক অবাক। আক্রোব্যাটিক কঞ্জুরার খেলা দেখালেন এলেনা ভল্গমন ও রাকেইল জিটাল-সভলি । বিশ্বের সেরা জুটি । সাইকেল রিমের সঙ্গে অন্য খেলা তো আছেই ।

আই.সি.সি. আর, অনামিকা কলাসঙ্গম এবং পিয়ারলেসের যৌথ ব্যবস্থায় কলকাতায় খেলা দেখাচ্ছেন রুশ সার্কাস দলটি । ছিলেন হোটেল কেনিলওয়ার্থে । ১১ থেকে ১৮ তারিখ পর্যন্ত খেলা চলেছে নেতাজী ইণ্ডোর স্টেডিয়ামে । ১২ জন তরুণীসহ মোট ৪৮ জনের এই

আকর্ষণ আর শিহরণের কেন্দ্রবিন্দু

রুশ সার্কাস দলটিকে ঘিরে কলকাতার অলিতেগলিতে চা কর্নার, রেস্তোরাঁয় রেস্তোরাঁয় ছিল তুমুল আলোচনা। টিম ম্যানেজার বি এম জাৎস্ এবং দলনেতা ভিকতর নারকোভিচ কলকাতাবাসীদের সামনে উপহার দিলেন অদ্ভুত শৈল্পিক কার্যক্রম।

টিকিট সংগ্রহের জন্য লম্বা লাইন পড়ছিল সাত সকাল থেকেই।

শারীরিক প্রতীকিতে ওড়া শান্তির শ্বেত পায়রা, ব্যক্তিগত শিল্প চেতনা, বিমূর্ত কল্পনা আর ভাবনা ধরা দিল দেহ ভঙ্গিমায়। মানুষের শৌর্য, সাহস, সেন্স অব হিউমার আর হৃদয়বত্তা মূর্ত হয়ে উঠল কুশলীদের অনন্য নিবেদনে। মস্কো আর কিয়েভে প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত কুশীলবেরা আসরে এনে দিয়েছিলেন বাঁধনছেঁড়া প্রমিথিউসকে।

লেখা : আলপনা ঘোষ
ছবি : বিকাশ চক্রবর্তী
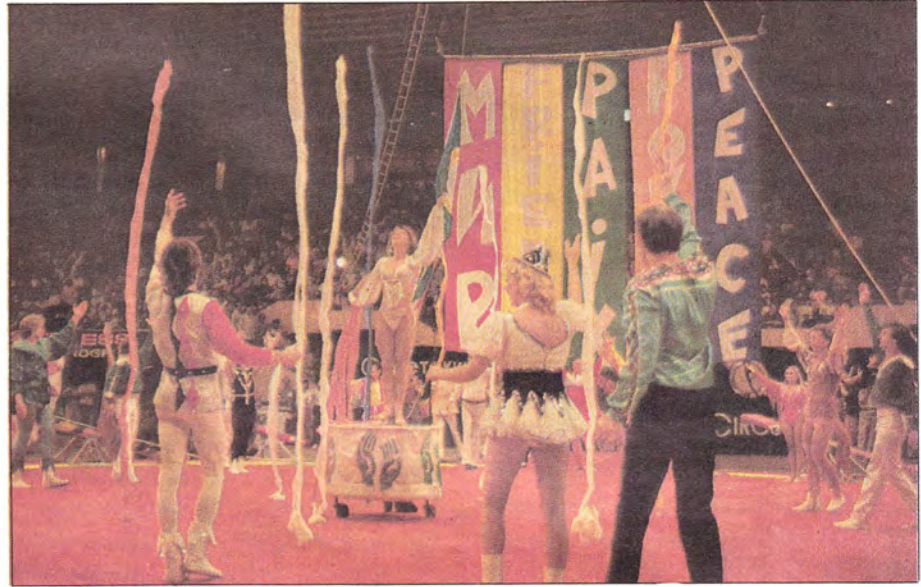
দেহসুষমার চরমোৎকর্ষে, মানবীয় ক্ষমতার পরাকাষ্ঠা প্রদর্শনে রুশ ব্যালের ঐতিহ্যানুসারী সার্কাসদল মাতিয়ে দিয়ে গেল কলকাতার কলামোদি জনমনকে। কল্পনাই যেন সে কদিন সাকার হয়ে উঠেছিল নেতাজি ইন্ডোর স্টেডিয়ামের অন্তর্চৌহদ্দিতে। জীবনের প্রাণবন্ততার আরেক নাম যে বিপজ্জনকভাবে বাঁচার আনন্দ, এই বাঁধনছেঁড়া প্রমিথিউসের দল তার উজ্জ্বল-উদ্ধার করে দিয়ে গেল এই শহরে।

স্ত্রী মানলীর সঙ্গে দিলীপ : দুজনের প্রথম দেখা কলকাতাগামী এক ফ্লাইটে

৮৯ পৃষ্ঠার পর

কিন্তু তবুও সে যেন তার প্রাপ্য মর্যাদা পায়নি। সুনীল গাভাসকার ও গুণ্ডাপ্পা বিশ্বনাথের পর সেইই একমাত্র ভারতীয় যে টেস্টে পাঁচ হাজারের বেশি রান করতে পেরেছে। বেঙ্গসরকারই প্রথম ভারতীয় যে একদিনের আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে দু হাজার রান পেয়েছে। ক্রিকেটের স্বর্গোদ্যান লর্ডসে পরপর তিনটি শতক করার কৃতিত্বও তারই আছে যা সে প্রথম আবির্ভাব থেকেই শুরু করেছিল। সাগরপারের আর কোন খেলোয়াড় লর্ডসে এই কৃতিত্ব দেখাতে পারে নি। ব্যাটিং–এর প্রায় সমস্ত ধরনের রেকর্ড যার কাছে হার মেনেছে, সেই সুনীল গাভাসকারও আজ পর্যন্ত লর্ডসে শতক পাননি।

১৯৭৪ সাল। নাগপুরে খেলা চলছে ইরানী ট্রফির। রঞ্জী ট্রফি জয়ী বোম্বাই দলের সঙ্গে অবশিষ্ট ভারতীয়-একাদশের খেলা। খেলার ঠিক শুরুতে অসুস্থ হয়ে পড়লেন সোলকার। তাঁর শূন্যস্থান পূরণ করল পোদ্দার কলেজের উনিশ বছরের ছাত্র দিলীপ বেঙ্গসরকার। বিশ্বখ্যাত স্পিন বোলারদের এতটুকুও সমীহ না করে সেই তরুণ খেলোয়াড়টি দ্রুত তার শতক পুরো করল। মারকুটে সেই ইনিংসে বেঙ্গসরকার বেদী ও প্রসন্নের বলে ৭টি ছক্কা মেরেছিল। তখনই বোঝা গেল জাতীয় দলে তার যোগদান অবশ্যম্ভাবী। তারপর আর তাকে বেশিদিন অপেক্ষা করতে হয়নি। ১৯৭৬ এর মরশুমেই তার ডাক পড়ল টেস্ট দলে নিউজিল্যাণ্ড ও ওয়েস্ট ইণ্ডিজ সফরে।

এক দশক পরেও দিলীপ বেঙ্গসরকার ভারতীয় দলের এক অপরিহার্য ব্যাটসম্যান। কি টেস্টে কি একদিনের আন্তর্জাতিক খেলায়, বহুবার সে নিজের যোগ্যতার পরিচয় দিয়েছে। যখন বিপক্ষের বোলিং আক্রমণে অন্যান্য ব্যাটসম্যান দিশেহারা তখন দেখা গেছে কর্নেল বেঙ্গসরকার একা দাঁড়িয়ে আছে। ইংলণ্ড সফরে হেডিংলের টেস্টে অপরাজিত ১০২ রান কি ভোলা যায়? কনকনে ঠাণ্ডায় দুটো করে সোয়েটার পরতে বাধ্য হয়েছিল ভারতীয় ব্যাটসম্যানরা। ঠাণ্ডা, তার উপরে হাড় কাঁপানো হাওয়া। এরই মধ্যে ব্রিটিশ পেস বোলারদের বল অসমান পিচে পড়ে হঠাৎ হঠাৎ লাফিয়ে উঠছে। কখনও বা হাওয়ায় ডাইনে বাঁয়ে সুইং করছে বল। নামী দামী ভারতীয় ব্যাটসম্যানরা একে একে ফিরে গেছে। নামে মাত্র রান তখন স্কোর বোর্ডে। শেষ পর্যন্ত অপরাজিত থেকে শেষরক্ষা করল বেঙ্গসরকার। গত ইংল্যাণ্ড সফরের তিনটি টেস্টের মধ্যে দুটিতে জয়ী হয়ে বহুদিন বাদে ভারত টেস্ট ম্যাচ ও সিরিজ জয়ের মুখ দেখল। এর পেছনে নিঃসন্দেহে দিলীপেরই অবদান সবচেয়ে বেশি। এই সিরিজে 'ম্যান অব দ্য সিরিজ'–এর পুরস্কার পায় দিলীপ বেঙ্গসরকার। এর আগে ১৯৮৫র মরশুমে শ্রীলংকা সফরে ভারত পরাজিত হয়ে ফিরে এল টেস্ট ক্রিকেটে নবাগত এই দেশটির কাছে। এই সিরিজেও ভারতের পক্ষে সবচেয়ে বেশি রান করেছিল দিলীপ।

শ্রীলংকার হাতে কপিলদেবের নেতৃত্বাধীন ভারতীয় দলের শোচনীয় পরাজয়ের পর দিলীপ আশা করল এবার হয়ত ভাগ্যলক্ষ্মী তার দিকে মুখ তুলে চাইবেন। অধিনায়ক হিসেবে কপিলদেবের ধারাবাহিক ব্যর্থতার জন্য সর্বত্র গুঞ্জন শুরু হল কপিলদেবের দল পরিচালনার যোগ্যতা নিয়ে। এর আগে সুনীল গাভাসকারও অধিনায়কের পদে পুনর্প্রতিষ্ঠিত হতে তার আপত্তি জানিয়ে দিয়েছে। এ অবস্থায় দিলীপের আশা করাই স্বাভাবিক যে অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে তাকেই দলনেতা নির্বাচিত করা হবে। কিন্তু কিছু স্বপ্ন থাকে যা পূরণ হওয়ার নয়। দিলীপ বেঙ্গসরকারের কাছে ক্রিকেটে জাতীয় দলের নেতৃত্ব দেওয়ার স্বপ্ন মরীচিকা হয়ে শুধু আশা জাগিয়েই দূরে সরে যায়। কপিলদেবকেই দলনেতা হিসেবে পুনর্নির্বাচিত করা হল। দিলীপকে অধিনায়ক করা হল না, শুধু তাই নয় এ বছরের শুরুতে শারজায় অস্ট্রেলেশিয়া কাপের খেলায় ভাল ফর্মে থাকা সত্ত্বেও তাকে প্রথম দুটি ম্যাচে বাদ দেওয়া হল। এবারকার সিরিজ যে দুজনের সাহায্যার্থে আয়োজিত হয়েছিল তার মধ্যে দিলীপ বেঙ্গসরকার একজন।

কেন দিলীপকে ক্রিকেট দলের অধিনায়ক করা হয় না? এই প্রশ্নের সদুত্তর কোন কর্মকর্তা দিতে পারেন না। অনেকেই বলেন 'দিলীপ মুখচোরা। অন্যান্য খেলোয়াড়দের সঙ্গে মেশে না, এড়িয়ে চলে তাদের।' কেউ কেউ অভিযোগ করেন 'বেঙ্গসরকার কুঁড়ে. খালি নিজের ব্যাটিংটা করে দিলে বাকি সব দায়িত্ব ভুলে যায়, এমনকি ফিল্ডিং পর্যন্ত মন দিয়ে করে না।' দিলীপ বেঙ্গসরকার কিন্তু এ সমস্ত অভিযোগ মানতে রাজী নয়। বলে, 'কে বলল আমি অন্য খেলোয়াড়দের এড়িয়ে চলি। দলের প্রত্যেক খেলোয়াড়, পুরনো নবাগত সবার সঙ্গেই আমার খুব ভাল সম্পর্ক। আর মুখচোরা? অজিত ওয়াদেকরও তো আমার মত শান্ত স্বভাবের ছিল কিন্তু তিনি ভারতের সবচেয়ে সফল ক্রিকেট অধিনায়ক।' দিলীপের স্ত্রী মানালি বলে, 'কেন যে ওকে সবাই মুখচোরা বলে বুঝি না। সব সময় তো বন্ধু-বান্ধব লোকজন নিয়েই ঘুরে বেড়ায়। এমন কি আমি পর্যন্ত ওকে একা নিয়ে বেড়াতে বেরনোর সুযোগ পাই না।'

দিলীপ বেঙ্গসরকারের সম্বন্ধে যে ধারণাটা ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ডের কর্মকর্তাদের হয়েছে অর্থাৎ 'দিলীপ টীমম্যান নয়', তার পেছনে দিলীপের নিজেরও কিছু দায়িত্ব আছে। একবার টাটার ক্রিকেট দল নির্বাচনের সময় তাকে দলনেতার দায়িত্ব দেওয়া হল, কিন্তু দিলীপ সরাসরি সে সুযোগ প্রত্যাখ্যান করে। বিভিন্ন সময়ে অন্যান্য খেলোয়াড়দের সঙ্গে আনন্দানুষ্ঠানে যেতেও অস্বীকার করেছে সে। এর আগে ইংলণ্ড দলের ভারত সফরের সময় নবাগত আজাহারউদ্দিন আবির্ভাবেই শতকের হ্যাটট্রিক করে বিশ্ব রেকর্ড তৈরি করল। তাই কানপুর টেস্টের শেষে হোটেলের নিজের ঘরে এক নৈশভোজের আয়োজন করেছিল আজাহারউদ্দিন। সবাই এল, দেখা গেল দিলীপ বেঙ্গসরকার আসে নি। সে তখন দুটি ঘর পরেই নিজের কামরায় শরীর মালিশ করাচ্ছে। খেলার শুরুতে নিয়মিতভাবে দলের খেলোয়াড়দের সঙ্গে ম্যানেজারের সভা বসে। শলা পরামর্শ করে পরিকল্পনা তৈরি করা হয়। বেঙ্গসরকারকে অনেক সময়ই দেখা যায় সেই সব সভায় অনুপস্থিত। কেউ না চাইলে নিজে থেকে কখনও কাউকে পরামর্শ বা উপদেশ দেয় না। তাই দেখা যায় উইকেটের এক প্রান্তে যখন দিলীপ প্রচুর রান পাচ্ছে তখন উল্টো দিকের ব্যাটসম্যান কোন অনুপ্রেরণাই পাচ্ছে না তার এই অভিজ্ঞ সহখেলোয়াড়টির কাছ থেকে। দিলীপ যেন আস্তে আস্তে নিজের চারদিকে এক দেওয়াল তুলে দিয়েছে। তাই শুধু জাতীয় দল নয়, আঞ্চলিক দল পশ্চিমাঞ্চলেও অধিনায়কত্ব করার সুযোগ সে পায়নি। কনিষ্ঠতর খেলোয়াড় রবি শাস্ত্রী এখন পশ্চি-

মাঞ্চল ক্রিকেট দলের অধিনায়ক।

মুখচোরা হলেও একবার কিন্তু দিলীপ বেঙ্গসরকার তার মনের কথা গোপন রাখে নি, তা যদি রাখত তাহলে আজকে মানালিকে সে স্ত্রী হিসেবে পেত না। ইটালি থেকে 'ফ্যাশন ডিজাইনিং' পাস করে আসা সুন্দরী তরুণী মানালির সঙ্গে দিলীপের দেখা কলকাতাগামী এক ফ্লাইটে, তারপর প্রেম ও বিয়ে। এখন ঘর সংসার ছাড়াও মানালি একটি বিউটি পারলার ও একটি চামড়ার জিনিসপত্র তৈরির ব্যবসা চালায়। তাদের চার বছরের ফুটফুটে ছেলে নকুল এ বছর জুন মাস থেকে স্কুলে যেতে শুরু করেছে। বেঙ্গসরকার দম্পতি আর এক সন্তানের জন্য অপেক্ষা করে আছে। তাদের আশা বছরের শেষে যে নতুন অতিথি আসছে সে হবে নকুলের বোন।

দিলীপ বোম্বাইয়ের টাটা ইলেকট্রিক্যালসের জনসংযোগ দপ্তরে চাকরি করে, কিন্তু অন্যান্য খেলোয়াড়দের মতই নামেমাত্র চাকরি। এমনিতে বিভিন্ন টুর্নামেন্ট তো থাকেই, অন্যান্য সময় খেলার জন্য দেশ বিদেশে ঘুরে বেড়াতে হয় তাকে। যখন এদেশে ক্রিকেট মরশুম থাকে না তখন ইংলণ্ডের কাউন্টিতে এডিনবরার হয়ে বোস্টন লীগে খেলে। সে সময়টা তার পুরো পরিবারটাই সেখানে থাকে—এটাই তার এক ধরনের ছুটি কাটানো। ক্রিকেট ছাড়া দিলীপ সবচেয়ে বেশি সময় ব্যয় করে তার সন্তান নকুলের সঙ্গে। এমন কি যখন বিদেশ সফরে যায় তখনও প্রায় প্রত্যেকদিনই টেলিফোন করে কথা বলে ছেলের সঙ্গে। বাড়িতে থাকলে নিজের হাতেই সে ঘর সাজায়, ছেলের যত্ন করে।

বেঙ্গসরকারও আরও অনেক খেলোয়াড়দের মত কুসংস্কারে বিশ্বাসী। তার ইনিংসের সময় সে দাড়ি কাটে না। যেদিন তার ব্যাটিং তার আগের সন্ধ্যায় বাড়িতে ফোন করতে কখনও ভুল হয় না দিলীপের। মানালিও এসব জিনিস বিশ্বাস করে। ধর্মের প্রথামাফিক বিয়ের পর দিলীপ তার স্ত্রীকে এক হীরে বসানো কানের দুল উপহার দিয়েছিল। মানালি তার অনেক সাধের সেই কানের দুল যেদিন প্রথম পরল সেদিনই মাদ্রাজ টেস্টে দিলীপ বেঙ্গসরকার প্রথম বলেই আউট হয়ে গেল। তারপর থেকে সে আর কানের দুলটি কখনও পরে নি।

তিরিশ বছর বয়সী বেঙ্গসরকারের ইচ্ছে অন্তত আরও পাঁচটি বছর এভাবেই খেলে যাওয়া। সুনীল গাভাসকারের পর ভারতের হয়ে দ্বিতীয় সর্বাধিক টেস্ট রান করার লক্ষ্য তার সামনে। আপাতত এই রেকর্ডটি আছে গুণ্ডাপ্পা বিশ্বনাথের দখলে। তার রান সংখ্যা ৬,০৮০। বোম্বের কিং জর্জ ইংলিশ স্কুলের যে ছেলেটি দলের হয়ে ইনিংসের সূচনা করত আর উইকেট রক্ষা করত সে এখন ভারতীয় দলের দ্বিতীয় অভিজ্ঞতম খেলোয়াড়। নিজের প্রাপ্য মর্যাদা ছিনিয়ে নেবার জন্য ব্যাট হাতে সে লড়াই চালিয়ে যাচ্ছে। কিন্তু অধিনায়ক হবার স্বপ্ন তার সফল হবে কি?

ছবি: কল্যাণ চক্রবর্তি সি.এন.এস.

দিলীপ বেঙ্গসরকারের রান

১০০০ রান	১৯তম টেস্ট
২০০০ ,,	৩৫ ,, ,,
৩০০০ ,,	৫৪ ,, ,,
৪০০০ ,,	৭০ ,, ,,
৫০০০ ,,	৮৬ ,, ,,

দিলীপ বেঙ্গসরকারের আউট হওয়া

বোল্ড	১০ বার
ক্যাচ আউট	৯৪ বার
এল.বি.ডব্লু	১৫ বার
স্টাম্পআউট	২ বার
রান আউট	২ বার
হিট উইকেট	১ বার

গত এক দশকে দিলীপ বেঙ্গসরকার (১৯৭৬-৮৬)

টেস্ট	৮৭
ইনিংস	১৪২
মোট রান	৫১৭১
সর্বাধিক স্কোর	১৬৪
অপরাজিত	১৮
শতক	১২
রানের গড়	৪১.৬০

(২২ পৃষ্ঠার পর)
বাহাদুরই বাগানবাড়িতে ডেকে এনেছিল। পরিমলবাবুর নাম করে। পরিমলবাবু এর বিন্দু-বিসর্গ জানতেন না।

আমরা ঘটনাটির উল্লেখ করলাম বাগান-বাড়িতে অবৈধ ভোগবিলাস ও তার শেষ পরিণতি মর্মান্তিক ক্রাইমের একটি নজির হিসাবে।

এবার শহরতলী থেকে উঠে আসা বাগানবাড়ি কালচারেরই বিকৃত দশা কিভাবে কলকাতায় আস্তানা গাড়ল, তারই খতিয়ানাটি নজরে আনা যাক।

১৫ সেপ্টেম্বর, ১৯৮৬। রাত তখন প্রায় দশটা। পার্কস্ট্রিট থানার দক্ষ অফিসার ইনচার্জ বিনয় মুখার্জি টেবিলে ঝুঁকে পড়ে ফাইল দেখছেন। হঠাৎ টেবিলের কোণায় রাখা টেলিফোনটা ঝন-ঝনিয়ে বেজে উঠল।

কি যে কথা হল টেলিফোনে কাক-পক্ষীতেও জানতে পারল না। কিন্তু ও.সি. বিনয়বাবু তড়িৎ-গতিতে উঠে দাঁড়ালেন চেয়ার থেকে। নির্দেশ দিলেন-'বাহিনী সাজাও।' তৈরি হল জীপ। ৬ জন কনস্টেবল নিয়ে অসম সাহসী বিনয় মুখার্জি নিজে রাত্রিকালীন অপারেশনে বের হলেন।

পার্কস্ট্রিটের 'হেয়ার-ও-হলের' কথা সকলেই জানেন। স্কুলের পাশেই একটি মসজিদ। হেয়ার-ও-হল স্কুলের পাশের বাড়িতে পার্কস্ট্রিট পুলিশ হানা দিল রাত ১১টায়। সেখানে তখন মিসেস ডি সুজা, আদোয়ানি, গার্ডেনরিচ পাইপ রোডের খুরশিদ বেগম, নির্মল আগরওয়াল, এবং কমল কুমার সিং, কুকর্মে লিপ্ত। পরদিন ১৬.৯.৮৬ তারিখে কলকাতার ব্যাংকশাল কোর্টে কেস নং-পার্ক স্ট্রিট থানা ৫৫৪/তারিখ ১৫.৯.৮৬ আণ্ডার সেকশন ৩৪৩/৩/৪/৫/৭ ইমমরাল ট্রাফিক অ্যাক্ট অনুযায়ী ধৃতদের চালান করা হল। কিন্তু মিসেস ডিসুজা এবং আদোয়ানি এখন পলাতক।

পুলিশ সূত্রানুযায়ী জানা গেছে, ধৃতা খুরশিদ বেগম, ধৃত তিন পুরুষ অভিযুক্তর কাছে ৩০০ টাকা নিয়ে শরীর বিক্রি করছিলেন। কিন্তু এই বাড়িটির কাজ কারবার চালাতেন মিসেস ডিসুজা। আর বাঙালি বাবু কালচারের ঢেউ লাগা তিন অবাঙালি নির্মল, বিনোদ এবং কমল, শরীর-নির্ভর রঙীন দিনকে পেতে চেয়েছিল অর্থ, কৌলিন্যের উষ্ণ সান্নিধ্যে। খুরশিদ বেগমের স্বীকারোক্তি মোতাবেক জানা যায়-তাকে সাত, বারো, এবং পনেরো সেপ্টেম্বরের মোট তিনদিন ব্যবসায় ব্যবহার করা হয়েছে। ভাবতে পারা যায়, অভিযুক্ত ক্ষেত্রটির একদিকে স্কুল এবং অন্যদিকে মসজিদ! এরই মাঝখানে চলছে বাবু-বিবিদের শরীরের বিকিকিনি খেলা।

অন্য ঘটনাটি ২ নং উড স্ট্রিটের। ১৩ অক্টোবর রাত্রি আটটা। কলকাতা পুলিশের দুই দক্ষ অফিসার ব্রজেশ্বর ভট্টাচার্য এবং স্বপন চক্রবর্তী ২ নং বাড়ির ৯ তলায় হানা দেন। তখন তাদের সঙ্গে ছিলেন সার্জেন্ট শান্তি ঘোষ ও আর পি সিং।

ন' তলার বন্ধ ঘরের দরজায় আওয়াজ করার পর, দরজা খুলে বেরিয়ে আসে ২১ বছরের খ্রীষ্টিনা হোয়াইট। সে চিৎকার করে বলে, 'আমাকে বাঁচান, ওরা আমার সর্বনাশ করছে।' ঘরে ঢুকতেই দেখা যায়-আসবাব ওল্টানো, দুটো বীয়ারের বোতল উল্টে পড়ে আছে। পুলিশ ওই ঘর থেকে আয়ুবখান এবং পিন্টু সিংকে গ্রেপ্তার করে। তাদের কাছ থেকে পুলিশ জানতে পারে, ওই পাপ-ব্যবসা চালায় একজন মহিলা। তার বয়স ৫০। নাম অ্যানিটা টমাস। তখনই বাথরুমে লুকিয়ে থাকা মালকিন অ্যানিটাকে পুলিশ গ্রেপ্তার করে। তার বিরুদ্ধে পার্কস্ট্রিট থানা মামলা করে-পি এস ৫৯৭ তাং ১৩.১০.৮৬ আণ্ডার সেকশন ৩৬৫, ৩৬৬, ৩৬৮, ১১৪ আই পি সি (অ্যাবডাকশান ও কনফাইনিং)।

পুলিশের কাছে খ্রীষ্টিনা বলে যে, তাদের বাড়ি মাঝেরহাট। ওরা ভীষণ বড়লোক। সে ১১ ক্লাশ পর্যন্ত সেন্ট টমাস স্কুলে পড়েছে।

খ্রীষ্টিনার সঙ্গে প্রথম আলাপ হয় ২৮ বছরের আয়ুবখানের সঙ্গে। আয়ুবখানের ক্যাসেটের ব্যবসা। অগাধ টাকা পয়সা। এক সপ্তাহের আলাপেই আয়ুব, খ্রীষ্টিনার বিশ্বাস অর্জন করে। তারপর আয়ুবের সঙ্গে সে মাঝে মাঝে দেখা করত। হোটেলে খাওয়া দাওয়াও চলতো।

একদিন আয়ুব তাকে বলে যে, সে তার বন্ধু পিন্টুর সঙ্গে আলাপ করিয়ে দেবে। পিন্টু খুবই ভালো ছেলে। বন্ধু হিসেবে বিশ্বস্ত।

ওই ঘরটি আসলে অ্যানিটা টমাসের। পুলিশের মতে সে কয়েক বছর ধরেই এই পাপ-ব্যবসা চালায়। পিন্টুর সঙ্গে তার নাকি চুক্তি ছিল, এই খ্রীষ্টিনাকে সে তুলে দেবে। বিনিময়ে পাবে বেশ কিছু টাকা। সেদিনের ভাড়া হিসেবে টমাসকে ১০০ টাকা দিয়েছিল।

কলকাতার জন্মের প্রথম দিকে অর্থাৎ আজ থেকে প্রায় ২৯০ বছর আগে এই বাড়িটি ছিল জমিদারবাবুর বাগানবাড়ি। তারপর আধুনিকতা আক্রমণ করেছে পুরাতনকে। বাগানবাড়ি পরিণত হয়েছে ফ্ল্যাট বাড়িতে। দু'পাশের শূন্য মাঠে স্থাপিত হয়েছে রাস্তাঘাট, লোকালয়। গাছ-গাছালির বন্য আবহাওয়া নেই। তবু বাগানবাড়ির শেষ চালচিত্রের গরম বুনো হাওয়াএখনও রয়ে গেছে। ভদ্রবাড়ির আড়ালে চালানো হচ্ছে গুপ্ত পতিতা-বাস। বাবু কলকাতার কলংক হয়ে।

এবার ফিরে যাওয়া যাক, কলকাতা ছড়িয়ে শহরতলীর সমুদ্রশাসিত এলাকা ডায়মণ্ডহারবারের দিকে। বন্দর উপনগরী হিসাবে ডায়মণ্ডহারবার গড়ে উঠছে বেশ ভাল ব্যবসায়িক ভবিষ্যৎ নিয়ে। কলকাতার বাবুরা তো বটেই, হাতে পয়সা এলে মফঃস্বল শহরগুলির বাবুরাও আসেন। স্বভাবতই যারা বেড়াতে আসেন তাদের মুখ্য উদ্দেশ্যই থাকে বিনোদন। এবং যথারীতি ব্যবসায়িক পথে সে প্রয়োজনের সমাধান ব্যবস্থাও এখানে বড় চমৎকার।

বর্তমান প্রতিবেদক পুজোর ছুটির সুবাদে এই প্রতিবেদনের উদ্দেশ্যে দু দিনের জন্য সমুদ্র-তটে এসেছিল। সেখানেই সপ্তমীর দিনে আলাপ হল মধুময় সাহা-র সঙ্গে। অবশ্য নামটি কাল্পনিক বা সত্যি যা কিছু হতে পারে। কেন না তিনি আমাকে যে নাম বলেছিলেন, আমি তাই ব্যবহার করেছি মাত্র।

জিজ্ঞাসা করেছিলাম তাকে।

মধুময়বাবু আপনি থাকতে এরকম একটা জায়গায় নিরিমিষ কাটাতে হবে?

মধুময় সাহা বিনয়ের অবতার। তবু তার চোখে ধূর্ততার ছায়া। সন্তর্পনে চারদিকে তাকিয়ে, তিনি আমার কানের কাছে মুখ এনে বললেন, রেস্ত কত খরচা করবেন?

কেন, রেস্ত-র কথা আগেভাগে কেন?

–যেমন রেস্ত, তেমন জিনিস, তেমন পরিবেশ।

–পরিবেশ! সেটা আবার কি?

–আরে মশাই পরিবেশই তো এসব ব্যাপারে সব কিছু। জবরদস্ত পরিবেশ ছাড়া কি মৌজ আসে? আর নেহাৎ মৌজের জন্যই তো ঘর ছেড়ে পরের কাছে দৌড়নো।

কথা শেষ করেই হেঁ হেঁ করে হাসে মধুময়। হাত কচলায়। আমি দরদাম করি ব্যবসাটার তালতবিয়ৎ এবং ঘাতঘোঁৎ জানার জন্য।

–কত টাকায় কি রকম বস্তু মেলে?

–পঞ্চাশ টাকায় বাজারি ঘর, বাজারি জিনিস, ১০০ দিলে ভাল ঘর-ফ্যান লাইট আছে। দেড়শ টাকার উর্ধে ফ্ল্যাট এবং অ্যাপার্টমেন্ট। তাতে সফ্ট মিউজিক পাবেন। ৫০০ টাকা খরচ করলে হার্ড ড্রিংক্স সেই সঙ্গে স্ট্রিপটিজ নাচ।

–স্ট্রিপটিজ নাচ?

–হ্যাঁ। কেন শোনেন নি?–এটুকু জিজ্ঞেস করেই মধুময় খানিক হেসে আমাকে অবাক করে আউড়ে দিল কবিতার কয়েকটি আশ্চর্য লাইন–

তখনই হোটেলে
মহারানী আর মন্ত্রীদের সামনে
একটা একটা করে পোষাক খুলতে খুলতে
অকস্মাৎ
নীবিবন্ধ ছিঁড়ে
কলকাতা একদিন কল্লোলীনি তিলোত্তমা হয়ে যায়।

আমার স্তম্ভিত মুখের সামনে মধুময় সাহা নামক 'মেয়ে ও ভোগ-আবাসের' দালালটি, তামাম সভ্যতাকে যেন বুড়ো আঙুল দেখিয়ে হাসতে থাকে। মধুময়ের সঙ্গেই আমি ওখানকার তিনটি ঘরে যাই। প্রত্যেকটির পরিবেশ ভদ্র এবং আধুনিক। এ এক আরামদায়ক আশ্রয়স্থল। আর সবচেয়ে আশ্চর্যের বিষয় হল এগুলি দিনে খামার বাড়ি বলে ব্যবহৃত হয়। মালিকানায় থাকে ডাকসাইটে বড়বাবুর দল।

বাগানবাড়ি সেকালে ছিল, শিল্প-সংস্কৃতির আশ্রয় স্থল। ব্যারাকপুর বাগানবাড়িতে বসে সাহিত্য সম্রাট বঙ্কিম চন্দ্র উপন্যাস রচনা করেছিলেন। আজকের বাগানবাড়িতে শুধু নারীমাংসের শরীর আর অপরাধের আশ্রয়স্থল। সমাজ আর কত নিচে নামবে। আমরাই বা কত নিচে নামতে দেব? তবু মানুষ উত্তরণের আশায় টিঁকে থাকে। 'অসতো মা সদগময়'–সে তো তারই জন্য। আমরা এই অবক্ষয় পার হয়ে যাওয়ার স্বপ্ন দেখি।

ছবি: সুস্মিতা চৌধুরী, মনমোহন শর্মা, সি এন এস, সজল মুখার্জি।

প্রৌঢ় গান্ধীজীর প্রেমে অভিজাত বিদেশিনী !

লণ্ডনের অভিজাত সম্প্রদায়ের এক উচ্চ শিক্ষিতা সুন্দরী তরুণী প্রৌঢ় গান্ধীজীকে ভালোবেসেছিলেন। ভালোবেসে তিনি গান্ধীজীর আশ্রমে আসেন, গান্ধীজীর সত্যাগ্রহে অংশ নিয়ে কারাবরণ করেন এবং ভারতের মাটিতেই মৃত্যুবরণ করেন। দুজনের মধ্যে ঘনিষ্ঠতা, পত্রালাপ (গান্ধীজীর ভাষায় 'লভ লেটার্স'), অভিমান, বিচ্ছেদ– এইসব কাহিনী সার্থক উপন্যাসের মতো। যদিও তা সত্য এবং সম্পূর্ণ বাস্তব।

কিন্তু কে এই মহিলা ?

পরিচয় দেবার আগে ভদ্রমহিলাটিকে একটু এক বিখ্যাত রাজপুরুষের চোখ নিয়ে দেখে নেওয়া যাক।

এই রাজপুরুষ আর কেউ নন, স্বয়ং ভাইসরয় লর্ড আরুইন। তখন ভাইসরয় আরুইনের সঙ্গে গান্ধীজীর আলোচনা চলছে, বিষয়-ভারতের স্বায়ত্তশাসন। পূর্ণ স্বরাজের স্লোগান তখনও কংগ্রেস তোলেনি। আলোচনা চলে দীর্ঘ সময় ধরে এবং প্রায় পনের দিন চলেছিল এই আলোচনা। এরই পরিণতি গান্ধী-আরুইন চুক্তি।

সে যাক। লর্ড আরুইন দেখেন, আলোচনা চলতে চলতে গান্ধীজীর দুপুরের খাবার সময় হয়ে আসে। তখন এক ইংরেজ মহিলা তাঁর খাবার নিয়ে আসেন। বয়স প্রায় চল্লিশ। অপূর্ব সুন্দরী এবং অভিজাত। লম্বায় প্রায় ছ' ফুট। তিনি এসে গান্ধীজীকে খাবার দেন। আর খাবার বলতে কিছু শাক-সবজি সেদ্ধ, আর সামান্য কিছু ফল।

লর্ডআরুইন দেখেন, ভদ্রমহিলা এসে ভারতীয় রীতিতে হাঁটু গেড়ে বসে খাবারের থালাটি এগিয়ে দেন, যেন পূজা নিবেদন করছেন। পরে জানতে পারেন, গান্ধীজীর এই সামান্য খাবার তাঁর নিজের হাতে তৈরি।

লর্ড আরুইনের হঠাৎ মনে পড়ে, এঁকে লণ্ডনে কোথাও দেখেছেন। হ্যাঁ, সুন্দরী হিসেবে এঁর খুবই খ্যাতি এবং তখন চারদিকে প্রণয়ীদের ভিড়। ভদ্রমহিলা ছ'টি ভাষা জানতেন। ইউরোপীয় ক্ল্যাসিক সঙ্গীত ও সাহিত্য জানতেন, বিশেষ করে বিটোফেন। কিন্তু আজ পরেছেন খদ্দরের শাড়ি, যেন সন্ন্যাসিনী! নামটি মনে পড়ে গেল লর্ড আরুইনের-ম্যাডেলিন স্লেড।

আশ্চর্য ঘটনা! লণ্ডনের অভিজাত, ধনী, শিক্ষিত তরুণরা যাঁর পাত্তা পেত না, সেই মিস স্লেড গান্ধীজীর কাছে! এবং এই রূপে!

তা হলে সত্য উপন্যাসের চেয়েও বিস্ময়কর হয়! কিন্তু প্রৌঢ় গান্ধীজীর সঙ্গে সম্পর্কটা কেমন?

দু'একটি চিঠির আংশিক অনুবাদে চোখ রাখলেই বিষয়টি পরিষ্কার হবে। গান্ধীজী তখন

গান্ধীজী এবং তার সঙ্গিনী, মিস ম্যাডেলিন স্লেড।

প্রেম একটি পবিত্র বেদনা, পবিত্র উচ্ছ্বাস। মিস ম্যাডেলিন স্লেড এরকমই এক পবিত্র আকাঙ্খায় শিহরিত হয়েছিলেন মহাত্মা গান্ধীর জন্য। এই অভিজাত বিদেশিনী **মিস** স্লেড থেকে মীরা বেন হলেন খোদ গান্ধীজীর ইচ্ছায়। গান্ধী-বেনের ব্যক্তিগত চিঠিপত্র থেকে পারস্পরিক প্রেম-ভক্তি-ভালবাসার অপ্রকাশিত **চিত্রটি তুলে** এনেছেন বর্ষীয়ান সাংবাদিক মৃত্যুঞ্জয় **মাইতি।**

ভীষণ ব্যস্ত, গ্রাম থেকে গ্রামে সফর করছেন খাদি প্রচারের জন্য। প্রায় প্রতিদিনই মিস স্লেড চিঠি লেখেন গান্ধীজীকে। অত্যন্ত ব্যস্ততার মধ্যেও গান্ধীজী উত্তর দেন : 'আমি কাছে নেই–এই বেদনা তুমি অনুভব করছ। তবে তুমি এটা কাটিয়ে উঠবে। সামান্য কয়েক দিনের বিচ্ছেদ দীর্ঘ জীবনের (ভালবাসার) প্রস্তুতি। মৃত্যু আমাদের কাছে এই দীর্ঘ দিনের আয়ু এনে দেয়, আর মৃত্যু মানেই বড় মধুর, সেটা যেন অন্য এক জীবন।'

গান্ধীজীর আর একটি চিঠি 'আজকের চলে আসাটা বড় বেদনার। কারণ আমার মনে হ'ল, তোমার মনে আঘাত দিয়েছি। আমি কি চাই জানো? আমি চাই, তুমি একজন পরিপূর্ণ নারী হয়ে ওঠো– (আই ওয়ান্ট ইউ টু বি দি পারফেক্ট ওম্যান) তুমি আমার সঙ্গে সব সময় লেগে থেকো না (ইউ মাস্ট নট ক্লিং টু মি ইন দিস বডি)। আমার মন, আত্মা সব সময় তোমার সঙ্গে আছে। (দি স্পিরিট, উইদাউট দি বডি ইস এভার উইথ ইউ)। রক্তমাংসের শরীরের অতীত যে আত্মা, সেই আত্মাই পরিপূর্ণ। এই আত্মাই আমাদের কাম্য। এবং তা আমরা পেতে পারি, যখন মন আসক্তি শূন্য হয়, যখন আমরা নিরাসক্ত হওয়ার অভ্যাস করি। এই চেষ্টা তুমি অবশ্যই করবে। আমি হলে এক্ষেত্রে তাই করতাম।'

১৯৩০ সালের ১২ মার্চ। গান্ধীজী চলেছেন ডাণ্ডি অভিযানে, লবন আইন ভাঙতে। মিস স্লেডকে তিনি বারণ করেছেন, ভারতবর্ষের রাজনীতিতে নিজে জড়াবে না। কিন্তু জেলে গিয়ে প্রথম যে চিঠিটি গান্ধীজী লিখলেন, সেটি মিস স্লেডকে।

ইতিমধ্যে মিস স্লেডের মা মারা গেছেন। গান্ধীজী বুঝতে পারলেন, মিস স্লেডের পক্ষে এ আঘাত বড় কঠিন। এই সময় গান্ধীজী তাঁকে যে সব চিঠি লিখেছিলেন তা করুণ এবং সহানুভূতিতে পরিপূর্ণ। কিন্তু তার মধ্যেও এমন উপদেশ আছে, যাতে গান্ধীজী বলছেন–'আমাকে নয়– ভালবাসো আমার আদর্শকে। তুমি তোমার গৃহ, অনুরাগী ভক্তবৃন্দ, সমাজ, দেশ সব ছেড়ে এসেছ, ব্যক্তিগতভাবে আমাকে সেবা করার জন্য নয়– (নট টু সার্ভ মি পারসোনালি বাট টু সার্ভ দি কজ, স্ট্যাণ্ড ফর) কিন্তু সব সময় ব্যক্তি আমিকেই তুমি তোমার ভালোবাসা, প্রেম উজাড় করে দিতে চাও (অল দি টাইম ইউ আর স্কোয়ানডারিং ইওর লাভ অন মি পারসোনালি) এবং তাতে আমি নিজেকে অপরাধী মনে করি। আর তাই তো তোমার সামান্য কিছুতেই (ব্যতিক্রম) আমি রেগে উঠি।'

কিন্তু মিস স্লেড কি চান এই প্রৌঢ়, প্রায় বৃদ্ধ গান্ধীজীর কাছে? না, বেশি কিছু না। শুধু তাঁকে
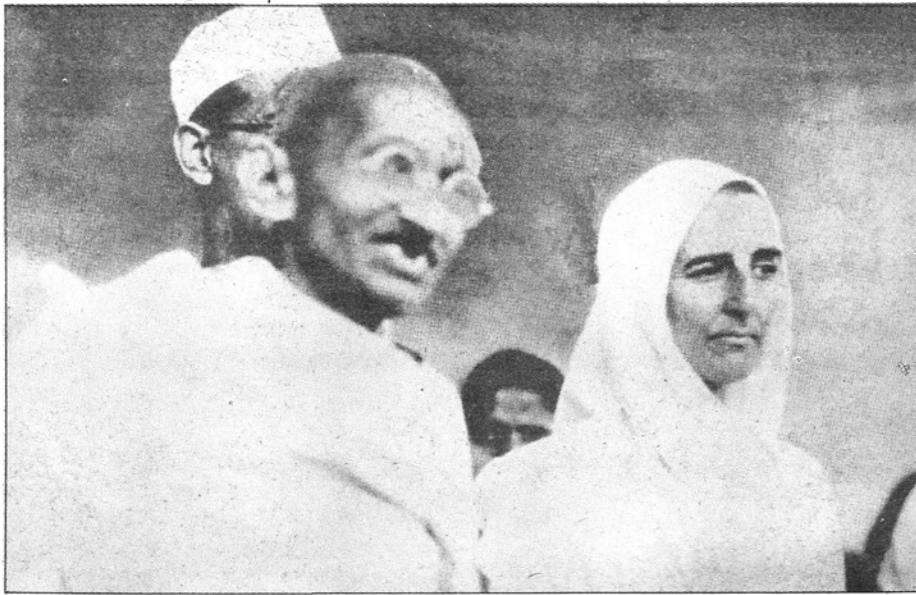
গান্ধীজীর সঙ্গে : লণ্ডনের গোলটেবিল বৈঠকের জন্য ভারত ত্যাগের পূর্বে

একটু সেবা করার সুযোগ, তাঁর কাছে আসার আনন্দের অধিকার। এই মহীয়সী নারী ধৈর্যের পরীক্ষায় একদিন উত্তীর্ণ হয়েছিলেন। গান্ধীজীর সঙ্গে জেলে গিয়ে কি আনন্দ তাঁর! ক্রমে ক্রমে গান্ধীজীকে সেবা করার, তাঁর জন্য নিজের হাতে খাবার তৈরি করার, তাঁর খদ্দরের ধুতিচাদর কেচে দেবার সুযোগ পেলেন। গান্ধীজীরও ভাল লাগে এখন মিস শ্লেডের হাত থেকে সেবা নিতে। মিস শ্লেড মনে করেন, গান্ধীজীর কাজ করা বড় পবিত্র। সামথিং অফ হলিনেস ইন দিস টাস্ক। কিছুকাল পরে আমেরিকায় সাংবাদিকদের এক প্রশ্নের উত্তরে তিনি পরিষ্কার বললেন—তোমাদের আছেন যীশুখ্রীষ্ট আর আমার আছেন গান্ধী, যাঁকে আমি যীশু বলেই মনে করি। 'ইউ হ্যাভ ক্রাইস্ট,টু মি গান্ধী ইস ক্রাইস্ট।'

গোলটেবিল বৈঠকে যোগ দিতে গান্ধীজী (১৯৩৪) লণ্ডনে গেলেন, মিস শ্লেডও সঙ্গে যান। সাংবাদিকরা অবাক। লণ্ডন সমাজের এই অন্যতমা শ্রেষ্ঠা সুন্দরী—শেষ পর্যন্ত কালা আদমী গান্ধীর সঙ্গে! ডজন ডজন রিপোর্টার ঘিরে ধরলেন তাঁকে। প্রশ্নের পর প্রশ্ন—কি ব্যাপার? আপনি কি হিন্দু হয়ে গেছেন? একজন সাংবাদিক তো প্রশ্ন করে বসলেন ব্রহ্মচর্য সম্পর্কে। মিস শ্লেড ধীর-স্থির ভাবে উত্তর দিলেন—গান্ধীজীর কাছে ব্রহ্মচর্য কেবল যৌনগত ব্যাপার নয়—গান্ধীস্ কনসেপ্ট অফ সেলিবেসি নট ওনলি দি সেক্সচুয়াল সাইড বাট অ্যাবস্টিন্যান্স ইন আদার ফিজিক্যাল ডিজায়া-রস। জীবনের অন্য ক্ষেত্রেও সংযম বোঝায়।

—আপনার ধর্ম কি?

—গান্ধীজীর ধর্মই আমার ধর্ম। সেটা হ'ল সেবা ধর্ম। রিলিজিয়ান অফ সারভিস। কিন্তু আমি হিন্দু নই। হিন্দুদের দেবতাকে বর্ণনা করা বড় কঠিন। তবে আমার কথা, এক কালে যীশু-খ্রীষ্ট ছিলেন, বুদ্ধ ছিলেন। এখন গান্ধীজী আছেন। না, তাঁর বক্তৃতায় কোন আবেগ নেই। সাংবাদিকদের ইংগিতপূর্ণ কথায় তিনি স্থির। লণ্ডনের চরম অভিজাত সম্প্রদায়ের এই তরুণী-উইনস্টন চার্চিল যাঁর ঘনিষ্ঠ আত্মীয়, তিনি যেন এক সন্ন্যা-সিনী, শান্ত, পবিত্র অনুদ্বিগ্ন। তখন লণ্ডনে পার্টি জিতে এসেছে নির্বাচনে। এতো বড় খবর। কিন্তু সংবাদপত্র জগতে তখনও মিস শ্লেড অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ খবর। কেউ বললেন উনি 'মিস্টিক'। কোথায় গেছে সেই জাঁকজমকপূর্ণ বিলাসিতা। এখন খালি পা, মাথায় ছোট ছোট চুল, খাদির শাড়ি পরা। তিনি খুঁজে পেয়েছেন তৃপ্তি, শান্তি, নিরা-পত্তা—'সি সিমস টু কনটেন্টমেন্ট, অ্যাণ্ড সিকিউ-রিটি।'

গান্ধীজীর বাণী প্রচার করার জন্য আমে-রিকা গেছেন মিস শ্লেড। উঠেছেন হেনরি স্ট্রীট সেটেলমেন্ট হাউসে। রাত্রে ঘুমান মেঝেতে, খাট থাকা সত্ত্বেও। টেবিল থাকা সত্ত্বেও চিঠি লেখেন মেঝেতে বসে—যা গান্ধীজী করে থাকেন। 'নিউ ইয়র্ক টাইমস'-এর রিপোর্টার লিখলেন—পায়ে সাধারণ চপ্পল। মোজা নেই। এই অবস্থায় সেই বিখ্যাত ভদ্রমহিলা, যিনি গান্ধীজীর শিষ্যা বলে পরিচিতা, তিনি হোয়াইট হাউসের মধ্যে প্রবেশ করলেন।'

গোলটেবিল বৈঠকে যোগ দিতে গান্ধীজী (১৯৩৪) লণ্ডনে গেলেন, মিস শ্লেডও সঙ্গে যান। সাংবাদিকরা অবাক। লণ্ডন সমাজের এই অন্যতমা শ্রেষ্ঠা সুন্দরী-শেষ পর্যন্ত কালা আদমী গান্ধীর সঙ্গে! ডজন ডজন রিপোর্টার ঘিরে ধরলেন তাঁকে। প্রশ্নের পর প্রশ্ন, কি ব্যাপার?

রুজভেল্ট তখন আমেরিকার প্রেসিডেন্ট। মিসেস রুজভেল্টও একজন সমাজ সেবিকা। দুজনেই অভিজাত। দেখতে দুজনেই লম্বা। জানা যায়, প্রথম সাক্ষাতেই দুজনকে দুজনেরই ভালো লেগেছিল।

বেরিয়ে আসার সময় সাংবাদিকদের কিছু প্রশ্ন করার আগেই মিস শ্লেড বললেন—কম পয়-সায় নিরামিষ খাবার পাওয়া যায় কোথায় বলতে পারেন? হোয়াইট হাউসের কাছেই ভেজিটেরিয়ান মিল পাওয়া যায়—এমন একটি হোটেল ছিল। মিস শ্লেড ধীর পদক্ষেপে সেই হোটেলের দিকে চলে যান।

কি ভাবে কোন যৌবন-অরণ্যের পথ বেয়ে মিস শ্লেড এমন মহীয়সী নারী হয়ে উঠলেন? গান্ধীজী যাঁকে প্রথম লিখেছিলেন, 'আমার গায়ে লেপটে থেকো না'—যাকে চিঠিতে বার বার আঘাত করেছেন,কাছে থেকে দূরে সরিয়ে দিয়েছেন এক অখ্যাত দুর্গম গ্রামে কাজ করার জন্য, তিনি এক-দিন কোন সকালের রৌদ্রালোকে এসে দাঁড়ালেন বিজয়িনী রূপে! গান্ধীজীর অনশনের কথা শুন-লেই যাঁর দু চোখ বেয়ে জল পড়ত, এতো দুর্বল, অভিমানী ছিলেন যিনি, কোন সাধনার দুর্গম পথ বেয়ে এসে, গান্ধীজীকে অনশনে মৃত্যুর মুখে দেখেও তিনি স্থির, শান্ত! বরং নিজেই কস্তুরবাকে সান্ত্বনা দেন—'না বা, (কস্তুরবা), গান্ধীজী এই মৃত্যু মুখ থেকেও ফিরে আসবেন—আমি জানি।'

বেশ কয়েক বছর পরে, মিস শ্লেড তাঁর স্মৃতি কথায় লিখেছেন, 'যখনি বাপুর (গান্ধীজী) কাছে যাই, এক পাশে চুপ করে বসি, তিনি নিজের মনে কাজ করে যান, কখনও কখনও একা থাকেন! কি যে ভালো লাগে। তাঁর হাতের স্পর্শ কি অপূর্ব—'আই নো নাথিং মোর এক্সকিউজিটলি জেন্টল দ্যান দি টাচ অফ বাপুস হ্যাণ্ড'—আমি দেখি, কেবল অবাক হয়ে দেখি, কি সব মজার মজার ব্যাপার ঘটে! ঘাসের উল্টোদিকটাতে চিঠি লিখে-ছেন, এক টুকরো ছোট্ট পেনসিল—ওরে বাবা, হারানো চলবে না। কোন কিছু অপব্যয় নয়—সব খাদির কাজে, হরিজনদের কাজে লাগবে।'

তারপর ক্লান্ত গান্ধীজী এক সময় মেঝেতে শুয়ে পড়েন। চশমাটা খুলে রাখেন পাশে। কয়েক মিনিটের মধ্যেই তিনি গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন। আমার তো তখন কোন কাজ নেই। কিছু একটা নিয়ে মাছিগুলো তাড়াই, যাতে ওর ঘুমের ব্যাঘাত না ঘটে। সত্যিকারের গান্ধী আশ্রম হ'ল, বাপুর এই কয়েক স্কোয়ার ফুট জায়গা—যেখানে ওঁর বসার গদিটা পড়ে আছে, আর লেখার জন্য ছোট্ট একটা ডেস্ক, এইটিই প্রকৃত অর্থে গান্ধী আশ্রম।

আশ্চর্য! মিস শ্লেড গান্ধীজীর কাছে এলেন যেন কবে? দেখতে দেখতে কুড়িটা বছর কেটে

গেল ! কবে সেই 'অ্যাঙ্গেল ফেস'কে তিনি ভালোবেসেছিলেন !

আর গান্ধীজী ?

১৯৩৮ সালের ডিসেম্বরে লিখছেন–ওর চিঠি পাওয়া আমার প্রতিদিনের প্রতীক্ষা–

'হার ডেইলি লেটার ওয়াজ অ্যান ইগারলি এওয়েটেড ইভেন্ট।'

মিস ম্যার্ডেলিন ছিলেন অ্যাডসীরানা স্যার এডমণ্ড শ্লেড কে এ আই ই–এর মেয়ে। জন্ম ১৮৯২ সালে। ইস্ট ইণ্ডিজের নৌ বাহিনীর এক স্কোয়াড্রনের সর্বাধিনায়ক হয়ে তিনি অবসর নিয়ে চলে আসেন। লণ্ডনের বাইরে গ্রামের বাড়িতে বাস করতে লাগলেন তিনি। এই সময় মিস শ্লেডের বয়স পনের। গান, খেলাধুলা, শিকার, বাগান করা–এসবের দিকে নজর। অপূর্ব সুন্দরী। মাথাভরা চুল, সুন্দর চোখ। তাঁকে ঘিরে অভিজাত তরুণদের ভিড়। দেখতে দেখতে সোসাইটি মহিলা হয়ে উঠলেন তিনি। ছটি ভাষা শিখলেন। কিন্তু কিছু যেন তিনি খুঁজে বেড়ান। কোথাও তা পান না। সেই একই ধরনের পাখি, একই ধরনের ধোপ-দুরস্ত মানুষ, একই ধরনে শিকারে যাওয়া, ঘোড়ায় চড়া–সেই গতানুগতিক জীবন। 'অল ওয়াজ হেভি ডাল।' বিরক্তিকর। তারপর যুদ্ধের ফলে 'সেক্সচুয়াল মর‍্যালস'–এর ধারণা পাল্টে গেছে। তাঁর চারপাশের জীবনধারার মধ্যে কোথাও আলোর ধারা নেই। চারদিকে 'সেক্স' এবং 'লিকার' –এর উৎসব। এই কি জীবনের রূপ !

১৯২৩ সালে তিনি কয়েক দিনের জন্য প্যারিসে বেড়াতে যান। একদিন একটি বইয়ের দোকানের শো-কেসে এ রোমা রোলাঁর লেখা একটি বই দেখতে পান। বইটির নাম 'গান্ধী'। গান্ধীজীর জীবন ও আদর্শের ওপর রোলাঁর মন্তব্য। রোলাঁ বলছেন–গান্ধীজী অসীম ধৈর্য ও প্রেমের প্রতিমূর্তি–'একসপ্রেশান অব ইনফিনিট পেসেন্স অ্যাণ্ড ইনফিনিট লভ'। বইটি পড়ে মিস শ্লেডের মনে হল, এতদিনে তিনি যেন আলোর সন্ধান পেয়েছেন। ঐ গান্ধীর আশ্রমেই যেতে হবে।

কথাটা শুনে সবাই হেসে খুন–পাগল না আর কিছু ? মিস শ্লেড চিঠি লিখলেন গান্ধীজীকে, তাঁর সবরমতী আশ্রমে থাকতে চান তিনি। গান্ধীজী লিখলেন–ভয় পাইয়ে দিচ্ছি না তোমাকে, তবে সাবধান করে দিচ্ছি। কারণ আশ্রম-জীবন বড় কঠোর।

মিস শ্লেড শোনার পাত্রী নন। আশ্রম জীবনে কত কষ্ট হয়–তা বাস্তবে দেখার জন্য এক বছরের মেয়াদ নিয়ে চললেন সুইডেনের এক গ্রামে। সেখানে এক কৃষি পরিবারে কাজ করলেন। তারপর ১৯২৫ সালের নভেম্বরে বেরিয়ে পড়লেন ভারতের উদ্দেশ্যে এক জাহাজে।

ইতিপূর্বে দিল্লি থেকে সংগ্রহ করা, খদ্দরের কাপড় থেকে দরজিকে দিয়ে গাউন তৈরি করিয়ে রেখেছেন। অভ্যেস করলেন হাঁটু গেড়ে বসতে। ভারতীয় প্রথায় প্রণাম করতে।

এসে পৌঁছলেন ভারতে। গান্ধীজীর সেক্রেটারি মহাদেব দেশাই এবং আরো কয়েকজন গেলেন তাঁকে আনতে। ট্রেন থেকে নামলেন মিস শ্লেড।

রাজপুতনা জাহাজে গান্ধীজীর সঙ্গে।

অপূর্ব সুন্দরী, অভিজাত ইংরেজ মহিলা। গলায় অকসফোর্ডের ইংরেজি উচ্চারণ। জাহাজেই আগেকার দামী পোশাক পুড়িয়ে দিয়েছেন। শ্রী দেশাইকে জিজ্ঞেস করলেন–সবরমতী কদ্দুর ? তাঁকে ক্লান্ত দেখাচ্ছিল। শ্রী দেশাই শুধু একটু হাসলেন, সবরমতী নদীর ওপর সেতুটা পেরিয়ে এলেন তাঁরা। পেরিয়ে এলেন একটি মাঠ, যেখানে চাষীরা কাজ করছে। এমন সময় মিস শ্লেড দেখতে পেলেন দূরে কয়েকটা মাটির ঘর।

শ্রী দেশাইয়ের পেছনে পেছনে চলছেন মিস শ্লেড। একটা ঘরের দরজা খোলা। দেখলেন, একজন রোগা মানুষ তাঁকে দেখে উঠে এগিয়ে এলেন।

মিস শ্লেড প্রণাম করলেন হাঁটু গেড়ে বসে। গান্ধীজী তাঁকে ধরে তুললেন। দেখা গেল মিস শ্লেড গান্ধীজীর চেয়ে অন্তত এক ফুট বেশি লম্বা।

গান্ধীজী চিঠির প্রাপ্তিস্বীকার করেন, কখনো ধন্যবাদ জানিয়ে বলেন, 'তোমার প্রেমপত্রগুলি পেয়েছি–আই হ্যাভ অল ইওর লভ লেটার্স।' কখনও কখনও ক্ষীণ বিরক্তি প্রকাশও করেন। কিন্তু মীরা অবিচল, যেন গান্ধীজীর মধ্যেই তাঁর জীবন–অ্যাজ ইফ ইন হিম ওয়্যার হার লাইফ।

নতুন নামও দিলেন গান্ধীজী–মীরা বেন, অর্থাৎ মীরা বহিন্। মীরা আমাদের দেশে একটি বড় প্রিয় নাম। তিনি এক 'মিস্টিক' মহিলা, নিজের স্বামীকে ছেড়ে শ্রীকৃষ্ণকে স্বামী রূপে গ্রহণ করেছিলেন। শ্রীকৃষ্ণের নামে বিষও তাঁর কাছে অমৃত হয়ে উঠত। এই নতুন মীরাকে গান্ধীজী পাঠিয়েছিলেন কস্তুরবার কাছে। বললেন, ওর জন্য থাকার জায়গার ব্যবস্থা কর। আশ্রমের অন্যান্য মেয়েদের সাথে পরিচয় করিয়ে দাও।

কেটে যায় ক'দিন। কিন্তু মীরা বেনের মনে শান্তি নেই। তিনি যে গান্ধীজীর সাথে ব্যক্তিগত সম্পর্ক চান–হোয়াট সি ওয়ানটেড ওয়াজ পিওরলি পারসোন্যাল রিলেশনসিপ উইথ হিম, হার সেন্ট (গান্ধীজী)। এবং এ চাওয়া বড় গভীর (সি ওয়ানটেড ইট উইথ ইনটেনসিটি)। গান্ধীজী তাঁর চোখে দেবতা (সি স্য হিম অ্যাজ আ ডিভিনিটি)।

মীরার আশ্রমে পৌঁছবার ক' দিন পরেই গান্ধীজী খাদি প্রচারে বেরিয়ে যান। মীরা প্রায় প্রতিদিন তাঁকে চিঠি লেখেন। কখনো-কখনো ফুলের তোড়া পাঠান। হয়ত সে তোড়া যখন ম্লান হয়ে আসছে, তখন গান্ধীজীর হাতে পৌঁছচ্ছে। (গান্ধীজী চিঠির প্রাপ্তিস্বীকার করেন, কখনো ধন্যবাদ জানিয়ে বলেন, 'তোমার প্রেমপত্রগুলি পেয়েছি–আই হ্যাভ অল ইওর লভ লেটার্স। কখনও কখনও ক্ষীণ বিরক্তি প্রকাশও করেন। কিন্তু মীরা অবিচল–যেন গান্ধীজীর মধ্যেই তাঁর জীবন–অ্যাজ ইফ ইন হিম ওয়্যার হার লাইফ।) গান্ধীজী সব বুঝতে পারেন, মীরা কি কষ্ট পাচ্ছে। এবং বুঝতে পারেন বলেই বড় রকমের আঘাত দেন না। শুধু বলেন, 'সত্যকে জান। 'স্পিরিচুয়াল লভ' কি তা কিছু বুঝি। কিন্তু তবু বলব–নিজেকে যতোটা পারো সংশোধন করে নাও। নিজেকে অনাবশ্যকভাবে বিব্রত কোর না।'

কিন্তু মীরার মধ্যে তেমন কোন পরিবর্তন আসে না। গান্ধীজী ছাড়া তাঁর জীবন যে শূন্য।

ইতিমধ্যে আশ্রম জীবনে অভ্যস্ত হয়ে উঠেছেন মীরা। একটু একটু হিন্দি বলেন, কাজকর্ম করেন। কিন্তু মনের ক্ষুধা আজও অশান্ত।

গান্ধীজী মীরাকে পাঠিয়েছিলেন উত্তর বিহারের একটি গ্রামে। সেখানে মীরা একটি গঠন কর্ম কেন্দ্র চালাবেন। যেখানে গ্রামবাসীরা সুতো কাটা, তাঁতে কাপড় বোনা, নার্সিং, ঘরদোর পরিষ্কার রাখা প্রভৃতি স্যানিটেসানের কাজ শিখবে

মীরা গেলেন। কিন্তু কি একাকীত্ব! কিছুদিন পরে শুনতে পেলেন গান্ধীজী অসুস্থ। মীরা ছুটে এলেন সবরমতী আশ্রমে। কিন্তু শুনলেন শুধু বকুনি। ফিরে এলেন আবার উত্তর বিহারের সেই গ্রামে। গান্ধীজীকে লিখলেন–আপনার তিরস্কারে আমার বুক ভেঙে গেছে–ইট ব্রোক মাই হার্ট টু বি রিপ্রুভ্‌ড। মীরা অসুস্থ হয়ে পড়লেন কিছুদিন পরে। তা শুনে গান্ধীজীর মন খারাপ হয়ে ওঠে তিনি চিঠিতে নির্দেশ দেন–মীরা কি খাবে আর আর কি খাবে না। অর্থাৎ ডায়েট চার্ট তৈরি করে দিলেন। এই সময়ই গান্ধীজী সেই সুন্দর চিঠিটি লিখেছিলেন, 'আজকের বিদায় ছিল বড় বেদনার। (দ্য পারটিং টু ডে ওয়াজ স্যাড)।

মীরা কিন্তু কালক্রমে ভুগে ভুগে শীর্ণা হয়ে ওঠেন। গান্ধীজী চিঠিতে লেখেন, না, অতো রোগা হওয়া চলবে না। তোমার চেহারাটা তো খুব লম্বা (মিস স্লেড লম্বায় ৬ ফুট ছিলেন)।

কিন্তু উপদেশ ও নির্দেশে খুব কিছু উপকার হল না। শেষ পর্যন্ত গান্ধীজী লিখলেন–আশ্রম থেকে চলে এস 'আই অ্যাম নট গোইং টু রাইট টু ইউ এভরি ডে ফর আই ফ্যানসি দ্যাট ইউ ডু নট নিড ওনলি সুদিং ওয়েনমেন্টস।' মলমে কাজ যখন হবে না, তখন গান্ধীজী মীরাকে কাছেই রাখলেন।

এদিকে মীরার বন্ধুরা ভেবে নিয়েছেন, মেয়েটার মাথা খারাপ হয়ে গেছে। কেউ কেউ ভুলেও গেলেন তাঁকে। আর কেউ কেউ ভাবলেন গান্ধীজীকে মীরা ভালোবেসে ফেলেছেন।

সত্যি কি ভালোবেসে ছিলেন? যদি তাই হয়, তবে এই ভালোবাসার রূপ কি? চরিত্র কি? মীরাও কি এ বিষয়ে সচেতন ছিলেন?

বলা বড় কঠিন–অন্তত পার্থিব ভালোবাসা, প্রেম অর্থাৎ যে সব শব্দ আমাদের অতি পরিচিত, সাহিত্যের কাহিনীতে যে সব শব্দ অতি ব্যবহৃত–তার সীমার মধ্যে এ সম্পর্ককে স্থান করে দেওয়া যাচ্ছে না। অথচ ঘটনা সত্য।

ইতিহাস এগিয়ে চলছে। ১৯৩০ সালের ২৬ জানুয়ারি পূর্ণ-স্বাধীনতার শপথ দেশ গ্রহণ করল। ঐ বছর ১২ মার্চ মহাত্মা লবন আইন অমান্য করতে চললেন ডাণ্ডি। জেল হল গান্ধীজীর। এবং জেলে গিয়ে তিনি প্রথম যে চিঠিটি লেখেন তা মীরাকেই। এতদিনে মীরা গান্ধীজীর কাজ করার সুযোগ পেলেন। গান্ধীজী তাঁকে মহিলা ও শিশুদের মধ্যে কাজ করতে বললেন। আর খাদি প্রচার। ইতিমধ্যে মীরা সন্ন্যাসিনী। তিনি খাদি পরতেনই। এবার মাথা ভর্তি সুন্দর চুলও ছেঁটে ফেললেন।
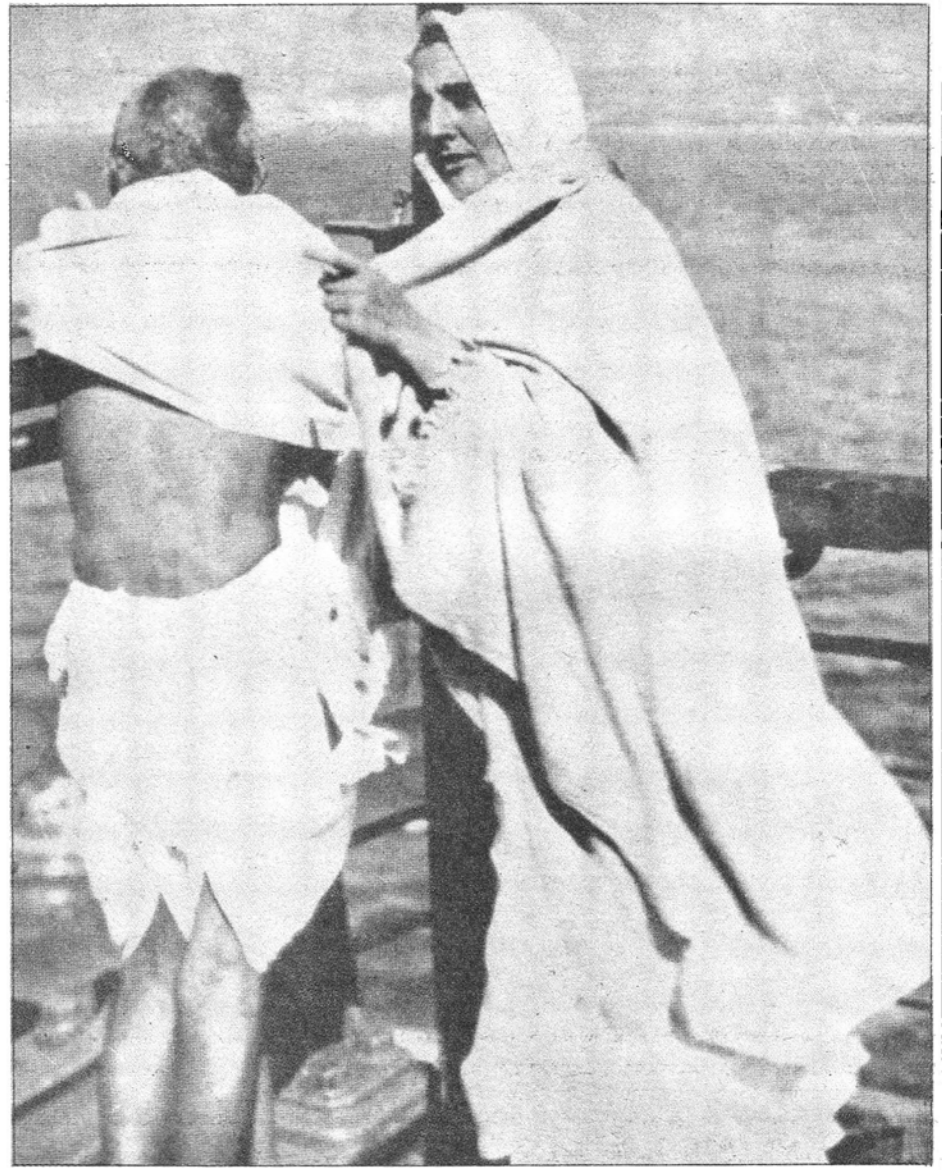
'যে ভালবাসা সত্য তার জন্য বাইরের কোন প্রচলিত প্রকাশ প্রয়োজন হয় না।'

জয় হল গান্ধীজীর। জেল থেকেও ছাড়া পেলেন। বড়লাট আরুইনের মধ্যে চুক্তি হল গান্ধীজীর। এই আলোচনার শেষে গান্ধীজী লেডি আরুইনের সঙ্গে সৌজন্যের খাতিরে দেখা করতে গেলেন। হাসতে হাসতে বললেন, প্রতিদিন এক ঘন্টা করে সুতো কাটবেন। আলোচনা যখন চলছিল, তখন মীরা গান্ধীজীর দুপুরের খাবার নিয়ে যেতেন। আর এই সময়ই বড়লাট মীরাকে দেখে চমকে ওঠেন।–লণ্ডনের সেই রূপসী, অভিজাত মিস স্লেড গান্ধীজীর খাবার আনছেন আর এমনভাবে খাবারটা দেন, যেন পুজো নিবেদন করছেন। আশ্চর্য!

গোল টেবিল বৈঠকের জন্য যখন গান্ধী লণ্ডন যান তখন মীরাও সঙ্গে গেছিলেন। ল্যাংশায়ারে উইভারদের বৈঠকে গান্ধীজী তাঁর চরকা প্রসঙ্গ নিয়ে বলছেন। শ্রোতাদের মধ্যে গান্ধীজীর জন্য কি শ্রদ্ধা, অথচ এই লোকটির জন্য ইংলণ্ডের বস্ত্রশিল্প মার খেতে বসেছে। এই বৈঠকে মীরা গান্ধীজীর পাশে চুপ করে বসে আছেন। হাত দুটি জোড় করে কোলের ওপর রাখা। আর সংবাদপত্রের রিপোর্টাররা কেবল পেছন পেছন ঘোরেন। 'মীরা হ্যাড বিকাম দ্য মোস্ট পাবলিসাইস্‌ড উইম্যান লিভিং।' লণ্ডনে গেলেও মীরা তাঁর বাবার সঙ্গে দেখা সাক্ষাৎ করেন নি। সাংবাদিকদের শুধু সংক্ষিপ্তভাবে বলেন, 'গান্ধীজীর রাজনৈতিক কাজ-কর্মের সঙ্গে তাঁর কোন যোগ নেই। আর ইংলণ্ড তাঁর কাছে এখন বিদেশভূমি। ভারতবর্ষই তাঁর স্বদেশ। আর এই যে খদ্দরের কাপড় তিনি পরে আছেন, এটা তাঁর নিজের হাতে বোনা।'

ফেরার পথে গান্ধীজী সেই সুইস পরিবারের সঙ্গে দেখা করতে গেলেন, যেখানে এক বছর কাল মীরা ছিলেন, যা ছিল আশ্রমবাসিনী হওয়ার প্রস্তুতি। দেখা হল রোমা রোলাঁর সঙ্গেও। সান্ধ্য প্রার্থনায় রোমা রোলাঁ মুগ্ধ হয়ে গান্ধীজীর সঙ্গীদের

মুখ থেকে সংস্কৃত আবৃত্তি, রামায়ণ গান শুনাতেন আর এই শেষেরটি পরিবেশন করতেন মীরা। রোলাঁর ভাষায়—'ইনটোন্‌ড ইন দ্য গ্রেভ ওয়ার্ম ভয়েস অফ মীরা।' মীরার শান্ত মূর্তি, গম্ভীর মর্যাদাবোধ তাঁর। নিজের স্বার্থ ও ঐশ্বর্যত্যাগ—রোলাঁর শ্রদ্ধা অর্জন করেছিল। দেখতে দেখতে গান্ধীজীর আশ্রমের সাথে কখন একজন হয়ে উঠেছেন তিনি। ১৯৩২ সালে মীরার জেল হয়। কস্তুরবা, সরোজিনী নাইডু এবং মীরা একই জায়গায়। কস্তুরবা মীরাকে গুজরাটি ভাষায় তাঁদের মন্ত্র ও গান শোনান। আর মীরা তাঁকে শোনান চার্চের সঙ্গীত। ক্লাসিক্যাল সঙ্গীত মীরা ভাল জানতেন। কিন্তু এই দুজনের কেউই অপরের ভাষা বুঝতেন না। কিন্তু সঙ্গীতে ভাষাটা গুরুত্বপূর্ণ নয়, যতোটা গুরুত্বপূর্ণ আসল ভক্তি ও শ্রদ্ধা। দুজনের মধ্যে এই জেলখানায় এসে এমন এক আন্তরিক সম্পর্ক গড়ে উঠল, যা বাইরে হয়নি। আর মীরার আনন্দ, তিনি গান্ধীজীর জন্য জেলে এসেছেন—টু বি ইন প্রিজন ফর বাপুস সেক—কী আনন্দ!

য়ারবেদা জেলে গান্ধীজী আমৃত্যু অনশন করছেন সাম্প্রদায়িক রোয়েদাদের বিরুদ্ধে। হরিজনদের জন্য পৃথক নির্বাচক মণ্ডলীর কথা এই রোয়েদাদে বলা হয়েছিল। কস্তুরবা ও মীরা আমৃত্যু অনশনের কথা শুনে স্তব্ধ।

অনশনের তৃতীয় দিনেই গান্ধীজীর অবস্থার অবনতি ঘটে। গান্ধীজী মীরাকে লিখলেন—আমার অনশনের কারণ তুমি উপলব্ধি করেছ জেনে আমি খুশি। জীবন ও মৃত্যুর কথা কেউ বলতে পারে না। সবচেয়ে বড় কথা হল—আমার অন্তর পবিত্র এবং হিংসা বর্জিত কিনা এবং অনশনের কারণটি যথার্থ কিনা।'

কিন্তু মীরার মন মানে না। গান্ধীজী মৃত্যুর প্রান্তে। মীরার অবস্থাও শোচনীয়। গান্ধীজী সেই অবস্থায়ও মীরাকে সান্ত্বনা দিয়ে লিখছেন, 'তোমার কথা ভেবে এই অবস্থায়ও আমি অত্যন্ত অস্বস্তি বোধ করছি। আমি আশা করি, তুমি শান্তি ফিরে পাবে—স্থির থাক। মনকে শক্ত রাখ। ঈশ্বরে বিশ্বাস হারিও না। যদি নিজের হাতে তোমাকে চিঠি লেখার ক্ষমতা আমার না থাকে তবে দেশাই (গান্ধীজীর সেক্রেটারি) তোমাকে লিখবেন।' পরদিন আবার চিঠি—'কিছুতেই ভেঙে পড়বে না। দেখবে, ঈশ্বরের আশীর্বাদ, করুণা তোমার ওপর অকৃপণভাবে বর্ষিত হচ্ছে।'

সত্যি ভারতবর্ষ এক কঠিন সংকট থেকে বাঁচল এবং জয় হল গান্ধীজীর। বৃটিশ সরকার রোয়েদাদ রদ করলেন। গান্ধীজী অনশন ভাঙলেন।

আগের অনশনের তারিখ ১৯৩২, ২০ সেপ্টেম্বর। কিন্তু মাসখানেক পরে আবার সরকারের সঙ্গে বিরোধ বাধল, এবারও হরিজন নিয়ে। আগের অনশনের জন্য স্বাস্থ্য খারাপ ছিল গান্ধীজীর। ফলে এবারে অনশনের মধ্যেই তাঁর অবস্থার অবনতি ঘটে। মীরার অবস্থা অবর্ণনীয়। গান্ধীজীকে লিখলেন—'আপনার মধ্যে যে ঈশ্বরের দূত কাজ করে চলেছেন—তা যেন উপলব্ধি করার শক্তি যেন ঈশ্বর আমাকে দেন। আপনার মধ্য দিয়ে ঈশ্বরের ইচ্ছা পরিপূর্ণ হতে গিয়ে যা-ই ঘটুক, তা যেন আমি গ্রহণ করতে পারি। এ ক্ষমতা আজ প্রার্থনা করছি। এই চরম মুহূর্তে যদি আমার ভালবাসা ব্যর্থ হয় তবে তাতে কি যায় আসে—তা কতো তুচ্ছ। 'মাই লভ উড বি এ পুওর থিং, ইফ ইট ফেল্‌ড অ্যাট দ্য সুপ্রীম মোমেন্ট।'

গান্ধীজীর বয়স কিন্তু এখন ৬৪ বছর। দেখতে দেখতে গান্ধীজী মৃত্যুর তীর প্রান্তে। কস্তুরবা এলে তাঁকে বললেন, এ যাত্রায় হয়ত বাঁচব না। তুমি কিন্তু ভাববে না, বিব্রত হবে না। কান্নাকাটিও করবে না।' সরকার গান্ধীজীকে মুক্তি দেবার কথা ঘোষণা করলেন। গান্ধী নিজে লিখতে পারেন না। তাঁর হয়ে চিঠি লিখলেন সি এফ এণ্ডরুজ। গান্ধীজী বলে বলে দিচ্ছেন : 'মাই ফাস্ট ইজ ব্রোকেন ...।'

দেখতে দেখতে দীর্ঘ দশ বছর কেটে গেল। গান্ধীজী ও মীরার মধ্যেকার সম্পর্ক এখন যেন এক পরিপূর্ণ রূপ নিচ্ছে। পৃথিবীর ইতিহাসও এক সন্ধিক্ষণে এসে দাঁড়াচ্ছে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ আসন্ন। মীরা আমেরিকা গেছিলেন, গান্ধীজীর বাণী প্রচারের জন্য। ফিরে এসেছেন। গান্ধীজীর জন্য নতুন আশ্রম গড়ে তুললেন মীরা—গান্ধীজী নাম দিলেন 'সেবা গ্রাম', 'সার্ভিস ভিলেজ', তা হল গান্ধী দর্শনের গবেষণাগার।

যুদ্ধ শুরু হয়ে গেছে। লণ্ডনে বোমা পড়ছে। গান্ধীজী আগস্ট আন্দোলন (কুইট ইণ্ডিয়া) নিয়ে মনে মনে ভাবছেন। অথচ আশ্চর্য তাঁর মূল্যবোধ। বলছেন, বৃটেনের ধ্বংস হওয়ার পরিবর্তে ভারতবর্ষ স্বাধীনতা চায় না। জাপানী সৈন্য ব্রহ্মদেশে এসে গেছে। যুদ্ধ এখন ভারতের দোরগোড়ায়। চারদিকে যেন অন্ধকার ঘনিয়ে আসছে।

এই মুহূর্তেও গান্ধীজী সকল কাজ, সকল চিন্তার মধ্যে মীরার চিঠির জন্য অপেক্ষা করেন। এই চিঠি পাওয়া তাঁর কাছে ইগ্যারলি অ্যাওয়েটেড ইভেন্ট। মীরা এখন দূরে নিজের আশ্রমে থাকেন। পর্বতের কোলে কয়েকটি ছোট্ট কুঁড়ে ঘর। গান্ধীজীর কাছে থাকেন না। এই নিয়ে কথা উঠল, গান্ধীজীর সঙ্গে মীরার সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে গেছে। কথাটা শুনে গান্ধীজী শুধু একটু মজা পেলেন। একদিন মীরাকে লিখলেন, তোমাকে একটা কথা বলি। আমার মনে সব সময় তুমি জাগ্রত আছ—'দিস ইজ জাস্ট টু ট্রেন মী টু আর নেভার আউট অফ মাই মাইণ্ড'

আর মীরা? গান্ধীজী সফরে যাচ্ছেন। অথচ মীরা তাঁর পা ছুঁয়ে প্রণাম করতে পারছেন না—এর কী দুঃখ। নেভার ইন অল দিজ ইয়ার্স হ্যাড আই নট টাচড বাপু'স ফিট বিফোর হি লেফ্‌ট ফর এ জার্নি। কিন্তু গান্ধীজী একবার বলেছেন—শ্রদ্ধার এই সব বহিঃপ্রকাশের উর্ধ্বে তুমি ওঠো—'ইউ মাস্ট রাইজ অ্যাবাভ দিজ আউটওয়ার্ড ডেমনস্ট্রেশন অফ অ্যাফেকশন।' যে ভালবাসা, শ্রদ্ধা, হৃদয় এক হয়ে গেছে তার জন্য বাইরের কোন প্রচলিত প্রকাশ প্রয়োজন হয় না।'

এল তারপর ১৯৪২ সালের বিপ্লবের দিন। গান্ধীজী টেলিগ্রাম করলেন মীরাকে—'সারা দেশব্যাপী আন্দোলনের সময় এসেছে। তুমি চলে এস।' মীরা কিন্তু বৃটিশ প্রধানমন্ত্রী চার্চিলের ঘনিষ্ঠ আত্মীয়। গান্ধীজী একদিন বললেন, 'মীরা-বিপ্লব, আন্দোলন হলে তুমি কি করবে?'

মীরা বললেন, 'ভারতবর্ষের জন্য আমি মরতে প্রস্তুত।'

'কুইট ইণ্ডিয়া' প্রস্তাব গ্রহণ করেছে কংগ্রেস। গান্ধীজীকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। তাঁর সঙ্গে কস্তুরবা, মীরা বেন, সুশীলা নায়ার—অর্থাৎ গান্ধীজীর সব সঙ্গীকেই। রাখা হয়েছে আনাখাঁ প্রাসাদে। এইখানেই গান্ধীজীর সারা জীবনের সঙ্গিনী কস্তুরবার মৃত্যু হল। মীরা বেন তাঁকে সাজিয়েছিলেন মৃত্যু বাসরের জন্য। শেষকৃত্য হয়ে গেল। গান্ধীজী ও মীরা বেন পাশাপাশি হেঁটে ফিরছেন জেলের কক্ষে। দুচোখ বেয়ে অশ্রু নামছে গান্ধীজীর। আস্তে আস্তে মীরাকে বললেন, '৬২ বছরের দাম্পত্য জীবন। ওকে ছেড়ে যেতে কি কষ্ট! এ যে এত গভীর হবে আগে মনে হয়নি। জানো মীরা, আমাদের মিলিত জীবন ছিল বড় সুখের, বড় তৃপ্তির।'

ইতিহাস দ্রুত এগিয়ে চলেছে। ভারতবর্ষ স্বাধীন হল ১৯৪৭, ১৫ আগস্ট। উত্তর প্রদেশে, হিমালয়ের পাদদেশে একটি আশ্রম তৈরি করে মীরা বেন চলে গেছেন। তাঁর কাজ এখন গবাদি পশু পালন, উন্নয়ন আর গঠনমূলক কাজ—যা গান্ধীজীর আদর্শের সঙ্গে যুক্ত। জায়গাটা হৃষীকেশের কাছে, গঙ্গার তীরে।

স্বাধীন ভারতবর্ষে গান্ধীজীর মহিলা সঙ্গীরা—বিজয়লক্ষ্মী পণ্ডিত, অমৃত কাউর, ডাঃ সুশীলা নায়ার সকলেই কোন না কোন পদে নিযুক্ত। ব্যতিক্রম শুধু মীরা বেন। তখন তাঁর বয়স ৫৫ বছর। গান্ধীজীর সঙ্গে দেখা খুব কমই হয়। দেশ বিভাগের ফলে যে নিষ্ঠুর সমস্যা দেখা দিয়েছে, গান্ধীজী তা সামলাতে ব্যস্ত। কলকাতা, নোয়াখালি, বিহার, দিল্লি—সফর করছেন গান্ধীজী। মীরা বেন এই সময় একবার দিল্লি আসেন হৃদরোগের চিকিৎসার জন্য। হঠাৎ ম্যালেরিয়ায় আক্রান্ত হলেন। অসুখের খবর শুনে গান্ধীজী দিল্লি এলেন। তিন মাস মীরা থাকলেন গান্ধীজীর সঙ্গে। তাঁর ভাষায় 'থ্রি প্রিশ্যাস মান্থস উইথ বাপু' কাটল এবার। সেখান থেকে মীরা বেন হৃষীকেশের আশ্রমে আবার ফিরে গেলেন।

তারপর সেই ১৯৪৮ সালের ৩০ জানুয়ারি সন্ধ্যা। মীরা বেন খবর শোনার জন্য রেডিওটি খুলেছেন। শুনতে পেলেন, 'গান্ধীজী কিল্‌ড।' স্তব্ধ, নির্বাক মীরা বেন ধীরে ধীরে রেডিওটা বন্ধ করে আশ্রমের বাইরে এসে দাঁড়ালেন। পর্বত, অরণ্য, আকাশ—সবখানেই রাত্রির প্রথম অন্ধকার বিছিয়ে গেছে। অদূরে গঙ্গা, নির্জন শান্ত স্রোত বুকে নিয়ে বয়ে চলেছে। মীরা স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে থাকেন। মনে মনে বলেন—এতদিন আমার ছিল শুধু দুজন, ঈশ্বর এবং বাপু।

আজ দুজন এক হয়ে গেলেন, মিশে গেলেন এক অচিন সুরে—'ফর মি দিজ ওয়্যার ওনলি টু—গড এ্যাণ্ড বাপু। নাউ দে হ্যাভ বিকাম ওয়ান।' কথা নয়, যেন অশ্রুর নির্যাস।

When you are searching Your interest areas in an English magazine....
....Take a look at PROBE INDIA

If business, investment climate and the share market are the areas of your interest, Probe has some of the most investigated reports on the contemporary scene to share with you.

If it is the political scene, you will be more than satisfied with the objective reports from all around the country.

There is almost everything in Probe, you could look for–sports, cinema, media, focus on international scene, women, lifestyle, human interest and regional coverages.

And for your leisure you have the visual delight of photo-features.

Probe is an interesting and bold blend of topical coverage with an insight into the future, for we take a stand on controversial issues.

PROBE INDIA

Reporting with credibility that's seeded within.

বাজি !

টিকে থাকার জন্য চলেছে প্রতি-নিয়ত মানুষের লড়াই। সে লড়াই কোন রাজনীতির তল্পিবাহক নয়, বরং মানুষের আবহমানতাই সেখানে একমাত্র পরিচয়। এইরকম মহাজীবনের কথা যার লেখার একমাত্র বিষয়, তিনি শৈবাল মিত্র। এই লেখায় মানুষের সেই যুদ্ধযাত্রার পরের কথা স্মৃতির শহর থেকে তুলে এনেছেন তিনি।

ঠিক দুপুরে মনীশকে তার বন্ধুরা এক মজার বাজিতে বেঁধে ফেলল। গনগনে সূর্য তখন মাঝ আকাশ থেকে অল্প পশ্চিমে হেলেছে, রবিবারের সকালের আড্ডার পর ফ্রেণ্ড্স কেবিন প্রায় ফাঁকা, চেয়ার ছেড়ে বন্ধুদের সঙ্গে ওঠার তোড়জোড় করার মুহূর্তে মুখ ফসকে মনীশ বলে ফেলেছিল, পঞ্চাশটা রসগোল্লা খাওয়া কোনো ব্যাপার নয়।

তুই পারবি ? সঙ্গে সঙ্গে অমল প্রশ্ন করেছিল মনীশকে।

পারবো। মনীশ বলেছিল।

ব্যস, পাঁচ, সাত মিনিটের মধ্যে ফ্রেণ্ড্স কেবিনের ছোকরা বেয়ারা সালন, পাশের নামী মিষ্টির দোকান থেকে একটা বড়ো হাঁড়িতে এক টাকা দামের পঞ্চাশটা রসগোল্লা নিয়ে এল। রসগোল্লার দাম, পঞ্চাশ টাকা, অমল, শমীক আর বিভাস ভাগ করে দিয়ে দিল। ওদের সঙ্গেই সকাল এগারোটা থেকে ফি-রবিবারের মতো আজও মনীশ আড্ডা দিচ্ছিল।

রসগোল্লা আসার পর আশপাশের টেবিলের দু'চারজন, বাড়ি ফেরার জন্যে যারা উঠব উঠব করছিল, বিনি পয়সার মজা দেখার লোভে তারা যে যার চেয়ারে গ্যাঁট হয়ে বসে পড়ল। সকলেই এখানকার নিয়মিত খদ্দের, সব মজায় সকলের তাই সমান অধিকার। গ্যাসট্রিকের রুগী মনীশ পঞ্চাশটা রসগোল্লা খাবে শুনে ফ্রেণ্ড্স কেবিনের রাঁধুনী, সনাতন রান্নাঘর থেকে বেরিয়ে এল। দোকানের মালিক নিকুঞ্জ হাজরা উঠে দাঁড়াল কাউন্টারের চেয়ার ছেড়ে। সকলের চোখ মুখের ভাব দেখে মনে হল, অনেককাল পরে ফ্রেণ্ড্স কেবিনে যেন উপভোগ করার মতো একটা কিছু ঘটতে চলেছে। উপভোগ্য ঘটনা তো বটেই। কেননা, রসগোল্লা বিষয় নয়, এবং এ যাবৎ রসগোল্লা খেয়ে কেউ মরেছে, এমন কোনো খবর নেই।

মনীশ পঞ্চাশটা রসগোল্লা খাওয়া শুরু করার আগে তার সামনে টেবিলের ওপর এক গ্লাস জল রেখে তাকে বাজির শর্তগুলো অমল জানিয়ে দিল। অমল বলল, একঘন্টা, মানে ষাট মিনিটে এই পঞ্চাশটা রসগোল্লা তোমায় খেতে হবে। জল, এই একগ্লাস। এর বেশী দেওয়া হবে না। ষাট মিনিটে পঞ্চাশটা রসগোল্লা খেয়ে তুমি যদি সুস্থ থাকো, তাহলে আমরা একশো টাকা তোমাকে দেব। যদি খেতে না পার, অথবা খেয়ে অসুস্থ হও, তাহলে মিষ্টির দাম সমেত দেড়শো টাকা তোমাকে দিতে হবে।

শর্ত ব্যাখ্যা করে মনীশের দিকে তাকিয়ে অমল প্রশ্ন করল, রাজী ?

রাজী। মনীশ বলল।

বিভাস বলল, মনীশ, লড়ে যা.....।

জেদ অথবা খ্যাপামির তাড়নায় সবকটা শর্ত মেনে নিয়ে সাত মিনিটে দশটা রসগোল্লা খাওয়ার পর মনীশের মনে হল, বাকি চল্লিশটা সে অবলীলায়

তিপান্ন মিনিটে খেলে ফেলবে। ফ্রেন্ড্‌স কেবিনের দেওয়াল ঘড়িতে এখন একটা বেজে সাত মিনিট, বেলা দুটোয় বাজির সময় শেষ হবে। মনীশ দেখল, মুখোমুখী কাউন্টারের ওপর দুহাত রেখে রেফারীর মতো সতর্ক চোখে দোকানের মালিক নিকুঞ্জ হাজরা তাকিয়ে আছে। বাঁ পাশের চেয়ারে শমীক গম্ভীর, ডাইনে বসা অমলের দু'চোখ কৌতুকে ঝিকমিক করছে। দু' আঙুল টিপে এগারো নম্বর রসগোল্লার রস হাঁড়িতে ঝরিয়ে সেটা মুখে পুরে খোলা জানলার বাইরে শরতের নির্মেঘ আকাশের দিকে মনীশ তাকাল। ঝাঁঝাঁ রোদেও শরতের আকাশ টলটলে নীল, স্নিগ্ধতা কমেনি।

অমল বলল, একটু তাড়াতাড়ি মুখ চালা মনীশ....।

মনীশ বলল, এখনো বাহান্ন মিনিট সময় আমার আছে।

কিন্তু প্রথম দিকে তাড়াতাড়ি না খেলে পরে সময় পাবি না।

অমলের কথা শুনে মনীশ যেভাবে মুচকি হাসল, তার মানে, বাপু হে, তোমরা খুব বোকামি করেছো, রসগোল্লার দাম তো দিয়েছ, বাজির একশো টাকা দেবার জন্য এখন তৈরি হও।

অমলের তাড়া গায়ে না মাখলেও মনীশ এবার কিন্তু একটু তাড়াতাড়ি খেতে লাগল। পুরো ব্যাপারটা শমীকের ভালো লাগছিল না। আজ আড্ডার শেষ পর্বে নানা সুখাদ্যের আলোচনা থেকে খাইয়ে লোকেদের প্রসঙ্গ উঠেছিল। ভুরিভোজী এক আধজন মানুষ, সকলেই দেখেছে। তাই এ ধরনের গল্প শুরু হলে সহজে থামে না। ঝুলি উজাড় করে সকলেই নিজের অভিজ্ঞতা শোনাচ্ছিল। তার মধ্যে রসগোল্লা খাওয়ার কথা নিয়ে মনীশ কিছু একটা বলতেই তাকে বাজিতে বেঁধে ফেলা হল। অমল বা বিভাসের চেয়ে বাজি লড়ার ব্যাপারে মনীশের দায়িত্ব বেশি। গা জোয়ারি করে সে নিজে তাল ঠুকে এগিয়ে এসেছিল। রোগা, প্যাংলা শরীর, পেটে আলসার, সব জেনেও এ রকম একটা ফাঁদে মনীশের পা দেওয়া উচিত হয় নি। আসলে আর পাঁচজন নিম্নবিত্ত বাঙালি ভদ্রলোকের মতো মনীশও এখন কি এক রাগে সবসময়ে চিড়বিড় করছে। অকারণে দুঃসাহস আর স্পর্ধা দেখিয়ে ভেতরে জমা গরম ভাপ বার করে দিতে চায়। শমীকের এসব ভাল লাগে না। তবু বন্ধুরা যখন বাজির খেলায় শমীককে একজন শরিক করে নিল, সে না বলতে পারেনি।

সতেরটা রসগোল্লা খেয়ে এক ঢোঁক জল গিলে মনীশ প্রশ্ন করল, একটা সিগারেট ধরাতে পারি ?

মনীশের প্রশ্ন শুনে অমল আর বিভাস মুখ চাওয়াচাওয়ি করতে কাউন্টার থেকে নিকুঞ্জ বলল, সিগারেট খাওয়ায় কোন দোষ নেই।

মনীশের দু'ঠোঁটের ফাঁকে বিভাস একটা সিগারেট গুঁজে দেওয়ার পর অমল সেটা ধরিয়ে দিল। শমীক ভাবছিল, রবিবারের এই আড্ডা সে ছেড়ে দেবে। আজও আসার ইচ্ছে ছিল না। ভেবেছিল, অফিসের বকেয়া কিছু কাজ বাড়িতে বসে সেরে ফেলবে। কিন্তু দশটা বাজতেই শমীকের বুকটা আনচান করে উঠল, অদৃশ্য একটা সুতো ধরে ফ্রেন্ড্‌স কেবিন যেন টানছে, না গিয়ে উপায় নেই, আড্ডা না দিলে হয়তো পুরো দিনটা মাটি হয়ে যাবে। তাই রবিবার হওয়া সত্ত্বেও ইলেকট্রিক বিল জমা দেবার ছুতোয় শমীক বাড়ি থেকে সাড়ে দশটা নাগাদ বেরিয়ে পড়েছিল। মনে মনে ঠিক করেছিল, সুপ্তি প্রশ্ন করলে কোন এক বন্ধুর নাম করে বলবে যে, সে ইলেকট্রিক সাপ্লাই-এ চাকরী করে, তার হাত দিয়ে বিল জমা করলে লাইনে দাঁড়ানোর ঝামেলা থেকে রেহাই পাওয়া যাবে, ইত্যাদি।

কিন্তু সুপ্তি কোন প্রশ্ন না করায় বাড়ি থেকে বেরোবার আগে শমীককে কোন বানানো কৈফিয়ৎ দিতে হয় নি।

মনীশের মুখের চেহারা দেখে শমীকের কষ্ট হচ্ছিল।

মুখে আবছা হাসি থাকলেও মনীশের কপাল ঘেমে উঠেছে। সাতাশটা রসগোল্লা খাওয়ার পর মনীশের চোখের দুটো মণি যেন সামান্য বড়ো হয়ে গেছে বলে শমীকের মনে হল। ফ্রেন্ড্‌স কেবিনের বড় ঘড়িতে দেড়টা বাজল। বাকি আধঘন্টায় তেইশটা রসগোল্লা মনীশকে খেতে হবে। পঁচিশ পর্যন্ত একবারে একটা রসগোল্লা মনীশ খেয়েছে। এখন দু'বারে, প্রতি কামড় চিবিয়ে চিবিয়ে, অনেকটা সময় নিয়ে মনীশ খাচ্ছে। গিলে ফেলার পরও ছানার কুঁচো মনীশের দাঁতে, মাড়িতে, দু'কসে জড়িয়ে থাকছে। লালা শেষ হয়ে গিয়ে মুখের ভেতরটা শুকনো, খটখটে, তবু সাহস করে আধ চুমুকের বেশি জল মনীশ খেল না। এক গ্লাস জলের শর্তটা মনীশের মাথায় আছে। বাঁ হাতে পকেট থেকে রুমাল বার করে বুক, গলা, কপালের ঘাম মুছল মনীশ।

হাতঘড়িতে বিভাস ঘন ঘন সময় দেখছিল। ভবানীপুরের একটা সিনেমার সামনে পৌনে তিনটেতে নন্দিতাকে সময় দেওয়া আছে। সিনেমার দুটো টিকিট কেটে নন্দিতা অপেক্ষা করবে। ফ্রেন্ড্‌স কেবিন থেকে বিভাস বাড়ি ফিরবে না, সোজা সিনেমা হলে যাবে। বাড়িতে সেরকম বলে আজ একটু দেরিতে, বেলা সাড়ে এগারটার পর বিভাস আড্ডায় এসেছে। কিন্তু যে গতিতে মনীশ খাচ্ছে, আদৌ পঞ্চাশটা রসগোল্লা সে খেয়ে শেষ করতে পারবে কিনা, কিংবা পারলেও অসুস্থ হয়ে কোন ঝামেলা পাকিয়ে ডাক্তার, হাসপাতালের পাকে ফেলে পৌনে তিনটে পর্যন্ত আটকে দেবে কিনা, এসব ভেবে বিভাস বেশ ভয় পাচ্ছিল। আসলে সিনেমায় যাওয়ার আগে পর্যন্ত ফ্রেন্ড্‌স কেবিনে বন্ধুদের আটকে রাখার জন্যে বাজির কারসাজিটা বিভাস মনে মনে ছক কষে নিয়েছিল। বিভাস ভাবল, এটা না করলেই হতো। সিনেমা হলের সামনে সুসজ্জিতা নন্দিতা একা একা দাঁড়িয়ে থাকবে, এটা কল্পনা করে বিভাস ভারী ব্যাকুল হল।

ত্রিশটা রসগোল্লা খেয়ে মনীশ বলল, টয়লেট থেকে ঘুরে আসছি।

কেন ? অমল প্রশ্ন করল।

অমলের দিকে স্থির চোখে তাকিয়ে মনীশ বলল, বমি করতে নয়।

মনীশের সঙ্গে টয়লেট পর্যন্ত গিয়ে কয়েক সেকেন্ড দরজার বাইরে দাঁড়িয়ে ফিরে এসে অমল বলল, পেচ্ছাপ করছে।

দু'মিনিটের মধ্যে মনীশ যখন টয়লেট থেকে ফিরে এল, তখন তার মুখ, চোখ, কানের দু'পাশ জলে ভিজে সপসপ করছে। কপালে, মুখে সে যে বেশ করে জলের ঝাপটা দিয়েছে, এটা বোঝা গেল। নিজের চেয়ারে বসে কাউন্টারে দাঁড়ানো নিকুঞ্জকে মনীশ বলল, ফ্যানটা বাড়িয়ে দিন।

পাখা ফুল ফোর্সেই ঘুরছে, নিকুঞ্জ জানাল।

মাথার ঠিক ওপরে নয়, একটু পেছনে ঘুরতে থাকা পাখাটা একপলক দেখে একটা রসগোল্লা নিংড়ে এক কামড়ে আধখানা খেয়ে মনীশ প্রশ্ন করল, একটু নুন নিতে পারি ?

নাহ্! অমল বলল।

কপাল কুঁচকে শমীক বসেছিল! সে বলল, চললাম....।

চেয়ার ছেড়ে শমীক ওঠার চেষ্টা করতে বিভাস আর অমল হাঁ হাঁ করে উঠল। পকেট থেকে একটা একশো টাকার নোট বার করে শমীক বলল, বাজিতে হার, জিত, যাই হোক একশো টাকা আমি দিয়ে গেলাম।

কিন্তু নোটটা নেবার জন্যে অমল বা বিভাস, কেউ হাত বাড়াল না। শমীক গুম হয়ে বসে থাকল। ত্রিশটা রসগোল্লা খাওয়ার পর মনীশের মনে হল, তার বুক পর্যন্ত বোঝাই হয়ে গেছে। শ্বাসকষ্ট হচ্ছিল তার। হু হু করে সময় চলে যাচ্ছে। নির্ধারিত একঘন্টার মধ্যে তেত্রিশ মিনিট কাবার। বাকি সাতাশ মিনিটে কুড়িটা রসগোল্লা খেতে হবে। কিন্তু মনীশ বুঝতে পারছে শেষ কুড়িটা রসগোল্লা, ভীষণ মোক্ষম জিনিস। কামানের গোলার মতো কঠিন এবং ভারী, খেয়ে শেষ করা সহজ হবে না। একত্রিশ নম্বর রসগোল্লার আধখানা, মনীশের মুখের মধ্যে একতাল বিস্বাদ স্পঞ্জের মত ঘুরছে, সেটাকে মনীশ কিছুতেই গিলতে পারছে না। এক ঢোঁক জলের সঙ্গে ছানার দলাটা মনীশ কোনমতে গিলে নিল।

সিগারেট ফুঁকে আর টয়লেটে গিয়ে অনেকটা সময় নষ্ট করার জন্যে মনীশের অনুতাপ হচ্ছিল। ঘিরে থাকা তিন বন্ধু এবং ফ্রেন্ড্‌স কেবিনের পরিচিত মুখগুলোর দিকে একপলক নজর করে মনীশ দেখল, তার কেরামতি দেখার জন্যে শমীক ছাড়া সকলেই হাঁ করে তাকিয়ে আছে। তাদের চোখে কৌতুক আর উত্তেজনা।

একত্রিশ নম্বর রসগোল্লার শেষ অর্ধেকটা মুখে পুরতেই কি এক বিষ ব্যথা মনীশের তলপেটটা খামচে ধরল। মুখে কিছু না বললেও যন্ত্রণায় টেবিলের ওপর মনীশ সামান্য ঝুঁকে পড়ল। পিচকিরির পিস্টনের মতো তলপেট, গোটা হজমনালীটাকে গলা দিয়ে ঠেলে বার করে দিতে চাইছে। বাচ্চাদের খেলার বড় বড় সাদা টলগুলির মতো বিস্বাদ, শক্ত রসগোল্লা, এতোটুকু মিষ্টতা নেই। ঝড়ের বেগে সময় চলে যাচ্ছে। মনীশকে ঘড়ির দিকে তাকাতে দেখে অমল বলল, টয়লেটে যাওয়ার দরুণ দু'মিনিট বাড়তি সময় তোকে দেওয়া হবে।

অমলের কথায় সকলে সায় দিল ।

বন্ধুদের আলোচনা, মতামত, কিছুই মনীশের কানে ঢুকছে না। তার মনে হল, রসগোল্লার বদলে সে নারকোলের শুকনো ছোবড়া চিবোচ্ছে । এ চিবোনোর যেন বিরাম নেই, শেষ নেই । মনীশের মুখের চোয়াল, চোয়ালের দু'পাশের হাড়, ব্যথায় টাটিয়ে ভারী হয়ে উঠেছে । দু'পাটি দাঁত অসাড়, সেগুলোর ওঠাপড়া মনীশ বুঝতে পারছে না । দুপুরের শহর ক্রমশঃ শব্দহীন, ঝিমিয়ে পড়ছে । শরতের ঘন রোদে তেতে উঠছে ইট, পাথর, অ্যাসফল্টের পৃথিবী । ছেলেবেলার কিছু ঘটনা মনীশের মনে পড়ল । নিমন্ত্রণ বাড়িতে খেতে এসে, প্রথমদিকের কোনো খাবার, এমন কি মাছ, মাংস, পোলাও পর্যন্ত বিশেষ না খেয়ে রসগোল্লার জন্যে মনীশ বসে থাকত । যে কোন অনুষ্ঠানের বাড়িতে আট দশটা রসগোল্লা মনীশ অনায়াসে খেয়ে ফেলত । তেত্রিশ নম্বর রসগোল্লায় কামড় দিয়ে মনীশের মনে হল তার ধারালো দু'পাটি দাঁত অলস, ছানার মিষ্টি ভেদ করে ঢুকতে পারছে না। মনীশের হাত, মুখ রসে মাখামাখি, আড়ষ্ট চিবুক বেয়ে রস গড়িয়ে পড়ছে ।

বিভাস চেঁচিয়ে উঠল, মনীশ লড়ে যা, আর মাত্র সতেরোটা....।

ছেলেবেলার একটা স্মৃতি মনীশের মাথায় ভেসে উঠল। শুধু রসগোল্লা খাওয়ার লোভে অনাহৃত মনীশ তখন এদিক ওদিকে অন্নপ্রাশন, বিয়ে, বৌভাত, শ্রাদ্ধবাড়িতে সুযোগ বুঝে সুড়ুৎ করে ঢুকে পড়ত । চুরি করে খেয়ে বেড়ানোটা এমন নেশার মতো হয়ে গিয়েছিল যে, রাস্তা দিয়ে ঠেলা গাড়ি বোঝাই চেয়ার যেতে দেখলে, সেই গাড়ি অনুসরণ করে মনীশ অনুষ্ঠান বাড়ির হদিশ জেনে আসত । এভাবে অনেক বাড়িতে সে খেয়েছে । একবার ধরা পড়ে মার খেতে খেতে বরাত জোরে মনীশ বেঁচে গিয়েছিল ।

মনীশের সারা শরীর দিয়ে কুলকুল করে ঘাম ঝরছিল।তার চোখ মুখের অবস্থা দেখে কিছুটা ভয় পেয়ে শমীক চেয়ার থেকে উঠে কাউন্টারের পাশে গিয়ে দাঁড়াল । দর্শকদের মধ্যে এখন রুদ্ধশ্বাস উত্তেজনা । কি হয়, কি হয়, অনিশ্চয়তায় থমথম করছে তাদের মুখ ।

রস না নিংড়ে চৌত্রিশ নম্বর রসগোল্লায় কামড় দিতেই অনেকদিন আগে, মামাবাড়িতে দেখা একটা মানুষের মুখ মনীশের মনে পড়ল । ভবঘুরে টাইপের সেই লোকটা, মনীশের মায়ের পিসতুতো ভাই। শুকনো, ছোটখাটো চেহারার সেই মানুষটাকে ভাঁটুমামা বলে মনীশ ডাকত। বছরে তখন একবার বা দু'বার মনীশ মামাবাড়িতে যেত । সেখানে গেলেই যে ভাঁটুমামার সঙ্গে দেখা হবে, এমন কোন কথা ছিল না । ভাঁটুমামাও দু'একবছর ছাড়া ধূমকেতুর মতো মামাবাড়িতে হঠাৎ উদয় হতো । দু'পাশের আসার সময় মিলে গেলে তবেই ভাঁটুমামার সঙ্গে মনীশের দেখা হতো । ভাঁটুমামা যে পাকা নেশাখোর, মামাবাড়িতে অনেকের মুখে নানা আলোচনায় মনীশ এ খবর শুনেছিল । মনীশের বয়স তখন আট, দশ বছর । ভাঁটুমামাকে মনীশ প্রায়ই সন্ধ্যেবেলায় আফিম খেতে দেখত । সর্ষের মতো একটা দানা মুখে পুরে, সেটা যে আফিম, ভাঁটুমামা নিজেই একদিন সেকথা মনীশকে বলেছিল । যে কোন কারণে মনীশকে খুব পছন্দ হয়েছিল ভাঁটুমামার । মামাবাড়ির একতলার একটা ছোট অন্ধকার ঘরে ভাঁটুমামা এসে থাকত। সেই ঘরে বসে নানা গল্পের মধ্যে ভাঁটুমামা একদিন মনীশ কে বলেছিল, আফিমে যখন নেশা হয় না, তখন সাপের ছোবল নেওয়ার জন্যে জঙ্গলে ঘুরে বেড়াই ।

কী সাপ ? দু'চোখ বড় বড় করে মনীশ জানতে চেয়েছিল। কেউটে, গোখরো, চন্দ্রবোড়া , ভাঁটুমামা বলেছিল । নিজের জীবনের অদ্ভুত সব অভিজ্ঞতা ভাঁটুমামা শোনাত মনীশকে । একদিন সন্ধ্যেবেলায় মনীশকে নিয়ে পাড়ার এক মিষ্টির দোকানে গিয়ে ভাঁটুমামা প্রশ্ন করেছিল, রসগোল্লা খাবি ?

হ্যাঁ । মনীশ বলেছিল ।

কটা ?

দুটো ।

মনীশের জবাব শুনে মুচকি হেসে তার জন্যে দুটো রসগোল্লার হুকুম দিয়ে ভাঁটুমামাও রসগোল্লা খেতে শুরু করেছিল। সে এক প্রলয়ঙ্কর খাওয়া। ভাঁটুমামা খেয়েই চলেছে, থামার নাম নেই । ভাঁটুমামা যখন থামল, তখন হাঁড়ি ভর্তি পঞ্চাশটা রসগোল্লা শেষ। শেষ রসগোল্লাটা গিলে দু'হাতে হাঁড়িটা ধরে ভাঁটুমামা চকচক করে প্রায় আধ হাঁড়ি রস খেয়েছিল । দোকান থেকে বেরিয়ে অন্ধকার রাস্তায় হাঁটতে হাঁটতে ভাঁটুমামা বলেছিল, রসগোল্লা হলো রাজ্যপালের গাড়ি, রাস্তায় যতো ভীড় বা জ্যাম থাকুক, এ গাড়ি থামবে না, রসগোল্লার জন্যে পাকস্থলীতে জায়গার অভাব হয় না ।

ভাঁটুমামার নাম স্মরণ করে পঁয়ত্রিশ নম্বর রসগোল্লাটা কোঁত করে গিলতে গিয়ে মনীশের মনে হল, আজ রাস্তায় অসম্ভব জ্যাম, রাজ্যপালের গাড়ি অচল, এক ইঞ্চি এগোতে পারছে না, বরং পেছিয়ে আসছে । মনীশের সারা শরীরে থরথর কাঁপুনি, জলে ভিজে উঠছে দু'চোখ, তবু রসগোল্লাটা মুখের ভেতর বাগিয়ে ধরে সে চিবোতে চেষ্টা করল । জীবনে এই একটা বাজি সে জিততে চায় । সারাজীবন, শুধু হার, পরাজয় । কোথাও কোনো প্রতিযোগিতা বা বাজিতে সে জেতেনি, আজ এই সুযোগটা সে হারাতে নারাজ ।

বিভাস চেঁচিয়ে উঠল, আর মাত্র পনেরোটা, মনীশ লড়ে যা...।

বিভাসের দিকে একপলক তাকিয়ে দাঁতে দাঁত টিপে মনীশ ঠিক করল, বাকি পনেরোটা খেতেই হবে, একটা রসগোল্লাও ফেলবে না, শেষপর্যন্ত লড়বে । জীবনে এই প্রথম একটা বাজি, খুব মামুলি হলেও সে জিততে চলেছে, এ সুযোগ সে কিছুতেই ছাড়বে না । কিন্তু রসগোল্লার মতো এমন উপাদেয়, চমৎকার একটা খাবার হঠাৎ কেন এতো বিস্বাদ লাগছে ? ভালো জিনিস নিয়ে বাড়াবাড়ি করলে কি সেটা তেঁতো হয়ে যায় শরীরটা ভীষণ ভারী, বিকল লাগছিল মনীশের । মনে হল, বহু বছর ধরে সে যেন এই চেয়ারটায় বসা, এক প্রাচীন অশ্বত্থ গাছ, সারা দেহ থেকে ঝুরি আর শেকড় নেমে তাকে আটকে রেখেছে মাটির সঙ্গে। সে নড়তে পারছে না, এই চেয়ার ছেড়ে সে হেঁটে চলে যেতে পারবে না কোনদিন । ঘন মেঘের মতো অসংখ্য ব্যর্থতা, অপমান আর গ্লানিতে মনীশের মাথার ভেতরটা ধূসর হয়ে ওঠে । মাথার মধ্যে সেই মেঘ মাঝেমাঝে গুড়গুড় করে ডেকে ওঠে, আগুনের চাবুকের মতো বিদ্যুৎ-ঝলক ছিন্নভিন্ন করে দেয় তার অন্ধকার মস্তিষ্ক ।

দশবছর আগের এক ঘটনা মনীশের মনে পড়ল ।

মনীশের পুরনো বন্ধু সুধীন হিমালয়ের এক দুর্গম চূড়ায় ওঠার পরিকল্পনা করেছিল । সুধীন ছিল পাহাড়-প্রেমিক, বছরে একবার পাহাড়ে যাওয়া প্রায় নেশার মতো হয়ে গিয়েছিল । খবরের কাগজে বেশ কয়েকবার ছাপা হয়েছিল সুধীনের পর্বতাভিযানের খবর । ছবি বেরিয়েছিল একবার । মনীশ কথা দিয়েছিল যে, একটা অভিযানে সে সুধীনের সঙ্গী হবে । মনীশ তখন বেকার, পাহাড়ে চড়ার পোশাক, সরঞ্জাম কেনার পয়সা ছিল না । তবু সে কেন কথা দিয়েছিল সুধীনকে, অনেক ভেবেও মনীশ হদিশ পায়নি । সত্যি কি হদিশ পায়নি ? নিশ্চয়ই পেয়েছিল । কিন্তু সে এমন এক গোপন কথা, যা কাউকে বলা যায় না । মনীশ বুঝেছিল, শেষ মুহূর্তে নিজের অসহায়তার কথা জানালে খরচের পুরো দায়িত্ব সুধীন নেবে । ফলে সুধীনের সঙ্গে তার টাকায় একটা তুষারশৃঙ্গ ঘুরে আসা যাবে। ভাগ্য ভাল হলে, এই তুষারশৃঙ্গ জয়ের খ্যাতিও কিছুটা মনীশের ভাগে পড়বে । এমন সব হিসেব-নিকেশ করে টাকাকড়ির অভাবের কথা মনীশ জানিয়েছিল সুধীনকে। তারপর মনীশ যা ভেবেছিল, তাই হলো ।

সুধীন বলেছিল, সব দায়িত্ব আমার, তুই শুধু আমার সঙ্গে চল ।

এতো ভরসা আর আশ্বাস পেয়েও মনীশের যাওয়া হল না । হাওড়া থেকে ট্রেন ধরে হরিদ্বার যাবার আগের দিন মায়ের অসুখের মিথ্যে অজুহাত দিয়ে মনীশ পিছিয়ে এসেছিল । খুব হতাশ হলেও মনীশকে সঙ্গী হওয়ার জন্যে সুধীন আর চাপাচাপি করেনি । একটা দু:সাহসিক অভিযানে নাম লিখিয়েও শুধু প্রতিমার কথায় মনীশ পালিয়ে এসেছিল । প্রতিমার সঙ্গে মনীশের তখন প্রগাঢ় প্রেম, বিয়ে হবেই সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ ছিল না । মনীশের পাহাড়ে যাবার কথা শুনে প্রতিমা গম্ভীর হয়ে গিয়ে বলেছিল, তুমি যেও না ।

অনেক বুঝিয়েও প্রতিমার অনুমতি মনীশ পায় নি ।

চল্লিশটা রসগোল্লা খাওয়া শেষ করে মনীশের মনে হল, একটা ভয়ঙ্কর বিস্ফোরণে তার শরীর যেন এখনই ফেটে টুকরো টুকরো হয়ে যাবে । গলার কাছে যেটা ধড়ফড় করছে, সেটা হৃৎপিণ্ড না রসগোল্লা, মনীশ বুঝতে পারল না । এক চুমুক জল খাওয়ার পরেও সেই ধড়ফড়ানি গলায় আটকে থাকল । ফ্রেন্ডস কেবিনের খোলা জানলার পাল্লার ওপর বসে একটা কাক ডাকছে । কি তীক্ষ্ণ; কুৎসিত গলা । প্রতিমার কাছে মনীশ হেরে গিয়েছিল । মনীশের শিখর জয়ের পরিকল্পনা প্রতিমা শুধু বাতিল করে নি, তার জীবন থেকেও মনীশকে

ছেঁটে বাদ দিয়েছিল। এক মেঘলা ভিজে দুপুরে প্রতিমা বলেছিল, আমার পেটে সুশান্তর বাচ্চা এসেছে, সুশান্তকেই বিয়ে করতে হবে আমাকে, কিছু করার নেই।

প্রতিমার কথা শুনে ফ্যাকাসে, শব্দহীন হয়ে গিয়েছিল মনীশ। মুখোমুখি চেয়ারে বসা প্রতিমা, অথচ চেয়ারটা যেন শূন্য, কেউ নেই। সুশান্তর সন্তান কবে, কিভাবে প্রতিমার পেটে এল, সেটুকু ভাবার শক্তিও মনীশের ছিল না। মনীশের মনে হয়েছিল, সাতবছর মেলামেশা করেও সে বিন্দুমাত্র চিনতে পারেনি প্রতিমাকে। সে অপদার্থ, ক্লীব। গত সাতবছরে একবার চুমুও খায়নি প্রতিমাকে। কেন খায় নি? কেন? বিশুদ্ধ প্রেমের দোহাই দিয়ে সে কি তার ভীরুতাকে ঢাকতে চেয়েছিল? পরাজয়, ব্যর্থতা কি তার অনিবার্য নিয়তি? হঠাৎ সুধীনের মুখটা মনীশের মনে পড়েছিল। শিখর জয় করে ফেরার পথে পা পিছলে পড়ে গিয়ে সুধীন নিখোঁজ হয়েছিল। অনেক সন্ধান করেও সুধীনের খোঁজ মেলেনি। হিমালয়ের কোনো সুদূর, নির্জন শিখরে বা উপত্যকার তুষার শয্যায় আজও নিশ্চয় সুধীন গভীর ঘুমে ডুবে আছে। বরফের রাজত্বে কিছুই পচে না, নষ্ট হয় না, অবিকৃত, অম্লান থাকে। হিমালয়ের আশ্রয়ে সুধীনও নিশ্চয় অমরত্ব পাবে

প্রথমে খবরের কাগজে পড়ে, পরে বন্ধুদের মুখে সুধীনের কাহিনী শুনে মনীশ হতবাক, দিশা-হারা হয়ে গিয়েছিল মনে হয়েছিল, তার ওপর অভিমানেই সুধীন যেন এরকম একটা কাজ করল। তখনও প্রতিমার সঙ্গে ছাড়াছাড়ি হয়নি কথাটা একদিন প্রতিমাকে বলেছিল মনীশ। মুখ-ঝামটা দিয়ে প্রতিমা উড়িয়ে দিয়েছিল সুধীনের আবেগ।

মার দিয়া কেল্লা, মার দিয়া, হৈ হৈ করে বিভাস বলল, আর মাত্র দশটা বাকি, লড়ে যা মনীশ...।

কিভাবে, কখন যেন চল্লিশটি রসগোল্লা মনীশের খাওয়া হয়ে গিয়েছে চল্লিশটা খাওয়ার পর মনে হচ্ছে, পেটটা একদম খালি, পেটে প্রবল খিদে, বহুকালের উপোস, বাকি দশটা রসগোল্লা খেতে আর কোনো কষ্ট হবে না। উনপঞ্চাশ নম্বর রসগোল্লাটায় মনীশ যখন কামড় দিল, তখন আর রস ঝরাবার কথা তার মনে নেই মনীশের দুটো হাত, মুখ, চিবুক, জামা রসে ভিজে জবজব করছে দু'কস বেয়ে পড়ছে রস আর লালায় মেশা ছানার গুঁড়ো। বেহুঁসের মতো উনপঞ্চাশ নম্বর রসগোল্লার অর্ধেকটা মনীশ চিবোচ্ছে। তার ঘোলাটে দু'চোখে ফাঁকা দৃষ্টি মাথার মধ্যে মেঘের গুমগুম শব্দ, ঝলসে উঠছে বিদ্যুৎ, পেটে অসম্ভব খিদে পরাজয়, ব্যর্থতা আর অপমান শুধু তো একবার নয়, সারাজীবন, বারবার মনীশ সেগুলোর মুখোমুখী হয়েছে। বড়ো, ছোট, নানা-রকমের কাঁটা, সবগুলোই বেশ ধারালো। বিদ্ধ করার সীমাহীন ক্ষমতা। কলেজের বন্ধু ব্রতীনের দিদির বিয়েতে খাওয়ার পাট চুকতে রাত এগারটা বেজেছিল। মনীশ, কল্লোল, হিমাংশু আর অজয় সন্ধ্যে থেকে পরিবেশন করেছিল। শেষ পাতে বাড়ির লোকজনদের সঙ্গে খেয়ে তারা যখন উঠল, তখন রাত প্রায় বারটা। শীতের রাত, চারপাশ নিঝুম, হিম আর কুয়াশায় পথঘাট আবছা। শহরের শেষ গাড়িটাও বোধহয় চলে গেছে। কথা ছিল ব্রতীনের মামা গাড়ি করে শ্যামবাজারে নিজের বাড়িতে ফেরার পথে মনীশ এবং তার বন্ধুদের নামিয়ে দিয়ে যাবেন। বৌবাজার থেকে বিডন স্ট্রীটের মধ্যে চারজনের বাড়ি। গাড়িতে মামীকে পাশে বসিয়ে ইঞ্জিন স্টার্ট করে কল্লোলকে ডেকে নিচু গলায় মামা ফিসফিস করে কিছু বললেন। কল্লোল যেন একটু বিব্রত, গম্ভীর হয়ে গেল। কল্লোলের পাশে দাঁড়িয়েছিল হিমাংশু। মামার কথা শুনে হিমাংশু বলল, মনীশকে আমি বলছি।

ব্রতীনদের বাড়ির সদর দরজায় দাঁড়িয়ে সক-লের মুখ, কথা, মনীশ ঠিক ঠাহর করতে পারছিল না। কিন্তু কি এক সঙ্কোচ, ভয়, তার রক্তের মধ্যে শীতল স্রোতের মতো ছড়িয়ে পড়ছিল। সে বুঝতে পারছিল, একটা বড়ো আঘাত, অপমান, তার ঘাড়ে ঝাঁপিয়ে পড়ার জন্য নিঃশব্দে এগিয়ে আসছে। তখনই হিমাংশু এসে বলল, মামাবাবু বলছেন, তাঁর গাড়ি ছোট, জায়গা কম, গিয়ারে যেন কি গণ্ডগোল হয়েছে, তাই সকলের জায়গা হবে না। শ্যামবাজারের শেষ বাস এখান দিয়ে রাত সওয়া বারোটায় যাবে, তুই যদি...।

হিমাংশুর কথা মনীশের আর কানে গেল না, তার চারপাশের পৃথিবী টলমল করছিল ফাঁকা রাস্তায়, বেতাল পায়ে বাসস্টপ পর্যন্ত মনীশ একা হেঁটে এসেছিল। দু'মিনিট পরে দেখল, কুয়াশার ভেতর দিয়ে আর একজন কে যেন এগিয়ে আসছে। মনীশের পাশে এসে কল্লোল বলেছিল, আমিও বাসে যাব।

কল্লোলের মুখের দিকে তাকিয়ে মনীশের দু'চোখে জল এসে গিয়েছিল। কিন্তু সে কাঁদতে পারেনি। সেই কান্না আর অপমান আজও তার স্মৃতিতে স্তূপাকার হয়ে আছে।

আর কিন্তু তিন মিনিট সময় আছে, অমল হুঁশিয়ারী দিতেও মনীশ যেন খেয়াল করল না শেষ রসগোল্লাটা প্রায় সিকি হাঁড়ি রসের তলায় ডুবে আছে। ঘরের মধ্যে রুদ্ধশ্বাস উদ্বেগ, উত্তেজনা, প্রতীক্ষা। বিভাস বলল, লড়ে যা মনীশ, আর মাত্র একটা...।

ঘোর, আচ্ছন্ন চোখে বিভাসের মুখের দিকে একবার তাকিয়ে হাঁড়ির মধ্যে মনীশ হাত ঢোকাতেই চার বছর আগের একটা ঘটনা মনীশের মনে পড়ে গেল। ছোট বোন রুমার বিয়ের নিমন্ত্রণ করতে মনীশ সেজোমাসীর বাড়ি গিয়েছিল সেজো-মাসীর বাড়ি ঢুকে মনীশ দেখল, সেখানে অনেক চেনামুখ, মামার বাড়ি থেকে দু'মামা, মামাতো ভাইবোনেরা এসেছে। মেজোমাসী আর ছোট-মাসীও সপরিবারে এসেছে। সেজোমাসীর বাড়িতে এ ভীড় সবসময়ে লেগে আছে মনীশ আগেও এটা দেখেছে। আসলে সেজোমাসীরা খুব বড়লোক, অগাধ পয়সা আর সম্পত্তি। অবশ্য যারা সেদিন সেজোমাসীর বাড়িতে এসেছিল, মনীশের সেই মামী এবং মাসীরাও কেউ গরীব নয়, প্রত্যেকেই বেশ স্বচ্ছল, সম্পন্ন মানুষ। আত্মীয়স্বজনদের মধ্যে একমাত্র মনীশরা সবচেয়ে গরীব। সেজোমাসী এবং অন্যরা খুব হৈ চৈ করে অভ্যর্থনা মনীশ খুশী হয়েছিল। সেজোমাসীকে নি করে দুই মামী আর দুই মাসীকে মনীশ বলে আজই যে তোমাদের বাড়ি যাব ভেবেছি

দুই মাসী বলেছিল, আমরা সন্ধ্যের ত বাড়ি ফিরব।

সেজোমাসী বলল, তুই কাল আয়।

ছোটমাসী বলেছিল, আমরা কিন্তু পরশু যাচ্ছি, সাতদিন পরে ফিরব।

ইতিমধ্যে আলাদা আলাদা প্লেটে সব জন্যে খাবার এসেছিল। তখনও অনেক বা নিমন্ত্রণ সারতে হবে, তাই বসা বা খাওয়ার মনীশের ছিল না। তবু তার মধ্যেই মনীশ দেখে অন্যদের যা খাবার দেওয়া হয়েছে, তার খাবার সেগুলোর থেকে আলাদা। প্লেটটাও ফুলকাটা বড়ো প্লেটে মাসী, মামী এবং ছেলেমেয়েদের দেওয়া হয়েছিল, দুটো করে সন্দেশ, আর দুটো রাজভোগ। প্লেটের কাচের একটা ছোট্ট ডিশে, মনীশ দেখল, জন্যে রয়েছে দুটো সিঙাড়া আর একটা দর

কি এক তাপে মনীশের মাথার ভে ঝাঁঝাঁ করে উঠেছিল। সেজোমাসী বলেছিল, তাড়া আছে বলে শ্রীপদকে আর বাজারে পাঠ না, বাড়িতে যা ছিল, দিলাম। তাছাড়া তুই ছেলে...।

সেজোমাসীর কথাগুলো যে ফাঁকা আও নিষ্ঠুর তামাসা, এটুকু বুঝতে মনীশের অসু হয়নি। কিন্তু মুখ ফুটে সেদিন কোনো কথ বলতে পারেনি একটা দরবেশ চিবিয়ে ব ঢোঁক জল গিলে সেজোমাসীর বাড়ি থেকে দৌড়ে পালিয়ে এসেছিল।

মনীশের হাতে ধরা পঞ্চাশ নম্বর রসগো যেন সেই অপমান, ব্যর্থতা আর পরাজয়। গোল্লাটা মনীশ খুবলে খুবলে খাচ্ছে। মন খাওয়া দেখে সকলের মনে হল, ভাগাড়ে থাকা একটা পচা, গলা লাশের ওপর ক্ষুধার্ত শকুন হামলে পড়েছে। মনীশের একটু অন্য মনে হচ্ছিল শেষ রসগোল্লায় ছোট ছোট কামড় সে ভাবছিল, ব্যর্থতা আর নৈরাশ্যের চোখ, কান, ঠোঁট, মুখ, ধীরে ধীরে সে চিবিয়ে খা আর কেউ তাকে হেরো, ভীতু, কাপুরুষ, ফ মাস্টার বলতে পারবে না।

শেষ রসগোল্লাটা পেটে চালান করে দুহাতে খালি হাঁড়িটা তুলে চকচক করে রসগো রসটা মনীশ খেয়ে ফেলল। পেটের ভেতর কালাম, ঘুমিয়ে থাকা এক আগ্নেয়গিরি যেন উঠেছে। আরো রসগোল্লা চাই! আরো...আ

চেয়ার ছেড়ে মনীশ উঠে দাঁড়াল। এতক্ষণ প্রায় শ্বাস বন্ধ করে মনীশের খাওয়া দেখ তারা তালি বাজাচ্ছে। ফ্রেণ্ডস কেবিনের ঘর হাততালির শব্দে মুখর। নেশাগ্রস্তের টলতে টলতে মনীশ যখন দরজার দিকে এ যাচ্ছে, অমল বলল, টাকাটা নিয়ে যা...।

মনীশ তাকালো না। মনীশের মনে হ টাকার চেয়ে অনেক বড়ো কিছু সে আজ পে সে জিতে গেছে।

ALOKPAAT December 1986 RNI No. 036049 Rs5.00

আজ আপনার কেয়ো-কার্পিন চুলে ফ্রেঞ্চ রোল বাঁধুন। খুব ফ্যাশনেবল দেখাবে!

শিখে নিন, কেয়ো-কার্পিন চুলে ফ্যাশনেবল দেখাতে হলে কি ভাবে বাঁধবেন

মাথার মাঝখানে ছোট সিঁথি কেটে চুল পিছনের দিকে আঁচড়ে নিন।

সমস্ত চুল টেনে মাথার বাঁ ধারে নিয়ে যান। পিন দিয়ে বেশ করে আটকান যাতে চুল বাঁ ধারেই থাকে।

চুলের ডগাগুলি ভালভাবে মুড়ে সবচুলগুলি নিয়ে একটা রোল পাকান।
রোলটি যেন পরিচ্ছন্ন হয়।

মাথার মাঝখানে সুন্দর করে পিন লাগিয়ে আটকান। চুল যেন বেরিয়ে না থাকে। সুন্দর দুটি ক্লিপ লাগান।

চুলের সর্বাঙ্গীন যত্নের জন্যে প্রতিদিন ব্যবহার করুন মৃদু সুরভিত কেয়ো-কার্পিন হেয়ার অয়েল।

চুলের পুষ্টি যোগাবে। চুল থাকবে সুন্দর ও স্বাস্থ্যোজ্জ্বল—অথচ তেলমাখা চটচটে ভাব একেবারেই থাকবে না।

এবার আপনি খোঁপা বাঁধুন, বিনুনী করুন, চুল খুলে রাখুন, কিংবা, যা খুশী তাই করুন। আপনাকে ভারী সুন্দর লাগবে।

১০০ মি·লি· ও ৩০০ মি·লি· শিশিতে পাওয়া যায়

কেয়ো-কার্পিন

সুগন্ধী হেয়ার অয়েল।
চুল চটচটে করে না।

সুস্থ চুল। সুন্দর চুল কেয়ো-কার্পিন চুল

যাদের যত্নই আপনার ত

CLARION C-DMHO-9